তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত

জওহর আফতাবচী

অনুবাদকের কথা

পাক-ভারত উপ-মহাদেশে মোগল শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকেই একটা সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়। এ যুগেই আবুল ফজলের মতো বিরাট প্রতিভাধর ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হয়েছিল এবং নিজামুদ্দীন আহমদ, বায়েজিদ, আবদুল কাদির বদায়ুনী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণও এ যুগেরই বিভিন্ন কাহিনী জগৎকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। আকবর-নামা, তাবাকাতে-আকবরী, তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর, মুন্তাখাবুল্-তাওয়ারিখ প্রভৃতি গ্রন্থে মোগল যুগের যে ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায়, এরূপ সুবিন্যস্ত কোন ঐতিহাসিক উপাদান এ উপ-মহাদেশের পূর্ববর্তী কোন যুগে কেউই তুলে ধরতে পারেন নি। গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা', মীর্জা হায়দরের 'তারিখে-রশীদী' এবং জওহর আফতাবচীর 'তাজকিরাতুল্-ওয়াকিয়াত' মোগল যুগেরই আর তিনখানা বিশিষ্ট ইতিহাস-গ্রন্থ। জওহরের এ শেষোক্ত গ্রন্থখানার অনুবাদ নিয়েই আজ আমি দেশের সুধী সমাজের খেদমতে হাজীর হলাম।

সম্রাট হুমায়ুনের সিংহাসনারোহণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীই জওহর তাঁর এ বিশিষ্ট গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। জওহরের বিস্তৃত জীবনেতিহাস সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে হুমায়ুনের ব্যক্তিগত ভৃত্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন, সম্রাট যে তাঁকে প্রকৃতই স্নেহ করতেন, নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই রাজকীয় খেদমতগারদের দলভুক্ত হয়ে সুদীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে সর্বদা সম্রাটের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবার সুযোগ যে তিনি পেয়েছিলেন, জওহর নিজেই স্বীয় গ্রন্থে সেসব কথা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। ফার্সী ভাষায় পানীয় জলের পাত্রকে 'আফ্‌তাবা' বলা হয়। 'আফ্‌তাবচী' হিসেবে সম্রাটের পানীয় জলের পাত্র বহন ক'রে জওহরকে সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হতো এবং এরূপেই হুমায়ুনের সংগ্রামবহুল জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই প্রত্যক্ষ করার ও জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এ জন্যেই সম্রাট হুমায়ুনের শাসন-কাল সম্পর্কে জওহরের প্রদত্ত বিবরণকেই অধিকতর প্রামাণ্য বলে ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করেছেন। এমন কি, কোন কোন ইতিহাসবেত্তা এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, হুমায়ুনের সংগ্রামী জীবনের অধিকাংশ বিবরণ জওহরের গ্রন্থ থেকেই গ্রহণ

করতে হয়। S. M. Edwardes ও H. L. O. Garrett তাঁদের **Mughal Rule in India** গ্রন্থে (Page 13) বলেছেন :

> "It is now time to turn to the dreary odyssey of **Humayun.** The principal material for this is derived from the **Tazkiratul Wakiat** of Jouhar, a body-servant of the exiled Emperor, who accompanied him on most of his wanderings."

জওহর আফতাবচী তাঁর গ্রন্থে সম্রাট হুমায়ুন সম্পর্কে এমন অনেক কথাও বলেছেন, যা' আবুল ফজল, বায়েজিদ, নিজামুদ্দীন, বদায়ুনী বা গুলবদন বেগম কারো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পারস্য দেশে গমনের পর শাহ তামাস্পের চাপে পড়ে সাময়িকভাবে—অন্তত: বাহ্যত: হলেও—হুমায়ুনের শিয়া-মতবাদ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)

সম্রাট হুমায়ুন যে সুন্নী-মতাবলম্বী একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন, নামাজ-রোজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালনে তাঁর গভীর নিষ্ঠা থেকেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। "ওজু করার জন্যে সম্রাট পথিমধ্যে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন", "নামাজ শেষ করে সম্রাট যাত্রা করলেন", "সম্রাট সে-দিন রোজা রেখেছিলেন", "সামান্য খাদ্যের সাহায্যে সম্রাট ইফ্‌তার সমাধা করলেন"—এ-ধরনের বহু উক্তি 'তাজকিরাতুল্‌-ওয়াকিয়াত'-এর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। শাহজাদা আকবরকে গোসল করানোর পর সামনে বসিয়ে সম্রাট দোয়া-দরুদ পড়ে তাঁর চোখে-মুখে ফুঁ দিচ্ছেন (ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ), এ ঘটনা থেকেও তাঁর গোঁড়া ধার্মিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্রোহী ভ্রাতা কামরানের উদ্দেশ্যে লিখিত এক পত্রে হুমায়ুন বলেছিলেন—"হে আমার নির্দয় ভ্রাতা! তুমি একি অনাচার শুরু করেছ? যে রক্তপাত এখন হচ্ছে, তার জন্যে তুমিই সম্পূর্ণ দায়ী। হাশরের দিন তোমাকেই এ-জন্যে জবাব-দিহি করতে হবে।" (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ)—নিঃসন্দেহে হাশরের দিনের জবাব-দিহির এ ভীতি একজন ধর্ম-বিশ্বাসী পাকা সুন্নী মুসলমানেরই উক্তি। এতদ্‌-সত্ত্বেও পারস্যে গিয়ে গোঁড়া শিয়া-মতবাদী শাহ তামাস্পকে খুশী করে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য আদায় করার মতলবে বাহ্যতঃ হুমায়ুন শিয়া 'ইমামিয়া আস্‌না আশ্‌রিয়া' মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, জওহরের এ উক্তিকে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বর্ণনা রূপে অবশ্য বিশ্বাস করতে হয় এবং এদিক দিয়ে 'তাজকিরাতুল্‌-ওয়াকিয়াত'-এর বৈশিষ্ট্যও স্বীকার্য।

জওহর তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, বালক বয়সেই সম্রাটের ভৃত্যদের দলে তিনি যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীকালে, এমন কি রাজ্যহারা হয়ে সম্রাট যখন আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, সে-সময়েও জওহর যে অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্ক ছিলেন, সম্রাটের নিজের একটি উক্তি থেকে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও লোক সম্রাটের কাছে একটা গোপন কথা বলতে এসে জওহরকে নিকটে দেখে তাকে দূরে সরে যাওয়ার দাবী করলে সম্রাট বলেছিলেন—"এতো ছেলে-মানুষ, একে ভয় করার কিছু নেই।" (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

প্রকৃতপক্ষে, ছোট কোনও বালকের প্রতি স্বভাবতঃই মানুষ যেভাবে স্নেহ-প্রীতির পরিচয় দিয়ে থাকে, হুমায়ুনও বরাবর জওহরের প্রতি অনুরূপ আচরণেরই পরিচয় দিয়েছেন। এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদ থেকে আর একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। জওহর বলছেন—"হরিণটি পুনরায় আমার (জওহর) দিকে আসতে লাগল। তা' দেখতে পেয়েই আমি লাফিয়ে পানিতে নেমে পড়লাম এবং চীৎকার করে বল্লাম—'হরিণের একটি রাণ কিন্তু আমার।' সম্রাট হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—'তাই হবে।'—এখানে জওহরের কথায় বালকের স্বাভাবিক আবদার এবং সম্রাটের উক্তিতে পিতৃ-হৃদয়ের অনাবিল স্নেহেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

সম্রাটের 'আফতাবা'-বাহক ভৃত্যরূপেই জওহরকে কর্ম-জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাতে হলেও, হুমায়ুনের দ্বিতীয় বার রাজ্যলাভের পর তাঁকে পাঞ্জাব ও মুলতান প্রদেশের খাজাঞ্চী বা রাজস্ব-কর্মচারীর দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবরের আমলেও যে তিনি এ রাজকীয় পদে পূর্ববৎ নিয়োজিত ছিলেন, বই-এর ভূমিকায় সে কথা বলতে গিয়ে জওহর নিজেই ঘোষণা করেছেন—"দীনাতিদীন এ অধম জওহর মহামহিম সম্রাট আকবরের দরবারের এক অতি-নগণ্য খাদেম।"

জওহর আফতাবচী কিরূপ নিষ্ঠার সহিত ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন এবং কোন ক্ষেত্রেই তিনি যে সত্য গোপন করেন নি, একটু অনুধাবন করলে তাও পরিষ্কার বুঝা যায়। এ ব্যাপারে একটি মাত্র উদ্ধৃতি প্রদান করলেই যথেষ্ট হবে:

> "ওজু করার জন্যে যখন তিনি (সম্রাট) অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন, আমার গালে এক চপেটাঘাত করেই ভর্ৎসনা করতে করতে বলে উঠলেন-'তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব আমি প্রদান করেছিলাম, সে কাজ তুমি ফিরিয়ে দিলে কেন?' —সম্রাটের এ প্রশ্নের কোন সদুত্তরই আমার কাছে ছিল না। নিজের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করে নিয়েই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।" (ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

নিজের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত খাওয়ার মতো অবমাননাকর এ ঘটনা উল্লেখ না করলেও বই-এর অঙ্গহানি হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। ইচ্ছা করলেই

জওহর এ ঘটনা অতি-সহজেই গোপন রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি; সত্যের খাতিরে বিনা-দ্বিধায় নিজের মর্যাদাহানিকর এ ব্যাপার বর্ণনা করতে পর্যন্ত তিনি কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর সত্যপ্রীতির এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু হতে পারে কি?

সম্রাটের জলপাত্রবাহক সামান্য ভৃত্যের কাজে নিয়োজিত থাকলেও জওহর যে বেশ শিক্ষিত ছিলেন, 'তাজকিরাতুল্-ওয়াকিয়াত'-এর রচনাভঙ্গী তারই প্রমাণ দেয়। গ্রন্থের নানা স্থানে তিনি ফার্সী-সাহিত্যের অমর শিল্পী কবি হাফিজ, সা'দী, জামী প্রভৃতির কবিতা থেকে সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কোরআন-হাদিসের বাণীও উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থের স্থানে স্থানে জওহর আবেগপ্রবণ উচ্ছ্বাসময় ভাষাও ব্যবহার করেছেন। একটু নমুনা দেই:

> "খবর পাওয়া গেল যে, সম্রাট হুমায়ুন মৃত্যুর শরবৎ পান করে এ পার্থিব জগৎ থেকে চির-বিদায় নিয়েছেন।--এ মানবিক অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নয়। জীবনের পোষাক যিনি পরিধান করেছেন, তাঁকে অবশ্যই মরণের পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে।--যে গাছ শ্যামলিমায় বেড়ে ওঠে, শেষে একদিন তাকে মাটিতেই মিশে যেতে হয়; আর যে পাতা রসাশ্রিত হয়ে সতেজ শোভা বিস্তার করে, সময় হলেই তাকেও ঝড়ে পড়তে হয়।"—(ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)

জওহরের এ উচ্ছ্বাসময় রচনাশৈলী সম্রাট বাবুরের কবিতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাবুর বলেছেন:

> "এ দুনিয়ায় এসেছেন যিনি, তাঁকে মরতে হবেই;
> বেঁচে থাকবেন শুধু আল্লাহ্, তিনি চিরঞ্জীবী।"
> "জীবনের মেলায় যিনি প্রবেশ করেছেন,
> তাঁকে শেষে মরণের পেয়ালা থেকে পানীয় গ্রহণ করতে হবেই।"
> "যিনি জীবনের সরাইখানায় এসেছেন,
> তাঁকে পরিণামে বিশ্বের দুর্গতির আলয় ত্যাগ করে যেতে হবেই।"
>
> (বাবুর-নামা, বিভারিজের অনুবাদ, ৫৫৬ পৃ:)

জওহর সম্রাট হুমায়ুনের যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করেছেন, সে সম্পর্কে বিবেচনা করলে প্রথমেই নজরে পড়ে—পিতা বাবুরের মতো অসম-সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির না হলেও বাবুরের মতোই দুঃখকষ্ট সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা, অধ্যবসায় ও তিতিক্ষার অধিকারী ছিলেন হুমায়ুনও এবং এসব গুণই শেষ পর্যন্ত হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধারে তাঁকে সাহায্য করেছে। আজীবন নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে হলেও, বাবুরের (এবং অধিকাংশ মোগল বাদশার) মতোই সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ললিত-কলার প্রতি হুমায়ুনেরও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারতেন। হজরত আলী ও তাঁর বংশধরদের স্তুতিবাচক তাঁর একটি কবিতা শ্রবণ করেই শাহ তামাস্প শেষে তাঁকে সামরিক সাহায্য প্রদান করতে সম্মত হয়েছিলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে জওহর বলেছেন ঃ

> "শাহ মহোদয়ের সহোদরা অতঃপর হজরত আলী ও তাঁর বংশধরদের প্রশস্তি-বাণী সম্বলিত সম্রাট হুমায়ুনের রচিত একটি রুবাই কবিতা আবৃত্তি করে ভ্রাতাকে শোনালেন। হুমায়ুনের এ কবিতা শাহ তামাস্পের মনকে একেবারেই বদলিয়ে দিল।" (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

হুমায়ুনের দরবারে সুকণ্ঠ গায়কদের সঙ্গীতের কথা জওহর তাঁর রচনায় বহুবার উল্লেখ করেছেন। চিত্র-শিল্পেও যে সম্রাটের গভীর অনুরাগ ছিল, এ গ্রন্থে বর্ণিত একটি অতি-সামান্য ঘটনার মাধ্যমে জওহর তারও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

> "সম্রাট গোসলের বস্ত্র মাত্র পরিধানে রেখে অন্যান্য সকল পোষাক ধৌত করতে দিলেন। এ সময়ে একটা সুন্দর পাখী উড়ে এসে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল। সম্রাট তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে দরজা বন্ধ করে পাখীটিকে ধরে ফেল্লেন। চিত্রকর মাসুরকে ডেকে এনে কাগজের উপর পাখীটির একটি চিত্র অঙ্কন করা হলো এবং অতঃপর কাঁচি দিয়ে কয়েকটা সুন্দর পালক কেটে নিয়ে একে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলো।" (একাদশ পরিচ্ছেদ)

দুঃখ-দুর্দশাকে সাথী করে নিয়ে হুমায়ুনকে জীবনের অধিকাংশ সময়ই পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে হলেও, তাঁর জ্ঞানস্পৃহা আদৌ কম ছিল না। কুতুবখানা বা লাইব্রেরী ছিল তাঁর অতি প্রিয় স্থান। এ সম্পর্কে জওহর একস্থানে উল্লেখ করেছেন যে, শত্রুদল কর্তৃক তালিকান দুর্গ লুণ্ঠিত হলে সে-সংবাদ যখন সম্রাটের নিকটে পৌঁছাল, তিনি সর্বাগ্রে জিজ্ঞেস করলেন—"দুর্গের কুতুবখানা অক্ষত রয়েছে তো?" যখন সম্রাটকে জানানো হলো যে, কুতুবখানার কোন ক্ষতি হয় নি, তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ)

হুমায়ুনের চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর অতুলনীয় ভ্রাতৃপ্রেম। জওহর তাঁর গ্রন্থের বহু জায়গায় সম্রাটের এ বিস্ময়কর ভ্রাতৃপ্রেমের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা' দেখে সত্যি মুগ্ধ হতে হয়। ভ্রাতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতার ফলে হুমায়ুনকে বরাবর নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলেও, দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, তিনি সকল সময়েই তাঁদের ক্ষমা করেছেন। বিদ্রোহী কামরানকে হত্যা করার জন্যে অমাত্যবর্গ—এমন কি শাহজাদা হিন্দালও—পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু হুমায়ুন দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষণা করেন—"ভ্রাতৃরক্তে আমি নিজের হস্ত কলঙ্কিত করতে পারব না।" অবশ্য কামরানের দুশমনী যখন চরমে গিয়ে

পৌঁছে, সম্রাট অবশেষে তাঁকে অন্ধ করে দিতে বাধ্য হন এবং অতঃপর **মক্কা-শরীফে** পাঠিয়ে দেন। অনুরূপভাবেই পুনঃপুনঃ বিশ্বাসঘাতকতার পরেও আসকরীকে সুস্থ শরীরে মক্কায় প্রেরণ করে হুমায়ুন তাঁর ভাবী অনিষ্টকারিতা থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সম্রাট হুমায়ুনের বিস্ময়কর ভ্রাতৃপ্রেম সম্পর্কে স্যার রিচার্ড বার্ন লিখেছেন:

> "The emperor was strongly pressed by all his advisers—military, civil and religious—to execute his brother (Kamran) to prevent further evil to the State. Though his heart had become tougher during his recent trials Humayun was still far from seeking his brother's life ; but he agreed so far that he ordered him to be blinded. An affecting farewell took place between the brothers in which Humayun expressed his sympathy with Kamran's sufferings and Kamran admitted his own misconduct and fault."
>
> (Cambridge History of India, Vol. IV, page 43)

হুমা ুনের মৃত্যু-সময়ে জওহর দিল্লীতে ছিলেন না; তিনি তখন পাঞ্জাব ও মূলতান প্রদেশের খাজাঞ্চীরূপে লাহোরে অবস্থান করছেন। এ-জন্যেই তিনি অতি-সংক্ষেপে সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করেছেন। এ সম্বন্ধে নিজামুদ্দীন আহমদের গ্রন্থে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। নিজামুদ্দীন লিখেছেন:

> "৭ই রবিয়ল-আওয়াল তারিখে (১৭ই জানুয়ারী, ১৫৫৬) সন্ধ্যার প্রাক্কালে সম্রাট কুতুবখানার ছাদে উঠে কিছুক্ষণ সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি যখন নেমে আসছিলেন, ঠিক তখনি মুয়াজ্জিনের আজান-ধ্বনি শ্রুত হয়। ভক্তিভরে সম্রাট সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপের উপর বসে পড়েন। তিনি যখন পুনরায় দাঁড়াবার প্রয়াস পান, তখনি তাঁর পা' পিছলে যায় এবং তিনি সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে যান। যেসব লোক তখন সম্রাটের নিকটে ছিল, তারা মর্মাহত হয়ে পড়ে এবং সম্রাটকে ধরাধরি করে অজ্ঞান অবস্থায় প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি কথা বলতে সমর্থ হন। রাজকীয় দরবারের চিকিৎসকদের সর্বপ্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। পর দিন সম্রাটের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। শাহজাদা আকবরকে আনয়ন করার জন্যে তখন শেখ জুলীকে পাঞ্জাবে প্রেরণ করা হয়। ১৫ই রবিয়ল-আওয়াল (২৪শে জানুয়ারী) সন্ধ্যার সময় সম্রাট হুমায়ুন শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জান্নাতলোকে প্রস্থান করেন।" (তাবাকাতে-আকবরী, ২২১ পৃঃ)

বাবুর মোগল ঐতিহ্যের যে বুনিয়াদ এ উপ-মহাদেশে প্রতিষ্ঠা করে যান এবং য বুনিয়াদকে স্থায়িত্ব দানের কষ্ট-কঠোর সাধনায় হুমায়ুনকে জীবনপাত করতে

হয়, তাঁর পুত্র আকবর পিতার সে অসমাপ্ত কর্তব্য এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হন যে, তাঁর সময়ে এবং পরবর্তী কয়েকজন বাদশা'র আমলে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব-গরিমা নিখিল-বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। প্রাচ্যের এ সুবিস্তৃত ভূভাগে জ্ঞানের অঙ্গনে, শিল্প-সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মোগলরা যে স্থায়ী অবদান রেখে গিয়েছে, তার গৌরব শুধু মোগলের নয়, মুসলমানেরও। পাক-ভারতের মুসলমান এ ঐতিহ্যের জন্যে প্রকৃতই গর্ব করতে পারে।

বাঙলা-ভাষাভাষী মুসলমানদের সম্মুখে এ গৌরবেতিহাস প্রকৃত প্রেক্ষিতে তুলে ধরতে হলে মুসলিম শাসন-আমলের সাহিত্য-কীর্তি, বিশেষতঃ ইতিহাস নিয়ে আমাদিগকে ব্যাপক অনুশীলনেই আত্মনিয়োগ করতে হবে। 'তাজকিরাতুল্-ওয়াকিয়াত'-এর এ অনুবাদ এবম্বিধ অনুশীলনেরই একটি প্রচেষ্টা। বইখানাকে শুধুমাত্র অনুবাদ করেই আমি ক্ষান্ত হই নি'; বহু-সংখ্যক পাদটীকা সংযোজন করে একে একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রূপ দানের জন্যেও বিশেষভাবে চেষ্টা করেছি। আমার এ প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হয়েছে, দেশের সুধী-সমাজই তা' বিচার করবেন।

অনুবাদ ও সম্পাদনার কার্যকে যথা-সম্ভব ত্রুটিহীন করার জন্যে যে-সব গ্রন্থ থেকে আমি সাহায্য গ্রহণ করেছি, তন্মধ্যে স্টুয়ার্টের ইংরাজী অনুবাদ ও ডক্টর সৈয়দ মঈনুল হকের উর্দু অনুবাদের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। ডক্টর মঈনুল হকের কাছে আমি এজন্যে বিশেষভাবেই কৃতজ্ঞ। কোন-কোন ফার্সী কবিতার মর্মোদ্ঘাটনে আমার তরুণ বন্ধু মওলানা মুহিউদ্দীন খান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে সাহায্য করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বন্ধুবর কবি আবদুল কাদিরের নামও স্মরণ করছি। প্রধানতঃ তাঁরি উৎসাহে এ অনুবাদে আমি প্রথমে হাত দিয়েছিলাম।

বইখানা প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের কর্তৃপক্ষ আমাকে যে সুযোগ প্রদান করেছেন, তজ্জন্য আমি তাঁদের কাছেও গভীরভাবে ঋণী।

২৫শে মে, ১৯৬৮

"মঈন-মহল",
১২২, কাকরাইল রোড,
ঢাকা—২

চৌধুরী শামসুর রহমান

বিষয়-সূচী

তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত

জওহর আফতাবচী

ভূমিকা

(জওহর আফতাবচী)

আল্লাহর প্রশংসা ও রসুলের উদ্দেশ্যে দরুদ-বাণী উচচারণ করেই আরম্ভ করলাম।

মহামান্য শাহানশাহ—যিনি ন্যায়-নীতি ও উদারতার মহিমায় মহাত্মাদের শীর্ষ-স্থানীয় এবং যাঁকে এ দুনিয়া ও পরকালের সহায়ক আখ্যায় অভিহিত করা হয়ে থাকে, আল্লাহর জ্যোতির স্পর্শে ধন্য সেই বাদশাহ গাজী নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ুনের কাহিনী নিয়েই এ অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ রচিত হলো।

তোমার মহিমার দীপ্তিতে চাঁদের চেয়েও
বেশী আলো ঝলে,
খনি ও সাগর হয়েছে খালি
তোমারি দানের ফলে।

দীনাতিদীন এ অধম জওহর মহামহিম সম্রাট আকবরের দরবারের এক অতি-নগণ্য খাদেম। চির-সৌভাগ্যমণ্ডিত, দাক্ষিণ্যের লীলাক্ষেত্র ও আকাশতুল্য গরিমাময় এ দরবারের সেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বালক বয়স থেকেই। সম্রাট হুমায়ুনের খাদেমদের দলভুক্ত হয়ে সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে অবস্থান করার সুযোগ পেয়ে আমি হয়েছি ধন্য।

এ শাহী সান্নিধ্যের কল্যাণে যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে এবং যেসব পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি, নিজের সাধ্যমত ও সম্রাটের মর্যাদার উপযোগীভাবে যথাসম্ভব ভুল-ভ্রান্তিবর্জিত রূপে স্মৃতি-কথার আকারে তা' লিপিবদ্ধ করে রাখার ইচ্ছা আমার মনে জেগে ওঠে। জ্ঞানী লেখকের মতোই আমিও বলতে পারি ঃ

কথার মালা সাজিয়ে দিলাম লেখনীর মুখে,
মানুষের স্মৃতি সঞ্চিত থাকে কথারই বুকে।

লেখার এ-হেন ইচ্ছা মনে উদিত হওয়ার পর হজরত খাজা হাফিজের আত্মার কাছে আমি ইঙ্গিত প্রার্থনা করলাম। 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' কাব্যের পাতা খুলে যে শুভ-ইঙ্গিত আমি পেলাম, তারি পরিণামে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ। কতকগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এ রচনা-সমষ্টিরই নাম দেওয়া হলো 'তাজকিরাতুল্-ওয়াকিয়াত'। ৯৯৫ হিজরী সনে এ গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করা হয়। প্রথম দিকের ঘটনাবলী যথা-সম্ভব সন-তারিখ উল্লেখ করেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যদি এ ধারা অক্ষুণ্ন থাকত, তা' হলে সকল ঘটনারই তারিখ ও সন রচনার মধ্যেই

পাওয়া যেতো। কিন্তু তা' সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। মহামান্য সম্রাটের পবিত্র চরণে নিবেদন করার উদ্দেশ্যেই এ স্মৃতি-কথা রচনা করা হয়েছে। ইহা গৃহীত হলেই এ অধম নিজেকে ধন্য মনে করবে।

রাজ্য হারানোর পর দ্বিতীয় বার রাজ্যলাভের মতো দুঃসাধ্য সাধন অপর কোন নৃপতির পক্ষেই সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ার কল্যাণে সম্রাট হুমায়ুন এ দুর্লভ সৌভাগ্যেরই অধিকারী হয়েছেন।

এ অসাধ্য সাধনের স্মৃতি যাতে চিরকাল বিশ্ববাসীর মনে জাগরুক থাকে, সে উদ্দেশ্যেই সম্রাটের সিংহাসনারোহণ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বার তাঁর রাজ্যলাভ পর্যন্ত সকল ঘটনা আমি বর্ণনা করেছি। দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোর দুঃখকষ্ট ও দুর্গতি সত্ত্বেও সম্রাট যে তিলমাত্র উদ্যমহীন বা ধৈর্যহারা হন নি এবং কিরূপ নিদারুণ পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে তাঁকে হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে হয়েছে, জগদ্বাসী যাতে সে বিচিত্র কাহিনী জানতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই আমার এ প্রয়াস।

তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্রাট জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবুরের পরলোক গমন এবং সম্রাট নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ুনের সিংহাসনারোহণ

এ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ ক'রে অবিনশ্বর পারলৌকিক জগতের উদ্দেশ্যে বাদশাহ্ গাজী জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবুরের মহাপ্রস্থানের পর বাদশাহ্ গাজী নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ুন সিংহাসনারোহণ করেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বাদশাহ্ সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর[১] প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বাবন ও বায়েজিদ্ আফগানদের এবং ইব্রাহিম খান লোদীর[২] অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন। বিদ্রোহী দলকে দমন করার উদ্দেশ্যে বাদশাহ্ স্বীয় বিজয়ী বাহিনীসহ বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হন।[৩]

কয়েক দিন পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর রাজকীয় সেনাদল 'সাই' নদীর তীরে 'দওরা'[৪] নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলে বিদ্রোহীদের বেশ বড় একটা দল এসে আমাদের সম্মুখীন হলো। কয়েক দিন পর প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং বিপক্ষীয় সৈন্যদল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করল। ইব্রাহিম লোদীর সহিত যে-সব আফগান-সরদার বিদ্রোহে যোগদান করেছিল, তাদের কয়েকজনকে হত্যা করা হলো এবং এভাবেই বিদ্রোহীরা পর্যুদস্ত হয়ে গেল।

১। সম্রাট হুমায়ুন ৯ই জমাদিউল্-আওয়াল, ৯৩৭ হিজরী, মোতাবেক ২৯শে ডিসেম্বর, ১৫৩০ খৃঃ সিংহাসনারোহণ করেন।

২। এ বিদ্রোহের নেতা ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদী ছিলেন; জওহর ভ্রমক্রমে ইব্রাহিম লোদীর নামোল্লেখ করেছেন।

৩। জওহর অতি সংক্ষেপে এ অভিযানের বিবরণী প্রদান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সম্রাট প্রথমে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ ক'রে দখল করেন এবং পরে সেখান থেকেই জৌনপুর ও বিহারের দিকে অগ্রসর হন।

৪। জওহর নদীটির নাম 'সাই' এবং স্থানটির নাম 'দওরা' ব'লে উল্লেখ করেছেন। কোন-কোন ইতিহাসে নদীটির নাম 'সাতি' এবং যুদ্ধক্ষেত্রের জায়গার নাম 'দাদ্‌রা' ও 'দনরোয়া' ব'লেও উল্লেখ দেখা যায়। *Cambridge History of India*-য় (*Vol. IV, Page* 21) মন্তব্য করা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ জৌনপুর থেকে ১৫ মাইল দূরবর্তী 'সাই' নদীর তীরে অবস্থিত 'দনরোয়া' নামক স্থানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সম্রাটের বিজয়ী সেনাদল সেখান থেকে দৃপ্ত-পদে চুনার দুর্গের দিকে এগিয়ে চলল। শেরখানের পুত্র জালাল খান উক্ত দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। দুর্গে তখন আরো কতিপয় আফগান আমীরও উপস্থিত ছিলেন। সম্রাটের সেনাবাহিনী দুর্গটি অবরোধ করল। চার মাস কাল এভাবে অবরোধ চলার পর শেরখান যখন বুঝতে পারলেন যে, দু'এক দিনের মধ্যেই দুর্গের পতন ঘট্‌বে, তখন তিনি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো এবং সন্ধির শর্তানুযায়ী শেরখানের অপর পুত্র কুতুব্‌ খানকে[৫] এক দল সেনাসহ সম্রাটের নিকটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সম্রাট অতঃপর চুনার থেকে যাত্রা ক'রে রাজধানী আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

৫। কোন কোন ইতিহাসে কুতুব খানের নাম আবদুর রশীদ বলেও উল্লেখিত হয়েছে। (Cambridge History of India, Vol. IV, Page 28 দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহামান্য সম্রাটের গুজরাট আক্রমণ ও বিজয়

মহামান্য বাদশাহ্ গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং তাঁর বিজয়ী সেনাদল যখন 'বালুর'[১] দুর্গে গিয়ে উপনীত হলো, তখন গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের কাছ থেকে এক পত্র পাওয়া গেল। সুলতান বাহাদুর উক্ত পত্র মারফত সম্রাটকে বিদিত করেন যে, তিনি চিতোর দুর্গ অবরোধ করে রেখেছেন এবং বিধর্মীদের পরাজিত ক'রে ইসলামকে গরীয়ান করাই তাঁর ইচ্ছা। সুতরাং সম্রাট যেন এ-ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন। সুলতানের এ অনুরোধ মতো সম্রাট অনেক দিন পর্যন্ত 'বালুর' দুর্গের সান্নিধ্যে অপেক্ষা করলেন। সুলতান বাহাদুর ইতিমধ্যে 'চিতোর' দুর্গ জয় করে গুজরাটে ফিরে গেলেন।

সম্রাটও এর পর পুনরায় গুজরাট অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং স্বীয় পরাক্রান্ত বাহিনীসহ বুরহানপুর জেলার 'মুরী'[২] গ্রামের নিকটে গিয়ে পৌঁছালে সুলতান বাহাদুর এগিয়ে এসে বাধা দিলেন। সম্রাট তখন স্বীয় অমাত্যবর্গকে নিকটে আহ্বান ক'রে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন। প্রত্যেক অমাত্যই নিজের নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী মতামত প্রকাশ করলেন। অবশেষে সম্রাট ঘোষণা করলেন যে, বাহাদুর শা'র সেনাদলকে চারদিক থেকে ঘেরাও ক'রে তাদের রসদ বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। কারণ, এভাবেই দুশ্‌মনদের পর্যুদস্ত করা সম্ভবপর ছিল।

সম্রাটের নির্দেশ মতো কয়েক জন মোগল সেনানী শত্রু-শিবিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘাঁটিসমূহ অবরুদ্ধ ক'রে বাইরে থেকে সর্বপ্রকার রসদ তাদের শিবিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করার জন্যে নিয়োজিত হলো। এসব সেনানীর মধ্যে ছিল স্বীয় পুত্রগণসহ মীর বাচ্‌কে, গুর্গ আলী, তানা বেগ, মগল বেগ, মীর্জা খান এবং

১। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত 'বালুর' কোন কোন ইতিহাসে 'তালুর' নামেও উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, একবার সম্রাট হুমায়ুন গোয়ালিয়রের এ স্থানে পৌঁছে দু'মাস অবস্থান ক'রে রাজধানীতে ফিরে যান। দ্বিতীয় বার তিনি 'সারংপুর' নামক স্থানে পৌঁছে সুলতান বাহাদুরের চিঠি প্রাপ্ত হন। জওহর এ দু'টো ঘটনাকে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। (তাবাকাতে-আকবরী—১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২। অন্যান্য ইতিহাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার স্থান 'মুরী' না ব'লে 'মন্দসুর' বলা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য—তাবাকাতে-আকবরী—১৯০ পৃঃ ও তারিখে-ফেরিশতা—বোম্বাই সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ)।

আরো কতিপয় লোক। এদের নির্দেশ দেওয়া হলো যে, তা'রা নিজেদের অধীনস্থ সৈন্যদের সাহায্যে লুটতরাজ চালিয়ে শত্রু-শিবিরে সর্বপ্রকার রসদ আমদানীর ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিবে। তিন-চার মাস এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর খাদ্য-শস্য এমন দুর্মূল্য হয়ে উঠল যে, চার-পাঁচ টাকায়ও এক সের শস্য সংগ্রহ করা সৈনিক-দের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বাহাদুর শা'র সৈন্যগণ এমন শোচনীয় দশায় নিপতিত হলো যে, একমাত্র ঘোড়ার গোশ্‌ত ব্যতীত উদরজ্বালা নিবারণের অপর কোন উপায়ই তাদের রইল না। এ-সময় মধ্যে প্রায় প্রত্যহই উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল।

অদৃষ্ট সম্রাটের অনুকূল ছিল। একদিন গভীর রাত্রে শত্রু-শিবিরে এক ভীষণ আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল শোনা গেল। সম্রাটের তাঁবুর দ্বারে দণ্ডায়মান উস্তাদ আলা-কুলী ভেতরে প্রবেশ করলে সম্রাট তাঁকে শোরগোলের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আলা-কুলী উত্তরে জানালেন যে, বাহাদুর শাহ্‌ পলায়ন করেছেন ব'লেই মনে হচ্ছে; আর রুমী খান সম্ভবতঃ তাঁর 'লাইলী' ও 'মজনু' নামক কামান দু'টো আওয়াজ ক'রে থাকবেন। সম্রাটের সহিত আলা-কুলীর এরূপ কথোপকথনের মধ্যেই এক ব্যক্তি সেখানে হাজীর হয়ে নিবেদন করল—"হে আমার বাদশাহ্‌, আপনার জয় হোক! সুলতান বাহাদুর পলায়ন করেছেন।" সম্রাট দু' রাকাত শোক্‌রানার নামাজ আদায় করলেন।[৩]

অবিলম্বে পলায়িত সুলতান বাহাদুরের পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যে সম্রাট সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বে আরোহণ করে অগ্রসর হলেন। এ-সময়ে শত্রুপক্ষ ত্যাগ ক'রে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রুমী খান আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন। খবর পাওয়া গেল—পলায়িত সুলতান 'মাণ্ডু দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে আমাদের বিজয়ী সেনাদল 'মাণ্ডু' পৌঁছে দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে অবরোধ সৃষ্টি করল। কিন্তু হিন্দু-বেগের[৪] সহায়তায় সুলতান বাহাদুর 'মাণ্ডু' থেকেও পুনরায় পলায়ন করতে সমর্থ হলেন। তিনি এর পর 'চম্পানীর' দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

'মাণ্ডু' দুর্গ দখল ক'রে প্রচুর ধনরত্ন ও মালমাত্তা পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে কোন-রূপে সময়ক্ষেপ না ক'রে সম্রাটের সেনাদল অতি দ্রুত সুলতানের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে 'চম্পানীর' পৌঁছে দুর্গ অবরোধ করল।[৫]

৩। ৯৪১ হিজরী সনের ২১শে শাওয়াল তারিখে (মার্চ, ১৫৩৫ খ্রীঃ) এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

৪। হিন্দু বেগের এবম্বিধ বিশ্বাসঘাতকতার কথা 'তাবাকাতে-আকবরী' বা 'ফেরিশ্‌তা' প্রভৃতি অপর কোন ইতিহাস-গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি'।

৫। Dow's History of Hindustan, Vol. II, Page 144 & Edinburgh Gazetteer দ্রষ্টব্য।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবরোধ চলার পর একদিন জনৈক লোক সুলতান বাহাদুরের অগোচরে সম্রাটের সহিত গুপ্তভাবে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে জানাল যে, সে এক গোপন পথে সম্রাটকে দুর্গের উপর এমন এক স্থানে নিয়ে যেতে পারে, যেখান থেকে দুর্গ জয় করা খুব সহজ হবে। লোকটির কথা মতো সম্রাট কতিপয় সাহসী সৈন্য, দু'জন ঢাকী ও একজন নকীব (শিঙ্গাবাদক) সহ তার প্রদর্শিত গোপন পথে দুর্গের উপরে গিয়ে উপনীত হলেন। অতঃপর সম্রাটের আদেশে ঢাকীরা ঢাক বাজিয়ে এবং নকীব শিঙ্গাধ্বনি করে ইঙ্গিত প্রদান করল।

সম্রাটের অন্য যেসব আমীর দুর্গের চারদিক ঘিরে রেখেছিলেন, এ ইঙ্গিত পেয়ে তাঁরা সকলে একযোগে দুর্গের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। এভাবে আক্রান্ত হয়ে শত্রুপক্ষ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পর্যুদস্ত হয়ে শান্তি ভিক্ষা করতে লাগল। অধিকাংশ লোকই দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করল। সুলতান বাহাদুর এবারও পলায়ন করতে সমর্থ হলেন এবং সুরাটের বন্দর এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এভাবেই সম্রাট সমুদয় দ্রব্যসম্ভারসহ 'চম্পানীর' দুর্গের অধিকার প্রাপ্ত হলেন।[৬] কিন্তু সুলতান বাহাদুরের ধন-ভাণ্ডারের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

কয়েকদিন পর আলম খান নামক সুলতান বাহাদুরের একজন অমাত্য সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দুর্গে আগমন করলেন। কোন কোন আমীর এ সময়ে সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন যে, আলম খানের উপর পীড়ন করা হলেই সম্ভবতঃ সুলতান বাহাদুরের লুক্কায়িত ধনরত্নের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু সম্রাট এ অভিমতই প্রকাশ করলেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে ব্যক্তি আনুগত্য প্রদর্শন করতে এগিয়ে এসেছে, তার প্রতি কঠোর আচরণ কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না।

সম্রাট অতঃপর আদেশ দিলেন এক পানোৎসবের অনুষ্ঠান করার জন্যে। উক্ত মজলিসে আলম খানকে বেশী ক'রে মদ্যপান করিয়ে নেশাগ্রস্ত ক'রে সুলতান বাহাদুরের লুক্কায়িত ধনরত্নের কথা জিজ্ঞেস করলে নেশার ঝোঁকে সে হয় তো সঠিক সন্ধান দিয়ে ফেলবে, সম্রাট এ আশাই প্রকাশ করলেন।

সম্রাটের আদেশ মতোই কাজ হলো। কতিপয় ওমরাহ্ এক মদ্যপানের মজলিসের আয়োজন ক'রে আলম খানকে প্রচুর পরিমাণে মদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। মদের নেশায় আলম খান যখন আত্মহারা অবস্থায় উপনীত হলেন,

---

৬। ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে চম্পানীর দুর্গ বিজিত হয় (Cambridge History of India, Vol. IV, Page 25)।

তখন তাঁকে বাহাদুর শা'র ধন-ভাণ্ডারের কথা জিজ্ঞেস করা হলো। আলম খান উত্তর দিলেন—"বাদশাহ যদি সুলতান বাহাদুরের ধনরত্ন পেতে চান, তা'হলে আমরা এখানে যে চৌবাচচার পার্শ্বে বসে আছি, তার সমুদয় পানি অপসারিত করতে হবে। এখান থেকে এত বেশী ধনরত্ন পাওয়া যাবে যে, সমগ্র সেনাবাহিনীর জন্যেই তা' যথেষ্ট হবে।"

ওমরাহ্‌গণ অবিলম্বে আলম খান প্রদত্ত এ সন্ধানের কথা সম্রাটকে বিদিত করলেন। সম্রাট তখন আদেশ দিলেন—কুঁজো পেয়ালা প্রভৃতি পাত্রের সাহায্যে লোকেরা যেন অবিলম্বে চৌবাচচার পানি অপসারণে লেগে যায়। সম্রাটের এ আদেশ মতো লোকেরা যখন পানি অপসারণে লেগে গেল, আলম খান তখন জানালেন, এভাবে চৌবাচচা খালি করা যাবে না। তিনি আরো সন্ধান দিলেন যে, চৌবাচচাটির এক জায়গায় একটা ছিদ্রপথ রয়েছে এবং তা' খুলে দিলেই আপনা-আপনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা' খালি হয়ে যাবে।

আলম খানের এ নির্দেশ মতোই কাজ করা হলো এবং শীঘ্রই চৌবাচচা শুষ্ক হয়ে গেলে দেখা গেল, মাহ্‌মুদের[৭] জমানা থেকে সঞ্চিত বিরাট ধন-ভাণ্ডার সেখানে মওজুদ রয়েছে। মহামান্য বাদশাহ্‌ ঢাল ভরতি করে করে এ বিপুল পরিমাণ ধন সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করলেন। আলম খান স্বর্ণ ও রৌপ্যভর্তি একটা কূপও এর পর দেখিয়ে দিলেন। এ কূপের সোনা-রূপা বিতরণ না করে সঞ্চিত রাখা হলো।

অতঃপর শাহানশাহ্‌ তর্দী বেগের উপর[৮] চম্পানীর দুর্গের ভার অর্পণ ক'রে সুলতান বাহাদুরের অনুসরণে ক্যাম্বে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু এ সময়েই হিন্দু-বেগ এবং আরো কতিপয় রাজকীয় কর্মচারী ও ওমরাহ্‌ সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন -"আল্লাহ্‌-পাকের অসীম করুণা ও সহায়তায় সম্রাট বিপুল বিজয়ের অধিকারী হয়েছেন। সুলতান বাহাদুরকে পুনঃ পুনঃ রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে হয়েছে। প্রথমে মাণ্ডু দুর্গে ও পরে চম্পানীরে আশ্রয় নিয়েও তিনি টিকতে পারেন নি' এবং শেষে সুরাটের বন্দরে গিয়ে সেখান থেকেও হয়রান পেরেশান্ হয়েই তাঁকে দিগ্বিদিকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। সুতরাং যে অর্থ-সম্পদ হস্তগত হয়েছে, তা' থেকে সৈনিকদের এক বা দু' বছরের বেতন আগাম দিয়ে অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যে সঞ্চিত রাখা উচিত হবে। তা' ছাড়া, গুজরাটের শাসনভারও সম্রাটের প্রতিনিধি

৭। মাহমুদ বলতে এস্থলে সুলতান মাহমুদ বায়েগ্‌ড়াকে বুঝান হয়েছে।

৮। আবুল ফজলের বর্ণনা মতে হিন্দু বেগকে চম্পানীর দুর্গের ভারার্পণ করা হয়েছিল।

হিসেবে সুলতান বাহাদুরের উপরই পুনরায় অর্পণ করা হলে আপনার স্মৃতি চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।"

অমাত্যবর্গ সম্রাটকে একথাও জানালেন যে, রাজধানী আগ্রায় তাঁর আশু প্রত্যাবর্তন একান্ত প্রয়োজন। কারণ, সোলতান মীর্জা, আলেগ্ মীর্জা, শাহ্ মীর্জা ও মুহাম্মদ আলী মীর্জার বিদ্রোহ ঘোষণা এবং গঙ্গাতীরস্থ কনৌজ থেকে জৌনপুর পর্যন্ত অঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দুঃসংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

আমীর-ওমরাহ্ ও উচ্চ-পদস্থ রাজকীয় কর্মচারীদের এসব কথা শুনে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন,—"যে-দেশ আমি তরবারির জোরে দখল করেছি, এভাবে তা' বিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে না। এ-দেশে আমি নিজের আধিপত্য অব্যাহত রাখব এবং একে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে।"

অমাত্যগণ যখন দেখলেন—তাঁদের কথায় সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন, তখন তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির মতলবে শাহজাদা আস্‌করীর শরণাপন্ন হলেন। অমাত্যগণ শাহজাদাকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন নিজের অধীনস্থ সেনাদল সহ সম্রাটকে পরিত্যাগ ক'রে দিল্লীতে গিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কারণ, তা' হলেই সম্রাট দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হবেন। অমাত্যদের এ পরামর্শ মতো মীর্জা আসকরী স্বীয় সেনাদল সহ দিল্লীর পথে যাত্রা করলেন। এ সময়েই মীর্জা ইয়াদগার নাসির চম্পানীর দুর্গের নব-নিযুক্ত অধ্যক্ষ তর্জী বেগের নিকটে গিয়ে দাবী করলেন যে, দুর্গ-মধ্যে যে-সব ধন-দৌলত রয়েছে, তা' তাঁর হস্তে সমর্পণ করা হোক। তর্জী বেগ কিন্তু ইয়াদগার মীর্জার কথামতো কাজ করতে রাজী হলেন না। তিনি মীর্জাকে জানালেন যে, সম্রাটের হুকুম ব্যতীত তিনি তাঁর দাবী পূরণ করতে পারেন না। সম্রাটের নিকটে লোক পাঠিয়ে তর্জী বেগ এ-ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন। প্রত্যুত্তরে সম্রাট তর্জী বেগকে জানালেন যে, দুর্গ ও তন্মধ্যস্থ ধনরত্নাদির কর্তৃত্ব যেন পরিত্যাগ করা না হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই সম্রাট স্বয়ং সে-দিকে গমন করবেন বলেও জানালেন।

পরিশেষে সম্রাট যখন বুঝতে পারলেন যে, মীর্জাদের সহিত যোগসাজস্ করে অমাত্যরা বিদ্রোহ সংঘটনের চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং সেনা-বাহিনীর বিভিন্ন অংশ গুজরাটের নানা স্থানে মোতায়েন থাকায় তাঁর নিকটে অবস্থিত সৈন্যদের সংখ্যাও বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে, তখন তিনি আহমদাবাদ গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সেখানে সকল সেনাদল একত্রিত হবে বলেই তিনি মনে করলেন।

সেদিনই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সম্রাট 'খাম্বায়েত' (ক্যাম্বে) থেকে যাত্রা করে আহমদাবাদে গিয়ে পৌঁছালেন। সম্রাটের সিদ্ধান্তের কথা যখন প্রচারিত

হয়ে গেল, তখন কোন কোন আমীর রাজকীয় সেনাদলের সহিত এসে যোগদান করলেন। বেশীর ভাগ ওমরাহ্ কিন্তু রাজধানীর দিকেই গমন করলেন।

সম্রাট যখন দেখতে পেলেন, যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য এসে আহমদাবাদে জমায়েত হলো না এবং তাঁর কাছে লোক-লস্করের সংখ্যা বেশ কমে গেছে; অধিকন্তু সুলতান মীর্জা ও তাঁর পুত্রদের বিদ্রোহেরও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তখন বাধ্য হয়েই তাঁকে রাজধানী আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলো।

সম্রাটের সহিত তাঁর অমাত্যদের মতবিরোধ ও তাঁর অধীনস্থ লোক-লস্করের সংখ্যা হ্রাস এবং পরিণামে সম্রাটের আগ্রা যাত্রার সংবাদ পেয়ে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর ফিরিঙ্গীদের[৯] সহিত এক সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং তাদের সাহায্যে পাঁচ-ছয় হাজার হাব্‌শী ক্রীতদাস সৈন্য নিয়ে আহমদাবাদে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট যখন গুজরাটে ছিলেন, সে-সময়ে পরগণা বেলগ্রামের জায়গীরদার কালান বেগ কোকা, শেখ ফুল,[১০] মোহাম্মদ কোকাতাশ ও সম্রাটের অনুগত অপর কতিপয় আমীর মীর্জা হিন্দালের (সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রতিনিধি) নিকটে এসে জানালেন যে, মুহাম্মদ সোলতান মীর্জা বেলগ্রাম দখল করে সেখানে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার পর আলেগ মীর্জাকে জৌনপুরের দিকে প্রেরণ করেন। আলেগ মীর্জা জৌনপুর অবরোধ করে রেখেছেন। সুলতান মীর্জা যে শাহ্ মীর্জাকে কোর্‌রা ও মানিকপুর দখল করতে প্রেরণ করেছেন এবং স্বয়ং বেলগ্রামে অবস্থান করছেন, এ সংবাদও শাহজাদা হিন্দালকে জানানো হলো। কালান বেগ ও অন্যান্যেরা এ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, সুলতান মীর্জার সৈন্য-সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং অবিলম্বে প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করলে খোদার ফজলে ও সম্রাটের ভাগ্যের জোরে নিশ্চয় সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হবে।

এর পর শেখ ফুল, মোহাম্মদ কোকাতাশ, কালান বেগ, কনৌজের হাকিম খসরু কোকাতাশের পুত্র এবং আরো কতিপয় আমীরসহ মীর্জা হিন্দাল সুলতান মীর্জার সহিত মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কনৌজ রওয়ানা হলেন। কয়েকটি মঞ্জিল অতিক্রম করে রাজকীয় সেনাদল গঙ্গা-নদীর তীরে গিয়ে উপনীত হলো।

৯। 'ফিরিঙ্গী' বলতে এস্থলে সুরাটের পর্তুগীজ বণিকদের বুঝানো হয়েছে।

১০। শেখ ফুল গোয়ালিয়রের শেখ মোহাম্মদ গওস্-এর ভ্রাতা ছিলেন। সম্রাট হুমায়ুন উভয় দরবেশ-ভ্রাতার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে শেখ ফুল-এর নাম শেখ বাহলুল্ বলেও উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসে শেখ ফুল নামই পাওয়া যায়। (Cambridge History of India, Vol. IV, Page 32; মুনতাখাবুল-তাওয়ারিখ, ২৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এ সংবাদ অবগত হয়েই সুলতান মীর্জা পত্র লিখে আলেগ মীর্জা ও শাহ্ মীর্জাকে অবিলম্বে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁদের জানালেন যে, শাহজাদা হিন্দাল কনৌজ দখল করে নিয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে শাহ্ মীর্জা অতি দ্রুত কোর্‌রা থেকে ফিরে এলেন; কিন্তু আলেগ মীর্জা তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কোন রকমে যুদ্ধ স্থগিত রাখার কথাই সুলতান মীর্জাকে লিখে জানালেন। যা' হোক, সুলতান মীর্জা ও আলেগ মীর্জা এ দু'জনেই যুদ্ধার্থ গঙ্গার অপর তীরে এসে সমবেত হলেন।

শাহজাদা মীর্জা হিন্দাল স্বীয় আমীরগণের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। সকল ওমরাহ্ই একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, আলেগ মীর্জার আগমনে শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার আগেই যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত। আমীরগণের এ অভিমত শুনে মীর্জা হিন্দাল নদী পার হওয়ার সমস্যা উত্থাপন করে প্রশ্ন করলেন—রাজকীয় বাহিনীর বিপুল সংখ্যক লোকের নদী পার হওয়ার মতো এত নৌকা পাওয়া যাবে কোথায়? শাহ্জাদার এ প্রশ্নের জবাবে কালান বেগ কোকা জানালেন যে, যে স্থানে রাজকীয় সেনাদল অবস্থান করছে তা' তাঁরই জায়গীরের এলাকায় অবস্থিত। সুতরাং নিকটস্থ কোন জায়গায় পদব্রজে নদী পার হওয়া সম্ভবপর কি না, সে সন্ধান দিবার মতো লোক তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন। কালান বেগের একথা শুনে শাহজাদা হিন্দাল অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে পুরস্কৃত করে যোগ্য লোক সন্ধান করার নির্দেশ দিলেন।

কালান বেগ স্থানীয় সকল নৌ-চালককে আহ্বান ক'রে তাদের প্রচুর পারিতোষিক দিয়ে পায়ে-হেঁটে নদী পার হওয়ার মতো স্থানের সন্ধান দিতে অনুরোধ করলেন। উপযুক্ত স্থানের সন্ধান দিতে পারলে তাদের আরো হাজার টাকা পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিলেন। নৌ-চালকরা অতঃপর নদীতে নেমে পরীক্ষা শুরু করল এবং দু'দিন পরে তা'রা এসে সংবাদ দিল যে, পাঁচ ক্রোশ দূরে এক জায়গায় নদীতে পানি এত কম যে, সেখানে পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়া যায়। কালান বেগ শাহজাদা হিন্দালের কাছে এসে অগৌণে এ শুভ-সংবাদ জ্ঞাপন করলে শেখ ফুলকে শিবিরে আহ্বান করে দোয়া-দরুদ পাঠ করা হলো। শাহজাদা হিন্দাল নির্দেশ দিলেন যে, শিবির অক্ষুণ্ণ রেখেই সেনাদল নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে—যেন শত্রুপক্ষ রাজকীয় বাহিনীর পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা করতে না পারে।

এ পরিকল্পনা মতোই কাজ করা হলো। রাত্রি এক প্রহরের সময় লোক-লস্কর শিবির ত্যাগ করল এবং রজনীর দ্বিতীয় প্রহর শেষ হওয়ার পূর্বেই সকল সৈন্য নিরাপদে পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে অপর তীরে জমায়েত হলো। মীর্জা

হিন্দাল হুকুম দিলেন যে, রাত্রির অন্ধকার থাকতে থাকতেই সকল সৈন্য উর্দী পরে হাতিয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে থাকবে এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

শাহজাদা হিন্দাল যে সসৈন্যে নদী পার হয়ে যুদ্ধার্থে জমায়েত হয়েছেন, এ সংবাদ অচিরেই সুলতান মীর্জার কর্ণগোচর হলো এবং তাঁর সেনাদলও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হলো। দিনের এক প্রহর অতীত হওয়ার পর উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, এ সময়েই পশ্চিম দিক থেকে এক ধূলি-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হলো। অশ্বের ক্ষুরের আঘাতে উত্থিত ধূলিও ঝঞ্ঝাবাত্যার ধূলির সহিত মিশে চারদিক যেন অন্ধকার করে তুললো। এ ধূলি-ঝঞ্ঝার মধ্যে সুলতান মীর্জার সৈন্যরা শত্রু-মিত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেললো ; বিশৃঙ্খলভাবে লড়াই করতে করতে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে হলো।

আলেগ মীর্জা জৌনপুরের দিকে পলায়ন করলেন। মীর্জা হিন্দাল বেলগ্রাম পরগনা কালান বেগকে দান করে তাঁকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, সম্রাট রাজধানীতে ফিরে এলে পর তাঁর বিশ্বস্ততা ও সেবার জন্যে আরো নানাভাবে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে।

যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুহাম্মদ সুলতান মীর্জা আলেগ মীর্জার সন্ধানে গমন করলেন এবং অযোধ্যার সন্নিকটে পৌঁছে তিনি তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন। উভয় সেনাদল একত্রিত হয়ে মীর্জা হিন্দালের বাহিনীর সহিত পুনরায় মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হলো। বিদ্রোহীদের এ সম্মিলিত বাহিনী ও শাহজাদা হিন্দাল-পরিচালিত রাজকীয় সেনাদল দু'মাস কাল পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে অবস্থান করতে লাগল। হিন্দাল যুদ্ধের জন্যে অধীর হয়ে উঠলেও দরবেশ শেখ ফুল পুনঃ পুনঃ তাঁকে থামিয়ে রাখছিলেন। তিনি বলছিলেন, "আমি মুরাকেবায় মশ্‌গুল্ আছি ; ইন্‌শাআল্লাহ্ শত্রুপক্ষ আপনা থেকেই ঘায়েল হয়ে যাবে।"[১১] দরবেশের এ ভবিষ্যদ্বাণীতে হিন্দাল অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ইতিমধ্যে রাজধানী আগ্রায় সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়া গেল। এ সংবাদ অবগত হয়ে শত্রুপক্ষ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলো। শাহজাদা হিন্দাল তখন দরবেশের মতামত জানতে চাইলেন। শেখ ফুল বল্লেন—"দুশ্‌মনরা যখন যুদ্ধ চাচ্ছে, তখন বাধ্য হয়েই রাজকীয় বাহিনীকেও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।" শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধের দামামা

১১। দরবেশ শেখ ফুল অধ্যাত্ম-শক্তির জন্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। 'সমরাতুল্‌কুদ্দুস্' গ্রন্থে তাঁর কামালিয়াতের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং 'তব্‌কাতে-আকবরী' কেতাবেও তার উল্লেখ আছে (পৃঃ ৩০১)।

বেজে উঠল এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। সম্রাটের ভাগ্যগুণে মীর্জা হিন্দাল এ যুদ্ধেও চরম বিজয়ের অধিকারী হলেন।

স্থলতান মীর্জা তিন পুত্রসহ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর পলায়ন করে বাঙলার সীমান্তে বিহার-খণ্ডের[১২] পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। মীর্জা হিন্দাল জৌনপুরে গিয়ে সেখানকার শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১২। সম্রাট হুমায়ুনের জীবনী লেখক ডক্টর ব্যানার্জী 'বিহার-খণ্ড' শব্দকে 'বিহার-প্রদেশ' বলে গ্রহণ করেছেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক আরস্কিন্ তাঁর গ্রন্থে 'কোচবিহার' লিখেছেন। আমাদের মনে হয়, জওহর কর্তৃক উল্লেখিত 'বিহার-খণ্ড' বিহারের 'ঝাড়খণ্ড' অঞ্চলও হতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্রাটের আগ্রায় উপস্থিতি : শাহজাদা হিন্দালের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন : শেরখানের বিদ্রোহের সংবাদ প্রাপ্তি : চুনার অভিযান ও দুর্গাধিকার

সম্রাট গুজরাট থেকে আগ্রায় ফিরে আসার পর শাহজাদা মীর্জা হিন্দাল বিজয়ী বেশে তাঁর নিকটে হাজির হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। শেখ ফুল এবং অন্যান্য যে-সব ওমরাহ্ সম্রাটের অনুকূলে হিন্দালকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরাও এ শাহী সাক্ষাৎকারে হিন্দালের সহিত ছিলেন। বাদশাহ হিন্দালকে নানাভাবে সম্মানিত করলেন। তাঁদের সম্মানার্থে এক রাজকীয় ভোজের আয়োজন করা হলো এবং বিরাট আড়ম্বরের সহিত হিন্দালের বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেল। মীর্জা আসকরীকে সম্বল জেলার ভারার্পণ করে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, সুলতান মীর্জা যখন নিজের পুত্রদের নিয়ে সম্বলের পাহাড়ী এলাকার দিকেই পলায়ন করেছে, তখন এদের বিরুদ্ধে এমন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক—যেন দুনিয়ায় এদের চিহ্নও আর অবশিষ্ট না থাকে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের পর সম্বলে এসে অবস্থান করার নির্দেশও আসকরীকে প্রদান করা হলো। সম্রাটের এ আদেশ মোতাবেক শাহজাদা আসকরী সম্বলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বিদ্রোহী মীর্জা ও তাঁর পুত্রদের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সম্রাট অতঃপর শেরখানের গতিবিধি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রাজকীয় কর্মচারিগণ সম্রাটের এ প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে, রোহ্‌তাস্ ও ভারকুণ্ড[১] দুর্গের উপর শেরখান নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন এবং অনেক দিন ধরে বাঙ্গালা[২] অবরোধ ক'রে রেখেছেন; সম্ভবতঃ শীঘ্রই বাঙ্গালারও পতন

১। কোন কোন ইতিহাসে 'ঝাড়কুণ্ড' লেখা হয়েছে। (তাবাকাতে-আকবরী—পৃঃ ২০০; ফেরেশ্‌তা—১ম খণ্ড : ৫০৪ পৃঃ ও Cambridge History of India, Vol. IV. Page 30)। সম্ভবতঃ জায়গাটার নাম 'ঝাড়কুণ্ড' কিংবা 'ঝাড়খণ্ড' হতে পারে।

২। 'বাঙ্গালা' বলতে গিয়ে জওহর সম্ভবতঃ বাঙ্গালার তৎকালীন রাজধানী 'গৌড়ের' কথাই উল্লেখ করেছেন। হুমায়ুন যখন সংবাদ পেলেন যে, শেরখান গৌড় অবরোধ করে রেখেছেন, তখন তিনি চুনার দুর্গ দখল করার পরিকল্পনা করে অবিলম্বে সে-দিকে অভিযান করলেন। বাদশাহ হুমায়ুনের এ পরিকল্পনার বিষয় অবগত হওয়া মাত্র শেরখানও গৌড়-নগরীর অবরোধের ভার স্বীয় পুত্রের উপর অর্পণ করে বঙ্গদেশ থেকে অতি দ্রুত চুনারের দিকে অগ্রসর হন।

হবে। এ সংবাদ অবগত হয়ে সম্রাট অত্যন্ত ক্রোধান্বিতভাবে মন্তব্য করলেন—"আফগানদের দম্ভ প্রকৃতই সীমা অতিক্রম করেছে। শীগ্‌গীরই আমাদের চুনার অভিমুখে অভিযান করতে হবে।"

সম্রাট চুনার দুর্গ সম্পর্কে রুমী খানের[৩] মতামত জানতে চাইলেন। রুমী খান উত্তর দিলেন—"আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে আমরা নিজেদের শক্তিবলে এ দুর্গ দখল করতে পারব।" রাজকীয় বাহিনী পরিকল্পনা মতো চুনারের পথে অগ্রসর হলো এবং শবে-বরাতের রজনীতে[৪] চুনার থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে এক স্থানে গিয়ে পৌঁছাল।

রুমী খান এর পর শত্রু-শিবিরের শক্তি-সামর্থ্য এবং দুর্গের কোন্‌ অংশে আক্রমণ চালালে সহজে তা' অধিকার করা সম্ভবপর হবে প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক সন্ধান লাভের জন্যে বিশেষভাবে তৎপর হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীয় ক্রীতদাস কালানাতকে[৫] এমন নির্মমভাবে প্রহার করলেন যে, তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম সৃষ্টি হলো। অতঃপর তিনি তাকে আফগান-শিবিরে গিয়ে তাঁর ক্রীতদাস রূপে নিজেকে পরিচিত করে আশ্রয়প্রার্থী হতে উপদেশ দিলেন। এরূপে দুর্গে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে পরে সেখানকার সকল তথ্য—বিশেষতঃ দুর্গের দুর্বল স্থানগুলি সম্পর্কে সঠিক অবস্থা অবগত হওয়ার পর তাকে পুনরায় ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

কালানাত মুনিবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। সে আফগানদের নিকটে গিয়ে স্বীয় শরীরের আঘাতগুলি দেখিয়ে দুর্গে প্রবেশের অনুমতি লাভ করল। আফগানরা তার আঘাতসমূহে ঔষধ প্রয়োগ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল এবং শীঘ্রই সে আরোগ্য লাভ করল। সুস্থ হওয়ার পর কালানাত আফগানদের মধ্যে প্রচার করল যে, সে একজন বিশেষজ্ঞ এবং কোন্‌ স্থানে কামানগুলি স্থাপন করলে বিপক্ষকে সহজে কাবু করা সম্ভবপর হবে, দুর্গের কোন্‌ অংশের সংস্কার প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ সে দিতে পারে। তার এ ফন্দী সফল হলো। আফগানরা তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে দুর্গের

৩। রুমী খান প্রথমে সুলতান বাহাদুর শাহের কর্মচারী ছিলেন এবং পরে সম্রাট হুমায়ুনের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। সম্রাট তাঁকে 'মীর-আতস' বা গোলন্দাজ-বাহিনীর অধিনায়ক পদ প্রদান করেছিলেন।

৪। ৯৪৫ হিজরী সনের (১৫৩৮ খৃঃ) শবে-বরাতের রজনী।

৫। রুমী খানের এ হাব্‌শী ক্রীতদাসের নাম 'খেলাফত' বলে ইলিয়টের ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে। ষ্টুয়ার্টের অনুবাদে 'কালানাত' নামই দেখা যায়। মৌলবী জাকাউল্লাহ্‌ও 'কালানাত' নামই ব্যবহার করেছেন। সুতরাং মনে হয়—জওহর সঠিক নামটিই ব্যক্ত করেছেন।

বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করার সুযোগ দিল। এভাবে দুর্গের অভ্যন্তরস্থ সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে কয়েক রজনী পরে দুর্গ থেকে পালিয়ে সে আবার রুমী খানের নিকটে ফিরে এলো। কালানাত প্রকাশ করল যে, নদী-তীরস্থ দুর্গ-প্রাকারে আক্রমণ চালাতে হবে এবং অপর দিকে একটা পরিখা খনন করে দুর্গের নিকটে লোকদের সম্মিলিত হওয়ার পথ বন্ধ করে দিতে হবে।

রুমী খান কালানাতের কথামতো নদীরতীস্থ দুর্গ-প্রাকার লক্ষ্য করে বড় বড় কামানগুলি স্থাপন করলেন এবং বিভিন্ন সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে দুর্গের চতুর্দিকে কতিপয় সেনাদল মোতায়েন করা হলো।

এ-সময়ে মোহাম্মদ জামান মীর্জা, সুলতান মীর্জা ও তাঁর পুত্রগণ এসে সম্রাটের নিকটে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সম্রাট উদারতাবশে সকলকে ক্ষমা করে দিলেন।

যে জায়গায় কামানগুলি স্থাপন করা হয়েছিল, সেখান থেকে গোলাবর্ষণ দ্বারা দুর্গ-প্রাকার ভগ্ন করা খুব সহজ হবে না মনে করে রুমী খান অবশেষে নদীর মধ্যস্থলে একটি কাঠের মঞ্চ নির্মাণ করে তার উপরে কামানগুলি সজ্জিত করার পরিকল্পনা করলেন। এ সম্পর্কে সম্রাটের অনুমতি চাওয়া হলে সম্রাট রুমী খানকে জানালেন যে, তিনি যাহা ভাল মনে করেন, তদনুযায়ী যথেচ্ছভাবে কাজ করতে পারেন। সম্রাটের সম্মতি পেয়ে রুমী খান তিনটি বড় নৌকা সংগ্রহ করে তাদের উপর কয়েকটি কামানের মঞ্চ ও দুর্গ-প্রাকার থেকে উঁচু একটা স্তম্ভ নিমাণ করালেন। এসব নির্মাণ-কার্য সমাধা করতে ছয় মাস সময় অতিবাহিত হয়ে গলে।

এর পর সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ভাসমান মঞ্চগুলি নদীর অপর তীরে দুর্গের নিকটে নিয়ে গিয়ে নোঙর করা হলো এবং একযোগে চতুর্দিক থেকে দুর্গের উপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু দুর্গ-মধ্যস্থ আফগানগণ এরূপ দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষা করতে লাগল যে, ভাসমান মঞ্চের একটা অংশ তাদের কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত লড়াই চলল এবং এ লড়াইয়ে সাত শ' মোগল সৈন্য প্রাণ হারাল। সর্ব-প্রকারের চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্গ দখল করা সম্ভবপর হলো না।

পরদিন প্রাতে মঞ্চটি মেরামত করার জন্যে কারিগর নিযুক্ত করা হলো। আফগানগণ যখন বুঝতে পারল যে, দুর্গটি দখল করার জন্যে সম্রাট দৃঢ়-সঙ্কল্প এবং যেমন করেই হোক্ মোগলরা দুর্গ জয় করবেই, তখন হতাশ হয়ে তা'রা সন্ধি প্রার্থনা করতে বাধ্য হলো। এ শর্তে তা'রা আত্ম-সমর্পণ করতে রাজী হলো যে, দুর্গবাসী কাউকে হত্যা করা হবে না। সম্রাট তাদের অভয় দিলেন এবং অতঃপর তারা আত্ম-সমর্পণ করল।

দুর্গের মধ্যে যে-সব আফগান গোলন্দাজ ছিল, রুমী খান তাদের মধ্যে তিন শ' জনের উভয় হস্ত কেটে ফেলার আদেশ দিলেন। তাঁর এ অন্যায় আচরণে সম্রাট অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে মন্তব্য করলেন—"পরাজিত হয়ে যা'রা করুণাপ্রার্থী হয়েছে, তাদের প্রতি এ-হেন অত্যাচার অত্যন্ত গর্হিত।"

দুর্গ বিজিত হওয়ার পর সম্রাট বিরাট এক ভোজোৎসবের আয়োজন করলেন। সকল ওমরাহ্ এ অনুষ্ঠানে শরীক হলেন। অমাত্যদের প্রত্যেককে সম্রাট খেলাত প্রদান করলেন এবং সেনানীদের পদোন্নতি সাধন করা হলো।

সম্রাট অতঃপর রুমী খানকে চুনার দুর্গের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রুমী খান উত্তরে জানালেন—"এ দুর্গ যদি আমার অধিকারে থাকতো, তা'হলে আমি কাউকে এর কাছে ঘেঁষতেও দিতাম না।" সম্রাট জানতে চাইলেন—দুর্গের ভার কা'র উপর ন্যস্ত করা সঙ্গত হবে। রুমী খান জানালেন—"আমীরদের মধ্যে একমাত্র বেজাজ বেগ মীরেক ব্যতীত আর কাউকে আমি এ দায়িত্বের উপযুক্ত মনে করি না।" কাজেই বাদশাহ্ বেগ মীরেককে চুনারের দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

এ ঘটনার পর অন্যান্য ওমরাহ্ রুমী খানের বিরোধী হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা সকলে পরামর্শ করে একদিন বিষ-প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করলেন। এ-ভাবেই রুমী খানের নশ্বর জীবনের অবসান ঘটল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্রাটের বাঙ্গালা দেশে অভিযান

চুনার দুর্গ জয় করার পর সম্রাট সেখান থেকে যাত্রা করে বেনারসের নিকটে এসে শেরখান সুরীর গতিবিধি সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন। রায় বুচা[১] সম্রাটকে জানালেন যে, শেরখান বাঙ্গালা (বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়) অবরোধ করে রেখেছেন এবং যে-কোন সময় তা' অধিকার করে নিবেন বলে মনে হয়। সমগ্র বঙ্গদেশই হয় তো তাঁর দ্বারা অচিরে অধিকৃত হবে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এ সংবাদ পেয়ে সম্রাট মন্তব্য করলেন—"যে পর্যন্ত আফগানরা বাঙ্গালা দেশে অবরোধ চালিয়ে যাবে, সে-সময়ে রোহতাস্ ও ভারকুণ্ড দুর্গের প্রতি মনোযোগী হওয়াই আমাদের উচিত হবে।" তদনুসারে সম্রাট ভারকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হলেন এবং শোন্ নদীর তীরে গিয়ে যখন তিনি পোঁছলেন, তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, শেরখান বাঙ্গালা দখল করে নিয়েছেন এবং বঙ্গদেশের রাজকীয় ধন-ভাণ্ডার রোহতাস্ ও ভারকুণ্ড দুর্গে অপসারিত করার ব্যবস্থা করেছেন।

মহামান্য বাদশাহ অতঃপর শাহজাদা মীর্জা হিন্দাল, মীর্জা ইয়াদগার এবং খসরু কোকাতাশকে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, মীর্জা ইয়াদগার নাসির ও ফখর আলী বেগ রাজধানী দিল্লীতে অবস্থান করবেন। মীর্জা হিন্দাল, নূর মোহাম্মদ মীর্জা ও খসরু কোকাতাশকে সম্রাট আগ্রায় গিয়ে অবস্থান করার হুকুম প্রদান করলেন। এভাবে তাঁদের দিল্লী ও আগ্রার পথে রওয়ানা করে দিয়ে সম্রাট নিজে ভারকুণ্ড দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেন। শীঘ্রই রাজকীয় সেনাদল ভারকুণ্ড দুর্গের নিকটে গিয়ে উপনীত হলো। পথিমধ্যে সম্রাট তুরস্ক-বাসী কাবিল হোসেনকে[২] দূত স্বরূপ শেরখানের নিকটে প্রেরণ করেন। এ দূতের মারফত প্রেরিত এক ফর্মানে সম্রাট শেরখানকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে রাজছত্র, সিংহাসন ও বাঙ্গালার ধন-ভাণ্ডার সম্রাটের খেদমতে পাঠিয়ে দেন এবং রাজকীয় কর্মচারীদের হস্তে বঙ্গদেশ ও রোহতাস দুর্গের অধিকার অর্পণ করেন। এসবের পরিবর্তে শেরখানকে চুনার দুর্গ, জৌনপুর শহর ও তাঁর পছন্দ মতো অন্যান্য কতিপয় স্থানের অধিকার ছেড়ে দিবার প্রস্তাব করা হয়।

১। অধিকাংশ ইতিহাসেই বেনারসের রাজার নাম 'রায় বুচা' বলেই উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে লেখা হয়েছে "রায় পূজা বেনারস-রাজ।"

২। সম্রাট হুমায়ুনের এ দূতের নাম অধিকাংশ ইতিহাসেই 'কাবিল হোসেন' রূপে উল্লেখিত হলেও মৌলবী আহমদুদ্দীন তাঁর গ্রন্থে শুধু 'হোসেন তুর্কমা' লিখেছেন।

সম্রাটের এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে শেরখান জানালেন যে, পাঁচ-ছয় বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ও বহু লোকের প্রাণের বিনিময়ে তরবারির জোরে যে বঙ্গদেশ তিনি দখল করেছেন, তার অধিকার ছেড়ে দিতে তিনি কিছুতেই রাজী নন।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালার শাসনকর্তার এক পত্র পাওয়া গেল। সম্রাট তখন 'গড়হি'[৩] নামক স্থানের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন। বাঙ্গালার শাসকের প্রেরিত পত্রের বিবরণ শ্রবণ করে সম্রাট সম্মুখ দিকে এগিয়ে চললেন। এ সময়েই সম্রাটের প্রেরিত দূত কাবিল হোসেন তুর্কমান ফিরে এসে জানাল যে, শেরখান সম্রাটের ফরমান মেনে নিতে রাজী না হয়ে পার্বত্য-পথে রোহতাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। রাজকীয় সেনাদল 'ময়না'[৪] নামক স্থানের নিকটে গিয়ে যখন উপনীত হলো, বাঙ্গালার পরাজিত শাসক সৈয়দ মাহমুদ আহত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সম্রাটকে জানালেন যে, বঙ্গদেশে তাঁর কাছে এত খাদ্য-শস্য মওজুদ রয়েছে যে, তা হস্তগত করলে সারা দুনিয়ার রাজস্বের সমতূল্য হয়ে দাঁড়াবে। বাদশাহ তাঁকে আশ্বাস দিলেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর কথা শ্রবণ করে জানালেন যে, বাঙ্গালা দেশ পুনর্দখল করে তাঁর হস্তেই প্রদান করা হবে। সম্রাট পরাজিত সৈয়দ মাহমুদকে সাহসের সহিত কাজ করার পরামর্শ দিয়ে মন্তব্য করলেন—"পুরুষদের সর্বদাই এরূপ বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়।"

সম্রাট অতঃপর জাহাঙ্গীর কুলী বেগ, বেগ আলী, জেন্দার বেগ, মগল বেগ, হাজী মুহাম্মদ কোকা, আলী খান মাহাওলী[৫], হায়দর বখশ, মোহর জাম্বুর[৬] এবং আরো কতিপয় ওমরাহকে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হয়ে 'গড়হি' দখল করার আদেশ দিলেন। অমাত্যগণ বাদশার হুকুম মতো রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁরা

৩। বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যবর্তী সীমানায় অবস্থিত তেলিয়াগড়ি গিরিপথকেই জওহর শুধু 'গড়হি' নামে অভিহিত করেছেন।

৪। উইলিয়াম আরস্কিন তাঁর ইতিহাসে এ স্থানের নাম 'মওনিয়া' লিখিছেন। আরা ও দিনাপুরের মাঝামাঝি জায়গায় গঙ্গা ও শোন্ নদীর সঙ্গমস্থলে ইহা অবস্থিত।

৫। আলী খান মাহাওলীর নাম 'আকবর-নামা' গ্রন্থে আলী খান 'মাহাওনী' লেখা হয়েছে এবং মৌলবী জাকাউল্লাহ্র গ্রন্থে 'মাহাওতি' দেখা যায়। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৬। মোহর জাম্বুর—বিভিন্ন ইতিহাসে এ নাম ভিন্ন ভিন্ন রূপে লেখা হয়েছে। সম্ভবতঃ লিপিকর কাতেবদের ভ্রমের জন্যেই এরূপ হয়েছে। একখানা গ্রন্থে 'মীর জাম্বুর' লেখা নজরে পড়ে। সম্ভবতঃ এ জন্যেই ষ্টুয়ার্ট তাঁর অনুবাদে জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ব্যতীত অন্যান্য সকল নাম বাদ দিয়েছেন।

যখন 'গড়হির' নিকটে গিয়ে উপনীত হলেন তখন জানা গেল যে, শেরখানের পুত্র জালাল খান সেখানে অবস্থান করছেন। রাজকীয় আমীরগণ যুদ্ধার্থ এগিয়ে গেলেন এবং এমন এক স্থানে গিয়ে পেঁীছালেন, যেখানে জালাল খানের লোকেরা মোতায়েন ছিল। এ স্থানের এক দিকে গঙ্গা ও অপর দিকে পাহাড়-শ্রেণী দণ্ডায়মান ছিল। এ পাহাড়ের মধ্যে সরু একটি উপত্যকা-পথ ছিল এবং জালাল খানের লোকেরা আগে থেকেই তা' দখল করে রেখেছিল। জালাল খান স্বয়ং এক শক্তিশালী সেনাদলসহ সেখানে উপস্থিত হলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এ যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনীকে পরাজয় বরণ করতে হলো। মোগল ওমরাহদের মধ্যে আলী খান মাহাওলী ও হায়দর বখশ এ যুদ্ধে নিহত হন।

এ যুদ্ধের সংবাদ সম্রাটের নিকট পেঁীছালে তিনি অতিশয় দুঃখিত হলেন। যেসব ওমরাহ এ যুদ্ধের পর জীবিত ছিলেন, তাঁরা কাহালগ্রাম[৭] নামক স্থানে এসে মূল বাহিনীর সহিত যোগদান করলেন। অতঃপর সেনাদল সম্মুখে অগ্রসর হলো। এ সময়ে আল্লাহর কুদরতে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা পরে যখন বৃষ্টি থেমে গেল, তখন শিবির সন্নিবেশ করে হাজী মুহাম্মদ বেগকে গড়হি এলাকার খোঁজ-খবর নিতে ও জালাল খানের অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্যে প্রেরণ করা হলো। হাজী মুহাম্মদ সম্রাটের নির্দেশ পালন করে ফিরে এসে সংবাদ দিলেন যে, জালাল খান গড়হিতেই রয়েছেন এবং শের খান তাঁর পুত্রকে লিখে জানিয়েছেন যে, তিনি ধনরত্ন রোহতাসে প্রেরণ করেছেন। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হওয়ার পর সম্রাটের বঙ্গদেশে গমনের পথ খুলে দিয়ে জালাল খানকে গড়হি ত্যাগ করার নির্দেশও যে শেরখান দিয়েছেন, হাজী মুহাম্মদ এ সংবাদও দিলেন। কয়েক দিন পর জালাল খান যখন খবর পেলেন যে, শেরখান রোহতাসে পেঁীছে গেছেন, তখন তিনিও গড়হি ত্যাগ করলেন। হাজী মুহাম্মদ কাশকাহ ও মগল বেগ মধ্যরাত্রে সম্রাটের কাছে এসে জালাল খানের গড়হি ত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্রাট সে-সময়েই যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে সেনাদলকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি সসৈন্যে বাঙ্গালায় (গৌড়ে) উপনীত হলেন।

বাঙ্গালার অধিবাসিগণ আফগানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ছিল। গৌড় নগরে যত্রতত্র মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং গ্রাম ও বাজারগুলি আফগানরা তছনছ করে দিয়েছিল। কিন্তু সম্রাটের শুভাগমনে শীঘ্রই সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল এবং শহরে নয়া বসত গড়ে উঠল। সম্রাট

৭। কাহালগ্রাম—কোলগাঁও।

[illegible] আমীরদের মধ্যে বাঙ্গালা দেশ ভাগ করে দিলেন এবং এখানে নয় মাস[৮] [illegible] অবস্থান করেন। এ-সময়ে সম্রাট এত আনন্দে ছিলেন যে, একমাস কাল [illegible] প্রাসাদের বাইরে আসেন নি; মহলের অভ্যন্তরেই সকল সময়ে তিনি আমোদে [illegible] অতিবাহিত করছিলেন।

শেষে খবর পাওয়া গেল যে, শেরখান বেনারস দখল করে নিয়েছেন এবং [illegible] শো মোগস সহ মীর নজরিণকে[৯] হত্যা করা হয়েছে। আরো জানা গেল যে, চুনার দুর্গ ও জৌনপুর শহর অবরোধ করে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শেরখানের সেনাদল কনৌজ পর্যন্ত পৌঁছে সে শহরও দখল করেছে এবং মীরাণ সৈয়দ আলাউদ্দীন বোখারীর পরিবারের লোকজনকে বন্দী করে রোহতাস দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও সংবাদ পাওয়া গেল।

এসব অপ্রত্যাশিত সংবাদ সম্রাট প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন নি। সংবাদ শ্রবণ করে তিনি মন্তব্য করলেন—"শেরখান এরূপ কাজ করতে সাহসী হবেন, তা' হতে পারে না!" কিন্তু অবশেষে সংবাদের সত্যতায় যখন আর কোন সন্দেহ রইল না, সম্রাট তখন সকল ওমরাহকে আহবান করে এক দরবারের অনুষ্ঠান করলেন। ভাবী কর্তব্য সম্পর্কে সকলের মতামত জানতে চেয়ে শেষে তিনি প্রশ্ন করলেন—"বাঙ্গালা দেশের শাসন-কর্তৃত্ব কা'র হস্তে ন্যস্ত করা উচিত?" উত্তরে আমীরগণ জানালেন যে, সম্রাট যাঁকে ইচ্ছা তাঁকেই এ কর্তব্য-ভার অর্পণ করতে পারেন। আমীরগণ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের এ-হেন অভিমত অবগত হয়ে সম্রাট শেষে বললেন—"জাহীদ বেগ ইতিপূর্বে বহুবার পদোন্নতি ও অনুগ্রহ লাভের আকাঙক্ষা প্রকাশ করেছেন। এবার আমি তাঁকেই বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পুরস্কৃত করব। তাঁর অধীনে কয়েক জন সেনানী ও তাঁদের অধীনস্থ সেনাদলও রেখে যাওয়া হবে।"

জাহীদ বেগ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে অবস্থান করতে অনিচ্ছুক হয়ে তিনি সম্রাটের কাছে নিবেদন করলেন—"আমাকে হত্যা করার জন্যে বাঙ্গালা ব্যতীত অপর কোন স্থান কি শাহানশাহ পেলেন না?" জাহীদের এ উক্তিতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হয়ে সম্রাট বলে উঠলেন—"এ দুর্বল-চেতা হতভাগ্যকে আমি এক্ষণি হত্যা করব।" জাহীদ বেগ তখনি দরবার ত্যাগ করে বাইরে চলে গেলেন।

৮। তাবাকাতে-আকবরী ও ফেরিশ্‌তা গ্রন্থে হুমায়ুনের বাঙ্গালা দেশে তিন মাস অবস্থানের কথা লেখা হয়েছে। (তাবাকাত্, ৬০০ পৃঃ ও ফেরিশ্‌তা, ১ম খণ্ড, ৪০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৯। সম্ভবতঃ 'নজরিণ' নাম ঠিক নয়। আরস্কিন ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে 'মীর ফজল' লেখা হয়েছে। মীর ফজল বেনারসের হাকিম ছিলেন। (আরস্কিন, ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃঃ)।

সম্রাটের রোষ-বহ্নি থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে জাহীদ বিগা বেগমের[১০] শরণাপন্ন হলেন। বেগম তাঁর পক্ষ সমর্থন করে সম্রাটের নিকট অনুরোধ করলেন যে, জাহীদের অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে বঙ্গদেশে রেখে যাওয়া হোক। কিন্তু বেগমের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সম্রাট জাহীদ বেগকে ক্ষমা করতে সম্মত হলেন না এবং তাঁর দণ্ডাদেশ প্রদান করলেন। বেগম তখন সংবাদ পাঠিয়ে জাহীদকে সতর্ক করে দিলেন যে, তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; সুতরাং আত্মরক্ষার উপযুক্ত পন্থা স্বয়ং জাহীদকেই বের করতে হবে। বিগা বেগমের ভগ্নীকে জাহীদ বিবাহ করেছিলেন বলেই বেগম তাঁর প্রতি এভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

জাহীদ বেগ তখন পলায়ন করার সঙ্কল্প করলেন এবং হাজী মুহাম্মদ কোকা ও জেন্দার বেগকে ফুসলিয়ে তিন জনে মিলে এক সঙ্গে পলায়ন করলেন। আগ্রাতে গিয়ে তাঁরা শাহজাদা হিন্দালকে বিদ্রোহ করার জন্যে উত্তেজিত করলেন। তৎকালে আগ্রায় অবস্থানকারী খসরু কোকাতাশ ও অপর কতিপয় ওমরাহর পরামর্শে মীর্জা হিন্দাল আগে থেকেই স্বীয় নামে খোৎবাহ্ পড়ানোর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আসছিলেন। নূরুদ্দীন মুহাম্মদ মীর্জা হিন্দালকে বলেন যে, তাঁর নামে খোৎবাহ্ পড়াতে হলে আগে শেখ ফুলকে হত্যা করতে হবে; কারণ তা' হলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, তিনি (হিন্দাল) সত্যি সত্যি বাদশার বিরোধী। এসব আমীর শাহজাদাকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, যদি তিনি শেখ ফুলকে হত্যা করতে পারেন, তা'হলে তাঁর নামে খোৎবাহ্ পড়ানোর ব্যাপারে তাঁরা তাঁকে সাহায্য করবেন। এর পর হিন্দাল নূরুদ্দীন মুহাম্মদ মীর্জাকে যে-কোনও অজুহাতে শেখকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। শেখ ফুলের বিরুদ্ধে শেরখানকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহ ও তাঁর সহিত পত্রালাপ করার মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা হলো এবং এ-অভিযোগেই তাঁকে শেষে হত্যা করা হলো। এর পর মীর্জা হিন্দালের নামে খোৎবাহ্ পাঠের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এ সংবাদ লাহোরে শাহজাদা কামরানের কাছে গিয়ে পৌঁছালে তিনি মন্তব্য করলেন যে, বাদশাহ' যখন বাঙ্গালা দেশে রয়েছেন, এ-সময়ে রাজধানীতে হিন্দালের নামে খোৎবাহ্ পড়ানো মোটেই সঙ্গত হয় নি। আমীর-ওমরাহ্র সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি স্থির করলেন যে, দিল্লী ও আগ্রায় গমন করে তিনি এ অপকর্মের প্রতিবিধান করার চেষ্টা করবেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলবলসহ মীর্জা কামরান দিল্লীর পথে যাত্রা করলেন। মীর্জা ইয়াদগার নাসির ও ফখরুদ্দীন আলী বেগ

১০। বিগা বেগম সম্রাট হুমায়ুনের অন্যতমা মহিষী ছিলেন।

সময়ে দিল্লী দুর্গে অবস্থান করছিলেন এবং হিন্দাল দিল্লী অবরোধ করে রেখেছিলেন। শেখ ফুলের হত্যাকাণ্ড ও মীর্জা হিন্দালের নামে খোৎবাহ্ পড়ানোর সংবাদ যখন বঙ্গদেশে সম্রাটের কাছে গিয়ে পৌঁছাল, তিনি তখন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন এবং তখনি খান-খানান লোদীকে স্বীয় সেনাদলসহ মুঙ্গেরের পথে যাত্রা করার আদেশ দিয়ে পরামর্শ দিলেন যে, মুঙ্গেরে পৌঁছে সম্রাটের মূল বাহিনীর জন্যে তিনি যেন অপেক্ষা করে থাকেন। আদেশ মতো খান-খানান অগৌণে যাত্রা করলেন এবং যথাসময়ে মুঙ্গেরে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

সম্রাট অতঃপর বাঙ্গালা দেশের শাসন-ব্যবস্থা সংগঠনে উদ্যোগী হলেন। জাহাঙ্গীর কুলী বেগ, শাদমান বেগ, নেহাল আবু তোরাব বেগ এবং আরো কতিপয় আমীরকে তিনি বঙ্গদেশে অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। বাঙ্গালা ত্যাগ করে তিনি এর পর মুঙ্গেরের পথে যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল যে, গোপনে ষড়যন্ত্র করে খোয়াস্ খান মুঙ্গের দুর্গের দরজা খুলে খান-খানান লোদীকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করে শেরখানের নিকটে নিয়ে গেছে। এ সংবাদ পেয়ে সম্রাট অতিশয় মর্মাহত হলেন।[১১]

অতঃপর মীর্জা আসকরীকে আহ্বান করে শেরখানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করে শাহানশাহ তাঁকে জানালেন যে, বিনিময়ে তিনি তাঁর যে-কোন চারটি প্রার্থনা মঞ্জুর করতে প্রস্তুত আছেন। স্বীয় আমীরদের সহিত পরামর্শ করে সম্রাটকে স্বীয় মতামত জানাবেন বলে মীর্জা আসকরী তখনকার মতো সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

শাহাজাদা আসকরী স্বীয় আমীরদের সম্রাটের অভিপ্রায় জানালে পর তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে শাহজাদাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সম্রাটের কাছে তাঁর নিজের প্রার্থনা কি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। মীর্জা আসকরী বল্লেন—"কিছু অর্থ, বাঙ্গালার কয়েকটি দ্রব্য-সামগ্রী, কয়েক জন সুন্দরী বাঁদী ও কতিপয় খোজা-ভৃত্যই আমি পেতে চাই।" শাহজাদার এ উত্তরে তাঁর আমীরগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁদের এ বিস্ময়-ভাব লক্ষ্য করে তিনি আমীরদের খোলাখুলিভাবে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতে অনুরোধ করলেন। অবশেষে আমীরগণ বল্লেন—"সম্রাট এক্ষণে শেরখানের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত এবং সঙ্কটজনক অবস্থায় নিপতিত। সুতরাং এ সময়ে আমাদের তাঁর কাছে

১১। খান-খানান মোগল দরবারের একজন পাঠান অমাত্য ছিলেন বলে অনেকে সন্দেহ করেন যে, শেরখানের সহিত ষড়যন্ত্র করেই তিনি নিজেকে বন্দীরূপে রোহতাস্ দুর্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

একদল সাহসী ও দুর্ধর্ষ সৈনিক, কিছু-সংখ্যক অদ্ভুতকর্মা লোক এবং বেশ মোটা রকম অর্থ চাওয়াই উচিত। সম্রাটকে জানিয়ে দিতে হবে যে, তিনি এ যুদ্ধের ভার আমাদের উপর অর্পণ করুন। এর পর কি হয়, আমরাই তা' দেখব, আর দেখবেন শেরখান।"

আমীরদের এ প্রস্তাব মীর্জা আসকরীর মনঃপূত হলো। তিনি সম্রাটের নিকটে গিয়ে এ দাবী পেশ করলে সম্রাট আনন্দের সহিত তা গ্রহণ করলেন। প্রচুর নগদ অর্থ ও বিবিধ উপহার-দ্রব্য আসকরীর অধীনস্থ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণের জন্যে প্রদান করা হলো। এতদ্ব্যতীত কাসেম কুরাচা, কালান বেগ কোকা, বাবা শেখ কোরবেগী এবং আরো কতিপয় সুদক্ষ সেনানীর অধীনস্থ একদল সাহসী সৈন্যকে শাহজাদার অধীনে ন্যস্ত করা হলো। এর পর এ সেনা-বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে সম্রাট জানালেন যে, গড়হি হয়ে 'কাহালগ্রামে' (কোলগাঁও) গিয়ে তাদের সম্রাটের বাহিনীর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে শেরখানের গতিবিধির সংবাদ নিয়মিতভাবে সম্রাটকে জানানোর জন্যেও নির্দেশ দেওয়া হয়।

সম্রাটের নির্দেশ মোতাবেক শাহজাদা আসকরীর বাহিনী অগ্রসর হয়ে কয়েক দিন পর কাহালগ্রামে গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে জানা গেল যে, শেরখানের সেনাদল চুনার ও জৌনপুর দুর্গ অবরোধ করে রেখেছে এবং কনৌজ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরো অবগত হওয়া গেল যে, শেরখান তাঁর সমগ্র সেনা-বাহিনী রোহ্‌তাসের আশে-পাশে ও নিকটস্থ এলাকায় মোতায়েন করে পশ্চিমের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছেন।[১২]

মীর্জা আসকরী এসব সংবাদ সম্রাটকে অবগত করালেন। রাজকীয় বাহিনী ইতিমধ্যে বাঙ্গালা (গৌড়) থেকে যাত্রা করে মুঙ্গেরে গিয়ে পৌঁছাল। শাহজাদা আসকরী ও তাঁর অধীনস্থ আমীরগণ অগ্রসর হয়ে নদীতীরে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করলেন। সকল অমাত্য ও সেনানীদের আহ্বান করে সম্রাট তাঁদের সহিত ইতিকর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ করতে বসলেন। গঙ্গানদী পার হওয়া উচিত হবে, না নদীর উত্তর তীর ধরেই সোজা এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য—এ-সম্পর্কে সম্রাট সকলের মতামত জানতে চাইলেন। ফুল বেগ, মোল্লা মুহাম্মদ ফরখ আলী[১৩] এবং অন্যান্য

১২। শেরখান এ সময়েই 'শাহ' উপাধি গ্রহণ-করে নিজেকে 'শেরশাহ্' রূপে পরিচিত করা আরম্ভ করেন। (Cambridge History of India, Vol. IV, Page 31 দ্রষ্টব্য)।

১৩। বিভিন্ন ইতিহাসে এ দু'জন আমীরের নাম সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। ফরখ আলীর নাম কোন কোন ইতিহাসে 'ফরা আলী' লেখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে ইহা লিপিকর-প্রমাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফুল বেগ আর শেখ ফুল এক ব্যক্তি নন। অধিকাংশ ইতিহাসে 'ফুল বেগ' নাম দেখা গেলেও, অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ নামটা 'পাহলোয়ান বেগ' হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

আমীর অভিমত প্রকাশ করলেন যে, নদী পার হওয়া উচিত হবে না; নদীর তীর ধরে সোজা জৌনপুরের দিকে এগিয়ে যাওয়াই সঙ্গত। তাঁরা আরও বললেন যে, যে-পর্যন্ত স্থানীয় সৈন্য ও দিল্লী অঞ্চল থেকে আগত সেনাদল সাজ-সরঞ্জাম একত্রিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত জৌনপুরেই অবস্থান করতে হবে এবং বর্ষা ঋতু শেষ হওয়ার পরই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত হবে। মোয়ীদ বেগ এ অভিমতের বিরোধিতা করে বল্লেন যে, যদি সেনা-বাহিনী নদী পার না হয়ে সোজা উত্তর তীর ধরে এগোতে থাকে, তা'হলে শেরখান মনে করবেন যে, সম্রাট ভয় পেয়েছেন। এতে তাঁর সাহস আরো বেড়ে যাবে। কাজেই নদী পার হয়ে অগ্রসর হওয়াই উচিত হবে।—মানুষের অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, তখন স্বভাবতঃই তাদের পরিণামদর্শিতা লোপ পায়। সম্রাট মোয়ীদ বেগের অভিমতকেই মেনে নিলেন এবং সেনাদলকে নদী পার হওয়ার আদেশ দিলেন। ফুল বেগ ও মোল্লা মুহাম্মদ ফরখ আলী এ-সময়েও পুনরায় সম্রাটের কাছে নিবেদন করলেন যে, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে তা'যে ঠিক নয় আবার তিনি তা' ভেবে দেখুন। কিন্তু তাঁদের এ আবেদনে কোন কাজই হলো না।

নদী পার হওয়ার পর সমগ্র সেনা-বাহিনী যখন বিখ্যাত ওলি-আল্লাহ্ হজরত শেখ ইয়াহিয়া মানেরীর[১৪] মাজারের কাছে এসে পৌঁছাল, তখন সেনাদলের পশ্চাৎরক্ষীদের কতিপয় লোক সম্রাটের কাছে এসে জানাল যে, নিকটেই আফগান সেনাদের দেখা গিয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে সম্রাট আদেশ দিলেন যে, সকল সৈন্যই যেন স্ব স্ব সাজ-সরঞ্জাম ও হাতিয়ার নিজেদের কাছে রাখে, এ-মর্মে ঘোষণা প্রচার করা হোক। সেনাদল এভাবেই আরো সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং দ্বিতীয় দিন উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তীর-ধনুকের সাহায্যে কিছু খণ্ডযুদ্ধও হয়ে গেল।

তৃতীয় দিন রাজকীয় বাহিনী পুনরায় সম্মুখে অগ্রসর হলো। কিন্তু খবর পাওয়া গেল যে, যে-সব কামানের সাহায্যে চুনার দুর্গ দখল করা হয়েছিল, আফগানরা সে-সব কামানের নৌকাগুলি দখল করে নিয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে সম্রাট সকল সৈন্যকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার আদেশ দিলেন। চতুর্থ দিন বেলা এক প্রহরের সময় সেনাদল যখন 'চৌসা'[১৫]

১৪। শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী পাক-ভারতের অন্যতম বিখ্যাত আওলিয়া। সোনারগাঁয়ের বাসিন্দা হজরত শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার শিষ্য রূপে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল ইনি বঙ্গদেশে ছিলেন। (অনুবাদকের "পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামের আলো" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

১৫। 'চৌসা'—বিহার ও বেনারস অঞ্চলের সীমানা-নির্ধারক 'কর্মনাশা' নদীর সামান্য দূরে এ স্থানটি অবস্থিত। (Cambridge History of India, Vol. IV, Page 31 দ্রষ্টব্য)।

নামক স্থানে উপনীত হলো, তখন পূর্ব দিকে দূরে অস্পষ্ট কিছু দেখা গেল। কিছুক্ষণ পরেই লোকেরা এসে খবর দিল যে, শেরখান তাঁর সৈন্যদল নিয়ে সম্মুখে এসে উপনীত হয়েছেন। এ অবস্থায় কি করা যায়, সম্রাট তৎসম্পর্কে অমাত্যদের সহিত পরামর্শ করলেন। কাসেম হোসেন সুলতান বল্লেন—"শের খান আজ আঠারো ক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছেন। তাঁর অশ্বগুলি অতি-মাত্রায় পরিশ্রান্ত, আর আমাদের সৈন্যদের ঘোটকসমূহ তুলনামূলকভাবে অধিকতর যুদ্ধোপযোগী রয়েছে। সুতরাং আজই আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। দেখি, আল্লাহ্‌তা'লা কাদের জয়ী করেন।"

এ প্রস্তাবে বাদশাহ সম্মতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু মোয়ীদ বেগ এবারও আমীরদের অভিমতের বিরুদ্ধে স্বীয় মতামত জাহির করেন। সম্রাটও শেষে মোয়ীদ বেগের অভিমতের সমর্থন করে বললেন যে, যুদ্ধের ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করা উচিত নয়। সম্রাটের এ সিদ্ধান্তে আমীরগণ ও সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ল।

যা হোক, রাজকীয় বাহিনী শিবির সংস্থাপনের ব্যবস্থা করল। নিকটেই শেরখানও তাঁর সেনাদলের শিবির গঠন করে তার চতুষ্পার্শ্বে এক পরিখা খনন করালেন। অতঃপর প্রায় দু'মাস কাল উভয় পক্ষের সেনাদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে রইল এবং এ-সময় মধ্যে প্রায় প্রত্যহই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় দু'দলেরই কিছু কিছু লোক নিহত হয়। আড়াই মাস পরে বর্ষা-ঋতু শুরু হওয়ায় শেরখাঁর শিবির প্লাবিত হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে শেরখানকে এ-সময়ে তিন চার ক্রোশ দূরে এক পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে নূতনভাবে শিবির স্থাপন করতে হলো। দৈনন্দিন খণ্ডযুদ্ধ তখন থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

অবশেষে স্থিরীকৃত হলো যে, শেরখানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুতবল্-আকতাব্ শেখুল্-ইসলাম হজরত ফরিদুদ্দীন গঞ্জশকর-এর বংশধর মাননীয় শেখ খলিল সাহেবকে সন্ধি-শর্ত স্থির করার জন্যে শেরখানের শিবিরে প্রেরণ করা হলো। শেরখানের সহিত সাক্ষাৎ করে সন্ধি-স্থাপনের ব্যাপারে শেখ সাহেব সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। শেরখান এ শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে সম্মত হন যে, চুনার দুর্গটি তাঁকে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

শেখ খলিল শেরখানের এ দাবীর কথা সম্রাটকে লিখে জানালেন। তিনি এ-কথাও জানালেন যে, যদি দুর্গটি শেরখানকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তা'হলে শান্তির

শান্তিরে তিনি সন্ধি স্থাপন করতে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। সম্রাটের অমাত্যবর্গ চুনার দুর্গ ছেড়ে দেওয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল শর্ত বলে মত প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত এ-জন্যেই সন্ধি স্থাপনের কথাবার্তার পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৬]

১৬। ফেরিশ্‌তা, নিজামুদ্দীন ও বদায়ুনী এ ঘটনা সম্পর্কে ভিন্নরূপ বিবরণীই পেশ করেছেন। তাঁদের মতে —শেখ খলিল ছিলেন শেরখানের পীর এবং শেরখানই তাঁকে সন্ধি-শর্ত স্থির করার জন্যে হুমায়ুনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা এ অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, শুধুমাত্র চুনার দুর্গই নয়, বরং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অধিকারও শেরখান সন্ধির শর্ত স্বরূপ দাবী করেছিলেন। ফেরিশ্‌তা ও বদায়ুনীর মতে শর্ত অনুযায়ী সন্ধি স্থাপিত হয় এবং শেরখান পবিত্র কোরআন স্পর্শ করে সন্ধি-শর্ত পালনের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে অতর্কিতভাবে বাদশাহী সেনা-দলকে আক্রমণ করেন। জওহরের বিবরণী ও উল্লেখিত ঐতিহাসিকদের বর্ণনার মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাতে অনুমান করা চলে যে, সম্ভবতঃ শেরখান চুনার দুর্গ ব্যতীত বঙ্গদেশের অধিকারও দাবী করেছিলেন। পাকাপাকিভাবে সন্ধি স্থাপিত হয় নি'—জওহরের এ বর্ণনাকেও আমরা সত্য বলে ধরে নিতে পারি। (তাবাকাতে-আকবরী, ২০১ পৃঃ; বদায়ুনী ৯৪ পৃঃ ও তারিখে-ফেরিশ্‌তা, ১ম খ ৪০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আফগানদের নৈশ-আক্রমণ ও তার পরিণাম

সন্ধির আলোচনা যখন ভেঙ্গে গেল, শের খান তাঁর অমাত্যবর্গকে আহ্বান করে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমাদের মধ্যে কেউ কি যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে মোগল বাদশাহের সেনাদলের মাঝখানে ঝাপিয়ে পড়তে রাজী আছ?" প্রথমে কোন আফগান আমীরই এ প্রশ্নে কোনরূপ সাড়া দিলেন না। অবশেষে খোয়াস্ খান নামক এক ব্যক্তি এ দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়ে জানাল যে, যদি তাকে কতিপয় নামকরা যোদ্ধা, কয়েকটি রণ-হস্তী ও একদল সুশিক্ষিত সৈন্য দেওয়া হয়, তা' হলে সে বাদশার সেনাদলের উপর আক্রমণ পরিচালনার চেষ্টা করতে পারে। সে মত-প্রকাশ করল যে, প্রকৃতই সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে এবং পরিণাম যাই হোক না কেন, আন্তরিকতার সহিত সে কাজ করে যাবে; দেখা যাক আল্লাহ্ কাকে বিজয়ী করেন।

শের খান খোয়াস খানের প্রস্তাবে অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং বহু-সংখ্যক সৈন্য ও কয়েকটি রণনিপুন হস্তী তার অধীনে ন্যস্ত করলেন। খোয়াস খান দিবাভাগে যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে রাত্রিকালে অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনার মতলব করল। পূর্বাহ্ন এক প্রহরের সময় তার সেনাদল আফগান শিবির ত্যাগ করলেও কুচক্রী সেনাপতি সারা দিন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াল।

এ-সময় শেখ খলিল এক পত্র মারফত সম্রাটকে জানালেন যে, তিনি শের খানকে সন্ধি স্থাপনে সম্মত করিয়েছিলেন। কিন্তু কথাবার্তা পাকাপাকি হওয়ার আগেই আলোচনা ভেঙ্গে গেল। এ অবস্থায় সম্রাটকে হুশিয়ার থাকা দরকার। কারণ, খোয়াস খান এক বিরাট সেনাদল নিয়ে জোহরের সময় শিবির থেকে বেরিয়ে গেছে এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যে-কোন প্রকার দুষ্কৃতি সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, কোন রূপ সতর্ক-বাণীই তখন কাজে আসে না! সম্রাট শেখ খলিলের কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। খোয়াস খান সম্পর্কে মোয়ীদ বেগ মন্তব্য করলেন—"এ হচ্ছে গোলামের বাচচা। আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সে কেমন করে!"[১]

১। 'তারিখে-ফেরিশতা' খোয়াস খানের পিতার নাম 'মালিক সাক্‌হা নামীয় 'গোলাম' বলে উল্লেখ করেছে। নিজামুদ্দীনের ইতিাসে শুধু 'মালিক সাকাঁহ্' লেখা হয়েছে। মনে হয়—খোয়াস খান প্রকৃতই ক্রীতদাসের বংশজ ছিল। (তাবাকাতে-আকবরী, ৩২৫ পৃঃ এবং তারিখে-ফেরিশ্‌তা, ১ম খণ্ড, ৪১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

এ-ধরনের অবজ্ঞাবশেই মোগল-শিবিরের লোকজন কোনরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে সম্পূর্ণ বেপরওয়াভাবে রাত্রি যাপন করল। কিন্তু পর দিন খুব ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই খোয়াস খান মোগল-শিবিরের পশ্চাদ্দিক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল এবং যথেচ্ছভাবে লুটতরাজ ও মারামারি শুরু করে দিল।[২] এরূপ অতর্কিত হামলায় মোগল সৈন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল এবং খোয়াস খানের আক্রমণে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেই সম্রাট তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করে রণডঙ্কা বাজানোর আদেশ দিলেন। শীঘ্রই কম-বেশী তিন শো সৈনিক এসে সম্রাটের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হলো।

দেখা গেল, শত্রুপক্ষের একটা রণহস্তী নিয়ে জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে আসছে। সম্রাট মীর বাচ্‌কের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু সে এগিয়ে গেল না, মস্তক অবনত করে দাঁড়িয়ে রইল। এ ব্যক্তির গুর্গ আলী ও তান্‌হা বেগ[৩] নামক দু' পুত্র ছিল। এদের একজনের কাছে সম্রাটের দু'-নালা বন্দুক থাকত এবং অপর জন তাঁর বর্শা বহন করত। তিন পিতা-পুত্র বীরত্ব ও সাহসের জন্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। কিন্তু বাদশাহ্ যখন দেখলেন এরাও সাহস হারিয়ে ফেলেছে এবং যুদ্ধ করার মতো মনোবল এদের মোটেই নেই, তখন গুর্গ আলীর হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি নিজেই হস্তীটির মস্তক লক্ষ্য করে সজোরে তা নিক্ষেপ করলেন। হস্তীর উপরে যে সৈনিকটি উপবিষ্ট ছিল, সে তখন সম্রাটকে লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করল। উক্ত তীর সম্রাটের হস্তে বিদ্ধ হলো। সম্রাটের নিক্ষিপ্ত বর্শা হস্তীর মস্তকে এমনভাবে বিদ্ধ হলো যে, তা' টেনে তোলা গেল না। সুতরাং বর্শাটি হস্তীর মস্তকে বিদ্ধ অবস্থায় পরিত্যাগ করেই সম্রাট স্বীয় দলে ফিরে এলেন এবং উচ্চৈস্বরে সকলকে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সম্রাটের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কাওকে এ আহ্বানে সাড়া দিতে দেখা গেল না। পরিণামে আফগানগণ সম্রাটের সমগ্র সেনা-বাহিনীকেই ছিন্নভিন্ন করে দিতে সমর্থ হলো।[৪]

২। তাবাকাতে-আকবরী ও তারিখে-ফেরিশ্‌তায় বর্ণিত হয়েছে যে, শের খান তাঁর বাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করে আক্রমণ পরিচালনা করেন। খোয়াস খান শিবিরের পশ্চাদ্দিকস্থ পীলখানা ও আস্তাবলের পথে শিবির মধ্যে প্রবেশ করার পর অপর দু' দলও আক্রমণে যোগ দেয়। (তাবাকাতে-আকবরী, ৩২৫ পৃঃ ও তারিখে-ফেরিশ্‌তা, ১ম খণ্ড, ৪১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

৩। ষ্টুয়ার্টের অনুবাদে 'তেতা বেগ' নাক দেখা যায়।

৪। চৌসার এ যুদ্ধ ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে সংঘটিত হয়। (Cambridge History of India, Vol. IV, page 33 দ্রষ্টব্য)।

এ-সময়ে এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এসে সম্রাটের অশ্বের লাগাম ধারণ করে বলতে লাগল—"দাঁড়িয়ে থাকার সময় এ নয়। সমগ্র সৈন্য-বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছে। আপনি কাদের ভরসায় দাঁড়িয়ে আছেন? যখন নিজের বন্ধুরাও ত্যাগ করে চলে যায়, তখন পলায়নই একমাত্র পথ।"

শাহানশাহ্ তখন নদী-তীরের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি নদীর কিনারায় গিয়ে পৌঁছলেন, সে সময়ে 'গির্দবাদ' নামক রাজকীয় হস্তীটি তাঁর সঙ্গে ছিল। সেখানে যে সেতুটি ছিল, সম্রাট তা' ভেঙ্গে দিবার আদেশ দিলেন এবং উক্ত হস্তীর সাহায্যে তা' ভেঙ্গে দেওয়া হলো।[৫]

সম্রাট অতঃপর তাঁর অশ্বসহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই অশ্বটি তাঁকে পরিত্যাগ করে আলাদা হয়ে গেল। এ-সময়ে একটি লোক নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে একটি খালি মশকে হাওয়া ভর্তি করে তা' নদীতে নিক্ষেপ করল এবং সম্রাটকে উক্ত মশকের সাহায্যে সাঁতার কেটে তীরে ওঠার জন্যে ইঙ্গিত করল। বাদশাহ্ মশকটি ধরে ফেলে তার সাহায্যে শীঘ্রই তীরে পৌঁছালেন এবং লোকটিকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি নিজের নাম 'নিজাম' বলে উল্লেখ করলে হুমায়ুন বলে ওঠলেন—"নিজামুদ্দীন আওলিয়া!"[৬]

এভাবে চরম বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে সম্রাট আল্লাহ্র শোক্রিয়া আদায় করলেন এবং ভিশ্তি নিজামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বল্লেন—"তোমাকে আমি সিংহাসনে বসাব।"

এ স্মরনীয় দিনে সম্রাটের লোকজনের মধ্যে অনেকে নদীতে ডুবে মারা যায়[৭] এবং অনেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাদশাহ্ এর পর আগ্রার পথে রওয়ানা হলেন। এ-সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল যে, মীর ফরিদ ঘোর রাজকীয় দলের পশ্চাদ্ধাবন করছেন এবং শাহ মুহাম্মদ আফগান সামনের পথ বন্ধ করে রেখেছেন। এ সংবাদ পেয়ে দলের অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ল। রাজা

৫। আবুল ফজল, নিজামুদ্দীন ও বদায়নী প্রভৃতির বর্ণনা মতে মোগলদের নদী পার হওয়ার পথে অসুবিধা সৃষ্টির জন্যে আফগানরাই এ সেতু ভেঙ্গে দিয়েছিল, হুমায়ুন সেতুটি ভাঙ্গেন নি'। মনে হয় এ অভিমতই সত্য।

৬। ভিশ্তি নিজামকে 'নিজামউদ্দীন আওলিয়া' সম্বোধন করে সম্রাট হুমায়ুন তার প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করেছেন, সন্দেহ নেই।

৭। তারিখে-ফেরিশতার বর্ণনা মতে এ যুদ্ধে দেশীয় সৈন্য ছাড়া হুমায়ুনের সহিত আট হাজার মোগল সৈন্যও ছিল। তাদের মধ্যে যুদ্ধে নিহত হয় অনেকে এবং নদীতে নিমজ্জিত হয়েও প্রাণ হারায় বহু লোক। সম্রাটের ভগিনী গুলবদন বেগমের গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ যুদ্ধে সম্রাটের দু'পত্নী—চাঁদ বিবি ও শাদ বিবি এবং আফিফা বেগম নাম্নী কন্যাও নিহত হন বা নদীতে ডুবে মারা যান। (গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা,' ৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

পুরুবাহন তখন ভরসা দিলেন যে, তিনি পশ্চাদানুসরণকারী ফরিদ ঘোরকে আটকিয়ে রাখবেন এবং এ সুযোগে সম্রাট সামনের বাধা অপসারণ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। শেষ পর্যন্ত এ পন্থাই অনুসরণ করা হলো। শাহ্ মুহাম্মদ আফগান রাজকীয় দলের সম্মুখীন না হয়ে পথ ছেড়ে দিলেন।

সম্রাট অতঃপর বিনা-বাধায় সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং কালপী[৮] নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। বাদশাহকে নজর দেওয়ার জন্যে কাসেম কারাচার পুত্র আগে থেকেই বহু উপহার-দ্রব্য সেখানে মওজুদ রেখেছিল। কিন্তু সম্রাটের সহযাত্রী তার পিতার ইঙ্গিতে সে সামান্য কয়েকটি মাত্র দ্রব্য সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করল। প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করতে পেরে সম্রাট কেবল মাত্র একটি জরীর কাজ-করা ঘোড়ার জীন্ রেখে অবশিষ্ট সকল উপহার-দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করলেন। জীন্‌টি স্বীয় ভ্রাতা কামরানকে দিবেন বলে সম্রাট প্রকাশ করেন।

কাল্‌পী থেকে যাত্রা করে সম্রাট অবশেষে আগ্রায় গিয়ে পৌঁছালেন। শাহজাদা কামরান এ সময়ে 'জর্-আফ্‌শান' নামক উদ্যানে অবস্থান করছিলেন। সম্রাটের আগমন-বার্তা পেয়েই তিনি দৌড়ে এসে সম্রাটকে অভ্যর্থনা করলেন। বাদশাহ্‌ও স্বীয় অশ্ব থেকে অবতরণ করে মীর্জা কামরানকে আলিঙ্গন করে তাঁর তাবুর মধ্যে গমন করলেন। কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করার পর শাহজাদা কামরান নিবেদন করলেন—"শাহানশাহ্ সহি-সালামতে ফিরে এসেছেন, কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। সুতরাং প্রাসাদে গমন করাই উচিত হবে। আমার একান্ত অনুরোধ—হিন্দালের অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।" মীর্জা হিন্দাল সে সময়ে আলোরে ছিলেন।[৯] কামরানের অনুরোধের উত্তরে সম্রাট বল্লেন—"তোমার খাতিরে আমি হিন্দালকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি তাকে জানিয়ে দাও—সে যেন এখানে চলে আসে।"

সম্রাটের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিনের মধ্যেই নিজাম ভিশতি সেখানে উপস্থিত হলো। এ ব্যক্তিই মশকের সাহায্যে সম্রাটকে নদী পার হতে সাহায্য করেছিল। নিজের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে সম্রাট ভিশতিকে দু' ঘণ্টার জন্যে সিংহাসনে উপবেশন করালেন। এ সময় মধ্যে নিজাম বাদশাহর মতোই হুকুম জারী করেছিল।[১০]

৮। 'কাল্‌পী' যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি শহর।

৯। সম্রাট হুমায়ুন শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন সংবাদ পেয়ে শাহজাদা মীর্জা হিন্দাল কয়েকটি প্রদেশ স্বনামে দখল করে নিয়েছিলেন এবং সম্রাটের রাজনধানীতে প্রত্যাবর্তণের সময় তিনি আলোরে (আলোয়ার) ছিলেন।

১০। আবুল-ফজল ও ফেরিশ্‌তার বর্ণনা মতে নিজাম ভিশ্‌তি অর্ধদিন সিংহাসনে সমাসীন ছিল।

আগ্রায় বাদশার উপস্থিতির দু' তিন দিন পরেই মীর্জা হিন্দালও ফিরে এলেন। হিন্দাল ও ইয়াদগার নাসির মীর্জাকে সঙ্গে নিয়ে মীর্জা কামরান সম্রাটের সন্নিধানে হাজীর হলেন। সম্রাট বাবুরের উদ্যানের প্রস্তর-প্রাসাদে এক মজলিসের অনুষ্ঠান করে বাদশাহ মীর্জা কামরানকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন—"তুমিই বিচার করে বল অপরাধটা কার? মীর্জা হিন্দাল বিদ্রোহ করল কেন এবং কি উদ্দেশ্যে?" সম্রাটের এ-কথার পর কামরান হিন্দালকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন—"তুমি বাদশার প্রতি যোগ্য ব্যবহারের পরিচয় দাও নি, বরং অশোভন আচরণই করেছ। বল তো, এর কারণ কি?" হিন্দাল তাঁর অল্প বয়স ও অনভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বিনীতভাবে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে জানালেন যে, জাহীদ বেগ, খসরু কোকাতাশ এবং হাজী মুহাম্মদ কোকা প্রমুখ কতিপয় ওমরাহর কুপরামর্শেই তিনি বিপথগামী হয়েছিলেন এবং নিজের অন্যায়াচরণের জন্যে তিনি এক্ষণে অনুতপ্ত ও লজ্জিত। হিন্দালের এ কৈফিয়ৎ শ্রবণ করে সম্রাট বল্লেন—"মীর্জা কামরানের খাতিরে আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। তোমার উচিত—কৃতকর্মের জন্যে তওবা করে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতে কোন লোকের কুপরামর্শের প্রতি কর্ণপাত না করা।"

দুষ্ট লোকের অনিষ্টকারিতার শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সম্রাট অতঃপর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করেন—"হজরত রসুলুল্লাহর সাহাবাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন আবি[১১] ভণ্ড দুষ্ট লোকদের সরদার স্বরূপ ছিল। কয়েকবার ভণ্ডামী ও কুমন্ত্রণার মাধ্যমে এ লোকটি সাহাবাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধের ভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু সাহাবাগণের আদর্শ ও বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকায় তার কোন কথায় কেউ কান দেন নি'। আল্লাহ আবদুল্লাহ বিন আবিকে ভণ্ডদের সরদার আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন।"

এসব কথাবার্তার পর সম্রাট মন্তব্য করলেন—"যা' হবার হয়ে গেছে। এক্ষণে আমাদের শের খাঁন ও অন্যান্য শত্রুদের দমন করার জন্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। শের খাঁন সন্ধির ধোঁকবাজীতেই চৌসার যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করতে পেরেছে। নিশাযোগে অতর্কিতভাবে সে আমাদের আক্রমণ করেছিল।

১১। আলীগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রক্ষিত 'তাজ্‌কেরাতুল-ওয়াকিয়াতের' পাণ্ডুলিপিতে নামটি 'আবদুল্লাই আবিদ' লেখা রয়েছে। সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদ বশতঃই এরূপ হয়েছে। জওহর নিঃসন্দেহে আবদুল্লাহ্ বিন আবির কথাই লিখেছেন। এ ব্যক্তিকে হজরত রসুলুল্লাহ্ আনসারদের সরদার মনোনীত করেছিলেন। বদরের যদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার কাফেরদের সহিত আবদুল্লাহ্ বিন্ আবি গোপন পত্রালাপের মাধ্যমে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল। (মওলানা শিবলীর 'সিরাতুন্নবী', ১ম খণ্ড, ৩০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

আজ তার দম্ভ এতটা বেড়ে গিয়েছে যে, কনৌজ পর্যন্ত গঙ্গা নদীর তীরবর্তী সকল এলাকা সে দখল করে নিয়েছে।"

সম্রাটের এ-কথায় মজলিসে সমবেত শাহজাদাগণ ও অমাত্যবর্গ উত্তর করলেন —"আল্লাহর অনুগ্রহে ও সম্রাটের ভাগ্যের জোরে এবার আমরা এমন বীরত্ব ও প্রাণপণ প্রচেষ্টার পরিচয় দিব যে, শের খাঁনের সকল দুষ্ট-বুদ্ধির অবসান হয়ে যাবে।"

এর পর সম্রাট ফতেহ্‌পুর চলে গেলেন। স্থির হলো যে, যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন স্বরূপ জেলকদ্‌ মাসের ৮ তারিখে 'জর্‌-আফ্‌শান' বাগে রাজকীয় শিবির স্থাপন করা হবে।

শাহজাদা মীর্জা কামরান এ-সময়ে সম্রাটকে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন রাজধানীতে অবস্থান করেন এবং শের খাঁনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রার সুযোগ যেন তাঁকেই (কামরানকে) দেওয়া হয়। সম্রাট উত্তর করলেন—"না, তা' হতে পারে না। শের খান আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে, আমাকেই এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হবে। তুমি রাজধানীতে অবস্থান কর।"

শেষ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হলো যে, মীর্জা কামরান সম্রাটের প্রতিনিধি রূপে আগ্রায় থাকবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শের খানের বিরুদ্ধে সম্রাটের দ্বিতীয় বার যুদ্ধযাত্রা ও কনৌজের যুদ্ধে পরাজয়

সম্রাট যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং আলীপুর নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করে [১] সকল শাহজাদা ও আমীরগণকে তাঁদের পদ-মর্যাদা অনুযায়ী অশ্ব, সম্মানসূচক পোষাকাদি ও প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম উপহার দিলেন। এতদ্ব্যতীত নব্বই হাজার সৈন্যের মধ্যে সামরিক পোষাক ও অস্ত্রাদি বিতরণ করা হলো। [২] মীর্জা কামরানকে এখান থেকেই আগ্রার পথে বিদায় দিয়ে সম্রাট নিজে যুদ্ধার্থ এগিয়ে চল্লেন। আগ্রায় পৌঁছে শাহজাদা কামরান অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মীর আবুল বাকা ও আরো কতিপয় পার্ষদকে সঙ্গে নিয়ে লাহোরে চলে গেলেন। [৩]

রাজকীয় বাহিনী কয়েক দিন পর্যন্ত অব্যাহতভাবে অগ্রসর হয়ে অবশেষে গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কনৌজ নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলো। শের খানও মোগল-বাহিনীর সহিত মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে নদীর অপর তীরে নিজের সেনাদলকে সম্মিলিত করলেন। এ-সময়ে 'আরায়েল্'-এর [৪] রাজা

১। হুমায়ুন আগ্রায় থাকার সময়েই শের খানের পুত্র কুতুব খান কালপির নিকটে এলে পর সেখানকার মোগল সরদারগণ তাঁকে প্রতিরোধ করে এবং ফলে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কুতুব খান পরাজিত হলে পর তাঁর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্রাট হুমায়ুনের নিকটে পাঠানো হয়েছিল। জওহর এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন নি'; কিন্তু 'তাবাকাতে-আকবরী' ও 'ফেরিশ্‌তায়' ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। (তাবাকাত—২০২ পৃঃ ও ফেরিশ্‌তা, ১ম খণ্ড, ৪০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২। হুমায়ুনের সেনাদলের সংখ্যা জওহর নব্বই হাজার বলে উল্লেখ করলেও অন্যান্য ইতিহাসে ভিন্নরূপ সংখ্যাই উল্লেখিত হয়েছে। মীর্জা হায়দর তাঁর ইতিহাসে এ সংখ্যা ৪০ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন (আরস্কিন-১৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। মোগল সৈন্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ও আফগান বাহিনীর লোক সংখ্যা ৫০ হাজার বলে নিজামুদ্দিনের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে।

৩। কামরানকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সম্রাট হুমায়ুনের একান্ত ইচ্ছা ছিল বলে কোন-কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। কিন্তু কামরান অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে আগ্রায় থেকে যান ও পরে লাহোরে গমন করেন। সম্রাট কামরানের কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়েও বিশেষ সহানুভূতি পান নি'। শাহজাদা সম্রাটকে মাত্র এক হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। গুলবদন বেগম বলেছেন যে, কামরান অসুস্থ ছিলেন, একথা সত্য; কিন্তু তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, এরূপ সন্দেহও তিনি পোষণ করতেন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১২০ ও ১২১ পৃঃ; তাবাকাতে-আকবরী ২০২ পৃঃ ও গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা' ৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

৪। 'আরায়েল্' নাইনি ষ্টেশনের নিকটবর্তী একটি স্থান।

পুরুবাহনের এক চিঠি পাওয়া গেল। এ পত্রে রাজা প্রস্তাব করেন যে, যদি সম্রাট পাটনার [৫] দিকে এগিয়ে যান, তা' হলে তিনি নিজের সৈন্যদলসহ তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। রাজার এ প্রস্তাব সম্রাট প্রত্যাখ্যান করেন এবং সেখানেই নদী পেরিয়ে যুদ্ধ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

সেদিন মোহর্‌রম মাসের ১০ তারিখ ছিল। রাজকীয় বাহিনী গঙ্গা নদী পার হয়ে যুদ্ধার্থে সজ্জিত হলো এবং রণ-দামামা বাজিয়ে শত্রু-পক্ষকে সংগ্রামে আহ্বান করল। সৈন্যদলও রণ-হুঙ্কারে দিগন্ত মুখরিত করে তৈরী হলো। রাজকীয় বাহিনীর দক্ষিণাংশ শাহজাদা হিন্দাল মীর্জা ও কতিপয় আমীরের অধিনায়কতায় শের খানের পুত্র জালাল খানের মোকাবিলা করে এবং বাম অংশ মীর্জা আসকরীর পরিচালনায় আফগান সেনানী খোয়াস খানকে প্রতিরোধ করছিল। সৈন্যদলের মধ্যবর্তী অংশ অন্যান্য আফগান সেনানীদের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল।

যুদ্ধ চলা অবস্থায়ই সম্রাট সংবাদ পেলেন যে, রাজকীয় বাহিনীর যে অংশটি মীর্জা হিন্দালের নেতৃত্বে লড়াই করছিল, এর মধ্যেই তা' শত্রুদের একাংশকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু মীর্জা আসকরীর অধিনায়কতায় পরিচালিত সৈন্যদল খোয়াস খানের সৈন্যদের সম্মুখে টিকে থাকতে পারছে না। এ-সময়ে মীর্জা হায়দর এসে সম্রাটের কাছে নিবেদন করলেন যে, আশ্রয়প্রার্থী পলায়িত ব্যক্তিদের আগমনের সুবিধা করে দেওয়ার জন্যে সেনা-বাহিনীর সম্মুখবর্তী শকট-গুলির পরস্পরের বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করার হুকুম দেওয়া হোক। দুর্ভাগ্য বশত: সম্রাট এ পরামর্শ মতোই কাজ করার আদেশ দিলেন এবং শকটগুলির শৃঙ্খল ছিন্ন করা মাত্রই ভীত-সন্ত্রস্ত সৈন্যগণ দলে দলে পেছন দিকে হটে আসতে লাগল।

এ সময়ে কৃষ্ণ পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে সম্রাটের ঘোটকের মস্তকে ভীষণ ভাবে আঘাত করল। আঘাতে ঘোটকের লাগাম উল্টে গেল। আল্লাহ্ বলেছেন—তিনি দ্বীন্-দুনিয়ার মালিক। যাকে ইচ্ছা তিনি সাম্রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা ইজ্জতের অধিকারী করেন, আর যাকে ইচ্ছা জিল্লত দিয়ে থাকেন। তাঁর হস্তেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত। সব-কিছুর উপর তিনি শক্তিমান।

সত্যি, 'মানুষের আকাঙ্ক্ষার লাগাম রয়েছে আল্লাহ্‌র কুদরতের হস্তে।' নিজের ইচ্ছায় মানুষ কিছুই করতে পারে না।

৫। এ স্থান কিছুতেই 'পাটনা' হতে পারে না। ষ্টুয়ার্ট তাঁর অনুবাদে 'পুট' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ এটাই স্থানটির সঠিক নাম হবে।

এর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে সম্রাট নিজে বর্ণনা করেছেন—"যখন আমি দেখতে পেলাম আফগানগণ নদীর ধারে মোগল সৈন্যদের ঘিরে ফেলেছে, তখন তাদের আক্রমণ করার সঙ্কল্প করলাম। কিন্তু এ-সময়েই এক ব্যক্তি এসে আমার অশ্বের লাগাম ধরে নদীর কিনারায় নিয়ে গেল। আমি দেখতে পেলাম—পরলোকগত সম্রাট বাবুরের সময়ের একটা পুরনো হাতী সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাহুতকে নিকটে আহ্বান করায় সে হাতী নিয়ে আমার কাছে এলো। মীর শাহ্ শাহনার জনৈক ভৃত্য হাওদার উপর উপবিষ্ট ছিল। সে আমাকে সালাম করল। আমি তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। সে জানাল যে, তার নাম 'কাফুর'। সে হাতীটিকে বসালে পর আমি তাতে আরোহণ করলাম এবং মাহুতকে নদী পার হওয়ার জন্যে আদেশ দিলাম। কিন্তু মাহুত উত্তর দিল যে, নদী পার হতে গেলে হাতী ডুবে যাবে। এ-সময়ে কাফুর ইঙ্গিতে আমাকে জানাল যে, মাহুতের সম্ভবতঃ বদ্-মতলব রয়েছে, সে হয় তো আফগানদের নিকটেই আমাকে নিয়ে যেতে চায়। মাহুতকে হত্যা করাই উত্তম হবে বলে কাফুর আমাকে জানাল। আমি তখন প্রশ্ন করলাম—তা' হলে হাতীটিকে চালাবে কে? কাফুর বিনীত-ভাবে নিবেদন করল—হস্তী চালনার কৌশল তার জানা আছে। এ কথার পর আমি নিজের তরবারি দ্বারা মাহুতের মস্তকচ্ছেদন করলাম। কাফুর তাকে নদীতে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় গিয়ে উপবেশন করল এবং হাতীটিকে নদীর ধারে নিয়ে গেল। হাতীর সাহায্যে নদী পেরিয়ে আমরা অপর তীরে গিয়ে নামলাম। কিন্তু নদীর কিনারা এত উঁচু ছিল যে, উপরে ওঠার কোন পথই আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি দেখতে পেলাম—কতিপয় মোগল সেখানে হা-হুতাশ করছে, আর আমায় খুঁজে ফিরছে। ইতিমধ্যে এক দল লোকের দৃষ্টি আমার প্রতি আকৃষ্ট হলো। তারা নিজেদের পাগড়ী খুলে তার এক প্রান্ত নীচে নিক্ষেপ করল এবং তা' ধরেই আমি উপরে ওঠলাম।[৬] তারা আমাকে একটা অশ্ব এনে দিল এবং তাতে সওয়ার হয়ে আমি আগ্রার পথে রওয়ানা হলাম।"

"যেসব লোক আমাকে এভাবে সাহায্য করেছিল, তাদের মধ্যে ছিল বাবা বেগ জালায়ের নামক লোকের পুত্র মীর্জা মুহাম্মদ ও তারাশ্ বেগ। এ দু' ভ্রাতাকে একত্রে দেখে আমার মনে হিন্দাল ও অন্যান্য আত্মীয়দের কথা জেগে

৬। আবুল ফজল এ ঘটনা অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে—একটি লোক নদীতে ডুবতে ডুবতে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে ঘটনাক্রমে বাদশার কাছে এসে পড়ে। এ লোকই হাত ধরে সম্রাটকে নদীর উঁচু কিনারার উপরে উঠিয়ে নেয়। সম্রাট লোকটির নাম জানতে চাইলে সে জানায় যে, তার নাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, গজনীর বাসিন্দা সে এবং শাহজাদা কামরানের দলের লোক।

হইল। মনে মনে আমি ভাবলাম—এ দু' ভায়ের মতো হিন্দালও যদি আমার কাছে এসে মিলিত হতো! এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার অন্তরের এ কামনা পূর্ণ হলো; হিন্দাল এসে আমার কাছে হাজীর হলো। আমি খোদার নিকট শোক্‌রিয়া আদায় করলাম। বাস্তবিকই আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, তাঁর একমাত্র 'কুন্' (হও) কথায় সমগ্র বিশ্ব-জগৎ সৃজিত হয়েছে।"[৭]

এ রকম না হয়ে উপায় ছিল না। মহামান্য সম্রাট বিপুল সমৃদ্ধির অধিকারী হলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন তিনি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কোন ব্যতিক্রম নেই, সর্ব-শক্তিমানের এ ইচ্ছার তলে সব্বাইকে মাথা পেতে দিতে হয়। অদৃষ্ট ও প্রচেষ্টার যাত্রা শুরু হয় তাদের নিজস্ব সময়-সূচী অনুযায়ী। খোদাতা'লা নিজের মহিমা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বলেই হয়তো এ রকম হয়েছে। হজরত নিজামুদ্দীন বলেছেন—"হে জোয়ান, তোমার আকাঙ্ক্ষার লাগাম রয়েছে আল্লাহ্-তা'লার কুদরতের হাতে। তাঁর নির্দেশ সকল নির্দেশের উপরে কার্যকরী হয়।"

অতঃপর সম্রাট সদলবলে আগ্রার দিকে রওয়ানা হলেন। দলে মীর্জা হিন্দাল, মীর্জা আসকরী, মীর্জা ইয়াদগার নাসির প্রভৃতিও ছিলেন। রাজকীয় দল 'ভিন্‌গাঁও'[৮] নামক স্থানে উপনীত হলে পর গ্রামবাসিগণ রাস্তা রোধ করে লুটতরাজের প্রয়াস পায়। এ সময়ে দুষ্কৃতিকারীদের নিক্ষিপ্ত একটা তীর এসে ইয়াদগার মীর্জার দেহে বিদ্ধ হয়। তিনি তখন মীর্জা আসকরীকে আক্রমণ-কারীদের প্রতিহত করার অনুরোধ করে বলেন যে, তিনি নিজের আহত স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করে পটি বেঁধে নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। ইয়াদগার নাসিরের এ উক্তি আসকরীর পছন্দ না হওয়ায় তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। মীর্জা ইয়াদগারও কঠোর ভাষায় প্রত্যুত্তর দিলেন। আসকরী এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নাসির মীর্জাকে তিন বার বেত্রাঘাত করলেন। "বাদশার পক্ষ থেকে আমি এ তিন বেত্রাঘাত গ্রহণ করলাম"—এ-কথা বলে মীর্জা ইয়াদগার নাসিরও অতঃপর আসকরীর গায়ে কয়েক বার বেত্রাঘাত করলেন। এ অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ যখন সম্রাটের নিকটে গিয়ে পৌঁছাল, তিনি মন্তব্য করলেন—"এভাবে আত্মকলহে

---

(৭) কনৌজের এ যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ের প্রধান কারণ স্বরূপ ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, সম্রাটের সেনাদলের অধিকাংশ সৈনিকই ছিল অনভিজ্ঞ নূতন লোক। তা ছাড়া, শাহজাদা কামরানের বাস্তব অসহযোগিতার ফলেও মোগল-বাহিনী বহুলাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ দ্বিবিধ কারণেই সম্রাট হুমায়ুনকে দ্বিতীয় বারের মতো শের খানের নিকট পরাজয় বরণ করতে হয়।

(৮) এ নাম আইনি-আকবরীতে 'ভুগাঁও' ও 'ভুনগাঁও', আকবর-নামায় 'ভিঙ্গাপুর', 'ভিঙ্গানুর' ও 'ভিজানো' লেখা হয়েছে। তাজকেরাতুল্-ওয়াকিয়াতের বিভিন্ন কপিতেও 'হিঙ্গানো' ও 'ভিজাজ' দেখা যায়। মনে হয় নামটি 'ভিনগাঁও' বা 'ভুন্‌গাঁও' হবে।

লিপ্ত না হয়ে তারা যদি একযোগে দস্যুদলকে বিনষ্ট করার চেষ্টায় অবতীর্ণ হতো, তা' হলেই শোভন ও সঙ্গত হতো। যাক্ যা' হবার হয়ে গিয়েছে, ভবিষ্যতে এরূপ ব্যাপারের কথা আমায় আর যেন শুনতে না হয়।''

আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করে সম্রাট সৈয়দ রফিউদ্দীনের[৯] বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করলেন। মীর্জা হিন্দালকে আহ্বান করে অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, কেল্লাহ্র ভেতরে গিয়ে তিনি যেন স্বীয় জননী, পত্নী, রাজ-পরিবারের ছেলে-মেয়ে ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক দাসদাসীকে পারিবারিক সমুদয় ধন-রত্নসহ নিয়ে আসেন। মীরাণ সৈয়দ রফিউদ্দীন সম্রাটের আহারের জন্যে রুটী ও খরবুজা এনে উপস্থিত করলেন এবং সম্রাট সানন্দে সে আহার্য গ্রহণ করলেন।

সৈয়দ রফিউদ্দীনের বাড়ীতে সম্রাটের আহার সমাধা হওয়ার পর সৈয়দ সাহেব তাঁর সহিত ধর্মালোচনা শুরু করলেন এবং মন্তব্য করলেন—''জগতের ঘটনাপ্রবাহ সকল সময়ে একই স্রোতধারায় প্রবাহিত হয় না। সুতরাং এ-সময়ে হুজুরের এ স্থান ত্যাগ করাই আমি সঙ্গত মনে করছি।'' সৈয়দ সাহেব সুসজ্জিত একটা অশ্ব এনে উপস্থিত করলেন এবং সম্রাটকে আশীর্বাদ করলেন। সম্রাট অশ্বে আরোহণ করে সিক্রী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে মীর্জা হিন্দালও এসে উপস্থিত হলেন। কেল্লার অস্ত্রাগার থেকে আনিত কোমরবন্দসহ একখানা খঞ্জর ও একখানা সুদৃশ্য তরবারি তিনি সম্রাটকে উপহার দিলেন।

সম্রাট প্রথম দিন পরলোকগত শাহানশাহ্ বাবুরের উদ্যানে বিশ্রাম করলেন। পর দিন প্রাতে তিনি উক্ত উদ্যানে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় নিকটস্থ সিক্রী পাহাড়ের দিক থেকে নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে তাঁর সম্মুখে পতিত হলো। মীর্জা হায়দর কাশকারী ও মেহ্তের[১০] তখন সম্রাটকে জানালেন যে, তীরের সূত্র আবিষ্কারের জন্যে দু'জন অশ্বারোহীকে পাহাড়ের দিকে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই প্রেরিত লোকদ্বয় আহত অবস্থায় সম্রাটের নিকটে ফিরে এলো এবং জানাল যে, এ জায়গা নিরাপদ নয় বলেই মনে হচ্ছে। সম্রাট কালবিলম্ব না করে তখনি অশ্বোপরি আরোহণ করলেন এবং 'বাজোনা' নামক স্থানের দিকে যাত্রা করলেন। সম্রাটের সঙ্গে এ সময়ে রাজ-পরিবারের লোকজন ব্যতীত আরো যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তন্মধ্যে মীর্জা হায়দর কাশ্কারী, খোদা-দোস্ত, মীর্জা রওশন বেগ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বহু দাসদাসীও

(৯) মীরাণ সৈয়দ রফিউদ্দীন আগ্রার সর্বজনমান্য ধার্মিক মহাপুরুষ ছিলেন। আবুল ফজল তাঁর কামালিয়াত ও জ্ঞানবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

১০। মেহ্তের সাহাকা রেকাবদার (তারিখে হুমায়ুন ও আকবর, ১৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ছিল। ফখর আলী নামক দলের এক ব্যক্তিকে বেয়াদবী করে সম্রাটের অগ্রে গমন করতে দেখা গেল। তার এবম্বিধ আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট তাকে লক্ষ্য করে বলেন—"তোমারি পরামর্শে আমি গত যুদ্ধের সময় গঙ্গা নদীর অপর তীরে গমন করেছিলাম। সে ুদ্ধে তোমার মৃত্যু হলেই ভালো হতো। তা' হলে আজকের এ বেয়াদবী তোমার দ্বারা সম্ভব হতো না।"—অপরাধ স্বীকার করে ফখর আলী দলের পশ্চাৎভাগে চলে গেল।

সম্রাট যখন বাজোনায় গিয়ে কুম্ভীর নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করলেন, তখন শাহজাদা আসকরী এসে সংবাদ দিলেন যে, শের খান মীর ফরিদ ঘোরকে সম্রাটের পশ্চাদানুসরণের জন্যে প্রেরণ করেছেন বলে তিনি সংবাদ পেয়েছেন। শত্রুদল হয় তো নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে; সম্রাটের অবিলম্বে এখান থেকে যাত্রা করা উচিত। মীর্জা আসকরী সম্রাটকে অশ্বে আরোহণ করিয়ে সেখান থেকে বিদায় দিলেন। লোকলস্করের মধ্যে এ-সময়ে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। কেউ কারো সাহায্য না করে প্রত্যেকেই স্ব স্ব জিনিসপত্র নিয়ে পলায়নের উদ্যোগ করল। পিতা পুত্রের সন্ধান নিল না, আবার পুত্রও পিতার খোঁজ নেওয়ার অবসর পেল না। কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করেই লোকেরা পলায়ন করতে লাগল। এরূপ বিশৃঙ্খলার মধ্যেই আবার বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা শুরু হয়ে গেল। লোকেরা এরূপ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল যে, তার তুলনা হয় না। আল্লাহ্ যেন এমন দুর্দিন থেকে মানুষকে রক্ষা করেন।

সম্রাট যখন দেখলেন লোকেরা অস্থিরভাবে পলায়নপর হয়ে ওঠেছে, তখন তিনি লাগাম টেনে নিজের অশ্বকে দাঁড় করালেন। হিন্দাল, ইয়াদগার নাসির, তর্জী বেগ ও অন্যান্য যেসব অমাত্য সেখানে ছিলেন, তাঁরা সব্বাই সম্রাটের কাছে এগিয়ে এলেন। সম্রাট তখন সকলকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন—"রোম, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি সকল স্থানের লোকেরাই আমার সেনা-দলে ছিল। তাদের মধ্যে কিছু চৌসার যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে এবং কিছু নিহত হয়েছে কনৌজের যুদ্ধে। যে সামান্য সংখ্যক লোক এখনো রয়েছে, তারা আজ এখানে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। সুতরাং ধৈর্য ধরে এখান থেকে সরে পড়াই আমার উচিত। এভাবে যদি কোথাও আমার মৃত্যুও হয়, তা' হলেও আমি দুঃখিত হব না।"

সম্রাট অতঃপর লোকদের সম্মিলিত করার আদেশ দিলেন এবং সকলকে সাহস সঞ্চয় করার পরামর্শ দিয়ে ঘোষণা করলেন—এখান থেকেই আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রওয়ানা হব। স্থিরীকৃত হলো যে, সম্রাট সর্বাগ্রে অগ্রসর হবেন

এবং দলের ডান পার্শ্বে থাকবেন শাহজাদা হিন্দাল ও বাম পার্শ্বে মীর্জা ইয়াদগার নাসির। অন্যান্য আমীরগণ তাঁদের লোকজন নিয়ে পেছন পেছন অগ্রসর হবেন। সারা পথে এভাবেই রাজকীয় দল এগিয়ে যাবে। আরো ঘোষণা করা হলো যে, যদি কোন লোক সম্রাটের আগে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পায়, তা' হলে তাকে কঠোর সাজা পেতে হবে।

কিছুক্ষণ পর জনৈক মোগল সম্রাটের কাছে এসে অভিযোগ করল যে, চৌবা বাহাদুর[১১] তার অশ্ব কেড়ে নিয়েছে। অভিযোগ শুনে সম্রাট এক ব্যক্তিকে ডেকে আদেশ দিলেন যে, ঘোড়াটি অভিযোগকারীকে ফেরত দিবার ব্যবস্থা করা হোক। আদেশ মতো চৌবা বাহাদুরকে সম্রাটের সম্মুখে নিয়ে আসা হলে সম্রাট তাকে মোগলের ঘোটকটি অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু চৌবা বাহাদুর এ আদেশ মান্য করে ঘোড়া ফেরত দিতে রাজী হলো না, বরং গোঁয়ার্তুমী করতে লাগল। এ ঔদ্ধত্যের সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হলে তিনি চৌবার শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হলো এবং চৌবা বাহাদুরের কর্তিত শির একটি বর্শাগ্রে বিদ্ধ করে সমগ্র সেনা-দলের মধ্যে প্রদর্শন করা হলো—যাতে কেও রাজকীয় আদেশ অমান্য করতে সাহসী না হয়, অথবা লুটতরাজে মন না দেয়।

এখান থেকে রওয়ানা হবার পর প্রত্যহ দশ থেকে বারো ক্রোশ পথ অতিক্রম করে রাজকীয় দল শেষে সিরহিন্দ শহরে গিয়ে পৌঁছাল।[১২] মীর্জা হিন্দালকে এ শহরে অবস্থান করার আদেশ দিয়ে সম্রাট স্বীয় দলবলসহ মাছিওয়াড়া [১৩] নামক স্থানে গমন করলেন। এখানে দেখা গেল—নদীতে অনেক পানী এবং নদী পার হওয়ার মতো যথেষ্ট নৌকা নেই। যা হোক, অনেক চেষ্টার

১১। ডক্টর ব্যাণার্জী তাঁর 'সম্রাট হুমায়ুন' গ্রন্থে এ ব্যক্তির নাম 'চৌবাতা বাহাদুর' লিখেছেন। ষ্টুয়ার্টের অনুবাদে 'চম্পতি বাহাদুর' লেখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সকল গ্রন্থে 'চৌবা বাহাদুর' দেখা যায় এবং এ নামটাই এখানে ব্যবহার করা হলো। (ষ্টুয়ার্ট–২৪ পৃঃ ও ব্যাণার্জী, ১ম খণ্ড, ২০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১২। জওহর সম্রাটের যাত্রাপথের বিবরণ এখানে অতি-সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। আবুল ফজলের মতে সম্রাট হুমায়ুন ৯৪৭ হিজরী সনের ১৮ই মোহররম তারিখে দিল্লী পৌঁছেন এবং সেখান থেকে যাত্রা করে রোহতাকে গমন করেন। শাহজাদা হিন্দাল গোয়ালিয়র থেকে এখানে এসেই সম্রাটের সহিত মিলিত হন। এখান থেকে যাত্রা করে রাজকীয় বাহিনী ১৭ই সফর (৯৪৭ হিঃ) তারিখে সিরহিন্দ পৌঁছে। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৩। 'মাছিওয়াড়া' জায়গাটি লুধিয়ানার ২২ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ষোড়শ শতকে এ স্থানের পার্শ্ব দিয়েই শতদ্রু নদী প্রবাহিত হতো। জওহরের বর্ণনা মতো রাজকীয় দলের লোকেরা সম্ভবতঃ এখানেই নদী পার হয়েছিল।

পর বহু কষ্টে নদী পার হয়ে রাজকীয় দল অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করে নিল। শের খান তখন দিল্লীতে এসে পৌঁছেছেন, এবং তাঁর সেনাদল সম্রাটের অনুসরণ করতে করতে পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যবধানে এসে গিয়েছিল। সম্রাট আরো সামনে অগ্রসর হয়ে জলন্ধরে গিয়ে পৌঁছালেন। এ-সময়ে শাহজাদা হিন্দালও এসে রাজকীয় দলের সহিত যোগদান করলেন। আফগান সেনাদল তখন সিরহিন্দ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সম্রাট হিন্দালকে জলন্ধরে রেখে কয়েক দিবস পথ চলার পর শেষে লাহোরে গিয়ে রওশন আয়েশীর [১৪] বাড়ীতে উঠলেন। এখান থেকে সম্রাট মোজাফ্ফর বেগ তুর্কমানের অধিনায়কতায় একদল সৈন্যকে শাহজাদা হিন্দালের সাহায্যার্থ জলন্ধরে প্রেরণ করলেন। আদেশ মতো অগ্রসর হয়ে মোজাফ্ফর বেগ গুজান্দওয়াল্ নামক জায়গায় বিপাসা নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করলেন। এদিক দিয়ে নদী পেরিয়ে মীর্জা হিন্দাল লাহোরে পৌঁছে গেলেন। এ-সময়ে আফগান সেনাদলও নদীর অপর তীরে এসে উপস্থিত হলো এবং মাঝখানে নদীর ব্যবধান রেখে মোজাফ্ফর বেগের সেনাদল ও আফগানগণ পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে অবস্থান করতে লাগল।

শাহজাদাগণ ও অমাত্যবর্গসহ সম্রাট যখন লাহোরে অবস্থান করছিলেন, তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, শের শা'র কাছ থেকে এক দূত এসেছে। উক্ত দূতের সহিত কোথায় সাক্ষাৎ করা উচিত হবে, সে বিষয়ে শাহজাদাগণের সহিত পরামর্শ করে সম্রাট ঘোষণা করলেন যে, মীর্জা কামরানের উদ্যানে এক মজলিসের অনুষ্ঠান করেই শের শা'র দূতকে গ্রহণ করা হবে এবং সে মজলিসে শহরের বালক-বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিকদেরই হাজীর থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত এরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বিত হলো। শের খানের দূত মজলিসে উপস্থিত হলেন; কিন্তু তাঁকে সেদিনই বিদায় দেওয়া হলো।

বলা প্রয়োজন যে, মীর্জা কামরান আগে থেকেই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে শের খানের নিকট এক পত্র প্রেরণ করে সন্ধির কথাবার্তার সূচনা করেছিলেন। কামরানের এ পত্রের উত্তরেই সন্ধি স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে শের খান তাঁর দূত মারফত জানিয়েছিলেন যে, পরিস্থিতি যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এরূপ অবস্থায় মোগলরা কোন্ শক্তিতে সন্ধির আশা করতে পারে? প্রকৃত পক্ষে, সন্ধির

১৪। আবুল ফজল বলেছেন যে, সম্রাট হুমায়ুন লাহোরে খাজা দোস্ত মুন্শীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ষ্টুয়ার্টের অনুবাদে কিন্তু রওশন আয়েশীর নামই দেখা যায়।

কথা ওঠতেই পারে না। [১৫] সম্রাট অতঃপর সকল শাহজাদা ও অমাত্যদের সহিত ভাবী কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। আলোচনায় একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং অতঃপর মজলিসে উপস্থিত সকলে মিলে মোনাজাত করলেন।

এর পর প্রায় এক মাস সম্রাট নিস্ক্রিয় অবস্থায়ই অতিবাহিত করলেন। এ সময় মধ্যে মীর্জা হিন্দাল ও কতিপয় ওমরাহ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে একদিন সম্রাটের কাছে এসে জানালেন যে, মীর্জা কামরান শের খানের সহিত ষড়যন্ত্র করেছেন বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং তাঁকে হত্যা করা হোক। কারণ, তা' হলেই সেনাদলের সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারবে এবং তা' হলেই সফলতা সম্ভবপর হবে। সম্রাট কিন্তু এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বল্লেন—"না, কিছুতেই এ হতে পারে না যে, নশ্বর দুনিয়ার জন্যে আমি ভ্রাতৃরক্তে আমার হস্ত কলঙ্কিত করব। আমি চিরকাল আমার জান্নাতবাসী পিতার উপদেশগুলি মনে রাখব। অন্তিম মুহূর্তে আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন—'হে হুমায়ুন, সাবধান—নিজের ভ্রাতাদের সহিত কখনো বিরোধ সৃষ্টি করো না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন কুমতলবও পোষণ করো না। মহান পিতার এ কথাগুলির প্রতি চিরকাল আমার শ্রদ্ধা রয়েছে এবং এ-ধরনের অপকর্ম আমার দ্বারা কখনো সম্ভব হবে না।" [১৬]

১৫। সম্রাট হুমায়ুন তাঁর ভ্রাতৃবর্গ ও অমাত্যদের সহিত লাহোরে যে পরামর্শ করেন, তাতে কোনরূপ ঐক্যমতে পৌঁছানো সম্ভবপর হয় নি'। কামরান এ সময়েও কপটতার আশ্রয় নিয়েই স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। তিনি গুপ্তভাবে কাজী আবদুল্লাহ্ সদরকে শের খানের নিকটে প্রেরণ করেছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়। জওহর এ ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিত মাত্র করেছেন। অন্যান্য ইতিহাসে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। মোগলদের মধ্যে এরূপ অনৈক্য বিদ্যমান থাকার জন্যেই যে শেরখান সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৭৮ ও ১৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

১৬। সম্রাট বাবুর ১৫২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখে হুমায়ুনকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতেও হুমায়ুনকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন স্বীয় ভ্রাতাদের সহিত সর্বদা পরামর্শ করে কাজ করেন এবং বিশেষভাবে কামরানের সহিত যেন ভালো আচরণের পরিচয় দেন। হুমায়ুন সর্বদা কার্যকরীভাবে পিতার এ উপদেশ পালন করেছেন এবং এজন্যে তাঁকে বহু ক্ষতিও সহ্য করতে হয়েছে। এমন কি, এজন্যেই তাঁকে দীর্ঘ কাল পর্যন্ত রাজ্যহারা হওয়ার দুর্ভোগ পর্যন্ত পোহাতে হয়েছিল। (অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটী প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত 'বাবুর-নামা'র ইংরাজী অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ৩৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লাহোর থেকে সম্রাটের আউচ গমন ও কামরানকে কাবুল গমনের অনুমতি প্রদান

মীর্জা কামরান ইতিমধ্যে এক দিন স্বীয় আসবাব-পত্র নৌকায় তুলে নিয়ে তাঁর নিজস্ব লোক-লস্করসহ সম্রাটের দল ছেড়ে প্রস্থান করলেন। সম্রাটও এর পর কয়েক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে হাজারা অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন। এক দিন প্রভাতে তিনি হাজারায় গিয়ে পৌঁছালেন। এমন সময় লোকেরা এসে সংবাদ দিল যে, মীর্জা কামরান তাঁর লোক-লস্কর ও সেনাদলসহ সম্রাটকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছেন। এ সংবাদ শুনে আমাদের লোকেরা, এমন কি অধম সেবকও (জহওর) প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করল। সম্রাট কিন্তু নিঃস্পৃহভাবেই জানালেন যে, আমাদের প্রস্তুতির কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি বল্লেন—"ওদের আসতে দাও এবং দেখ কি হয়!" কিছুক্ষণ পরেই মীর্জা কামরান সম্রাটের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। উপবেশন করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর তিনি বলতে লাগলেন—"যে সময় থেকে আপনার এ সেবক হিন্দুস্তানে আগমন করেছে, তখন থেকে মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি'। পদে-পদেই তাকে নানারূপ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার কর্মচারিগণও অতি-মাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। আপনার অনুমতি পেলে কাবুলে গিয়ে নিজের লোকজনের জন্যে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে আমি আবার আপনার চরণে হাজীর হব।" শাহাজাদার এ আবেদন শ্রবণ করে সম্রাট সানন্দে তাঁকে কাবুল গমনের অনুমতি দিলেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করে বিদায় করলেন।

সম্রাটও অতঃপর হাজারা থেকে রওয়ানা হয়ে চার ক্রোশ দূরবর্তী এক জায়গায় গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করলেন। এখানেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, মীরেক বেগ কর্তৃক প্ররোচিত মীর্জা হিন্দাল, ইয়াদগার নাসির মীর্জা ও কাসেম হোসেন সুলতান সম্রাটের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন এবং তাঁরা গুজরাটের দিকে যেতে চাচ্ছেন। সম্রাটের ভৃত্যদের মধ্যেও বহু লোক হিন্দালের সেনাদলে যোগ দিতে চলে গেল এবং অতঃপর তারা সকলে বেলুচিস্তানের দিকে যাত্রা করল।

খাজা কালান বেগ ছিলেন 'ভিরা' নামক স্থানের শাসনকর্তা। ইনি সম্রাটের নিকটে এক দাওয়াত-পত্র প্রেরণ করে জানালেন যে, সম্রাট যদি মেহেরবানী করে ভিরায় গমন করেন, তা' হলে তিনি প্রাণপণ করে তাঁর (সম্রাটের) সেবায় আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত রয়েছেন এবং কোনক্রমেই এ সেবার পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না। মীর্জা কামরানের নিকটও অনুরূপ মর্মের এক দাওয়াতনামা প্রেরিত হয়েছিল। কালান বেগের আমন্ত্রণ পেয়ে সম্রাট অগৌণে যাত্রা করলেন এবং আসরের সময়ে 'ভিরা' শহরের সন্নিকটে নদীতীরে গিয়ে পৌঁছালেন। সম্রাট তখন মীর্জা তর্জী বেগকে ঘোটকসহ সাঁতরিয়ে নদী পার হওয়ার আদেশ দিলেন। আদেশ মতো তর্জী বেগ তাঁর ঘোটকসহ নদীতে অবতরণ করলেন; কিন্তু কিছু দূর পর্যন্ত সন্তরণ করেই ঘোটকটি তীরে ফিরে এল এবং বহু চেষ্টায়ও পুনরায় তাকে নদীতে নামানো গেল না। এর পর নদীতে হাতী নামিয়ে দেওয়া হলো এবং তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্রাট স্বয়ং তাঁর ঘোটকসহ নদীতে নেমে পড়লেন। সম্রাটের এ আদর্শে দলের সকলেই নদী পার হওয়ার চেষ্টায় অবতীর্ণ হলেন এবং মগরেবের নামাজের সময় দলের চল্লিশ জন লোকের সকলেই নদী পার হয়ে অপর তীরে উপনীত হলেন। এর পর সারা রাত পথ চলে পর দিন প্রাতে রাজকীয় দল 'ভিরা' শহরে পৌঁছাতে সমর্থ হলো।[১]

ভিরায় পৌঁছে জানা গেল যে, শাহজাদা কামরান আগেই সেখানে পৌঁছেছেন এবং ইতিমধ্যেই তিনি মীর্জা কালান বেগকে স্বীয় সেনাদলের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন। এ সংবাদ জানতে পেরে জব্বার কুলী কুর্চী সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব করলেন যে, যদি তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়, তা' হলে কামরানকে তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন। কুলী কুর্চীর এ-কথায় সম্রাট উত্তর দিলেন—"লাহোরেও মীর্জা হিন্দাল কামরানকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি তাঁর সে প্রস্তাবে রাজী হই নি। আজ কেমন করে এরূপ কোন ব্যাপার সম্ভবপর হবে!"

সম্রাট কুলী কুর্চীকে বিদায় দিয়ে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, খোশাবে গিয়ে হোসেন তামর সুলতান ও তাঁর পুত্রগণকে দলভূক্ত করার চেষ্টাই সঙ্গত হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে ভিরা থেকে রওয়ানা হয়ে জোহরের সময় রাজকীয় দল

১। হুমায়ুনের কাশ্মীর গমনের ইচ্ছা ছিল, এ-কথা জওহর উল্লেখ করেন নি'। কিন্তু অন্যান্য ইতিহাসে এ-বিষয়ে পরিষ্কার উল্লেখ দেখা যায়। বলা হয়েছে যে, বাদশাহ হুমায়ুন কাশ্মীর গমনে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ ও অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং শের শাহ নিকটে এসে পৌঁছার জন্যেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃঃ ও আরস্কিনের ভারতীয় ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

খোশাবে গিয়ে পৌঁছাল। হোসেন তামর সুলতান স্বীয় পুত্রগণসহ অগ্রসর হয়ে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সম্রাটকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে সম্রাট প্রশ্ন করলেন যে, এখন যদি মীর্জা কামরানও এসে উপস্থিত হন, তা'হলে তাঁরা কি করবেন? তাঁরা বিনীতভাবে নিবেদন করলেন যে, সম্রাটের দাস তাঁরা, সম্রাটের জন্যে তাঁরা জান্ কোরবান করতেও প্রস্তুত। সম্রাট তখন তাঁদের অনুরোধ করলেন—সকল সাজ-সরঞ্জাম ও লোকজন নিয়ে তাঁরা যেন সম্রাটের অনুচর রূপে তাঁর দলে যোগদান করেন। সম্রাটের এ অনুরোধ মতো তাঁরা শীঘ্রই রাজকীয় দলে যোগদান করলেন। পর দিন প্রাতঃকালে সেখান থেকে যাত্রা করে সম্রাট সদলবলে মুলতানের দিকে অগ্রসর হলেন। খোশাব থেকে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে এক স্থানে রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ যে, সেখান দিয়ে এক সঙ্গে দু'টি দলের আসা-যাওয়া সম্ভবপর নয়। এখান থেকে কিছু সামনে গিয়ে দু'টি রাস্তা আলাদা হয়ে একটি কাবুলের দিকে এবং অপরটি মুলতানের দিকে চলে গিয়েছে।

এ স্থানে সম্রাটের দল ও মীর্জা কামরানের সহযাত্রীরা একই সময়ে এসে পৌঁছাল। মীর্জা কামরান দাবী করলেন—সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি তাঁর দল আগে অতিক্রম করবে এবং তার পরই সম্রাট সে পথে অগ্রসর হতে পারবেন। সম্রাট কামরানের এ দাবী অশোভন মনে করলেন। সম্রাটের দলে আমীর আবুল বাকা নামক একজন বোজর্গ লোক ছিলেন। তিনি কামরানের কাছে গিয়ে তাঁকে বিশেষভাবে বুঝালেন যে, এ সামান্য ব্যাপার নিয়ে দু'দলে অহেতুক কলহ একান্ত অবাঞ্ছিত এবং এ রাস্তায় প্রথমে সম্রাটকেই যেতে দেওয়া উচিত। মীর্জা কামরান আমীর আবুল বাকার যুক্তি মেনে নিলেন। অতঃপর সম্রাট রাস্তাটি অতিক্রম করে মুলতানের দিকে চলে গেলেন এবং মীর্জা তাঁর লোকজন নিয়ে পরে সে পথে স্বীয় গন্তব্য-স্থলের দিকে অগ্রসর হলেন।

সম্রাট যখন গুল্-বালোচাঁ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, শাহজাদা হিন্দাল, মীর্জা ইয়াদগার নাসির ও কাসেম হোসেন সুলতানের সহিত বালুচীদের যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তারা এঁদের দলবলকে গুজরাটের পথে এগোতে দেয় নি। বাদশাহ সেখানেই শিবির সন্নিবেশ করলেন। তখন এ সংবাদও পাওয়া গেল যে, সম্রাটের পশ্চাদানুসরণকারী খোয়াস খান বিশ ক্রোশ দূরে এসে গিয়েছে। প্রথমে স্থির হলো যে, খোয়াস খানের সহিত যুদ্ধ করা হবে। কিন্তু শেষে জানা গেল—খোয়াস খান সেখানেই থেমে গিয়েছে এবং আর অগ্রসর হবে না। আফগানদের দলের কাছ থেকে এসে আলেগ মীর্জা এ

সংবাদ দিলেন। হিন্দাল, ইয়াদগার মীর্জা ও কাসেম হোসেন গুজরাট গমনের রাস্তা না পেয়ে এখানে এসে সম্রাটের সহিত মিলিত হলেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

সম্রাট অতঃপর 'আউচ'[২] অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং নগরীর নিকবর্তী স্থানে পৌঁছে শিবির সন্নিবেশ করলেন। এখান থেকে তিনি স্থানীয় শক্তিশালী সামন্ত বখ্‌শ্‌ লেঙ্গার নিকট 'খানে-জাহান' উপাধির সনদসহ একটি রাজকীয় ফরমান, একটি নিশান, একটি ঢাল ও চারটি হস্তী প্রেরণ করে তাঁকে অনুরোধ করলেন যে, এ শাহী সম্মানের বিনিময়ে তিনি যেন বাদশাহী শিবিরে রসদ সরবরাহ করেন এবং কয়েকটি নৌকা পাঠিয়ে রাজকীয় দলের নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। সম্রাটের এ ফরমান পেয়ে বখ্‌শ্‌ লেঙ্গা শিবিরে রসদ সরবরাহ করলেন এবং কয়েকটি নৌকাও পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু তিনি নিজে এসে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করলেন না।

২। গ্রীক ইতিহাসের 'অক্সিড্রাসিয়া' (Oxydracea)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'আউচ' থেকে সম্রাটের 'ভাক্কার' যাত্রা

বখ্শ লেঙ্গা প্রেরিত নৌকা এসে গেলে সম্রাট আউচের নিকটে নদী পার হলেন এবং কয়েক দিন পথ চলার পর ভাক্কার নামক স্থানে পৌঁছে শাহ হোসেন মীর্জার উদ্যানে শিবির স্থাপন করলেন। শাহ হোসেন তাঁর এলাকায় সম্রাটের নামে খোৎবাহ্ পড়াতেন এবং তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ চুগ্তাই বংশীয় (তৈমুরের বংশ) বাদশাহদের সমর্থক ছিলেন। নামাজের আজান হয়ে গেলে সম্রাট মীর্জা হিন্দালকে আদেশ দিলেন যে, নদীপথে অগ্রসর হয়ে 'পাতর'[১] নামক স্থানে গিয়ে তিনি অবস্থান করুন। এ জায়গা সেওহান্ জেলায় অবস্থিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াদগার মীর্জাকেও 'বেহিলা'[২] নামক স্থানে গমনের আদেশ দেওয়া হলো। এ স্থান 'ভাক্কার' থেকে বিশ ক্রোশ দরে অবস্থিত ছিল।

সম্রাট অতঃপর কায়সার বেগ বারবাকী ও মীর তাহুর পীরজাদাকে[৩] দূত স্বরূপ থাট্টায় শাহ হোসেন মীর্জার নিকটে প্রেরণ করলেন। এঁরা থাট্টায় গমন করে শাহ হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের এ সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হলো, তৎসম্বন্ধে তাঁরা সম্রাটকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কোন সংবাদই প্রেরণ করলেন না। সম্রাট তখন এক ফরমান প্রেরণ করে তাঁদের জানালেন যে, আর কত দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে, তাঁরা যেন তা' লিখে জানান। সম্রাটের এ ফরমান পেয়ে তাঁরা এক পত্র লিখে সম্রাটকে জানালেন যে, শীঘ্রই তাঁরা ফিরে আসবেন, সম্রাট যেন উদ্বিগ্ন না হন। এর পরও কয়েক দিন অপেক্ষা করেও দূতদের কাছ থেকে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সম্রাট তখন দ্বিতীয় তাগিদ-পত্র পাঠিয়ে দূতদ্বয়কে জানালেন যে, শাহ হোসেন আলস্য বশে তাঁর সহিত সাক্ষাতে

১। কোন কোন ইতিহাসে এ জায়গার নাম 'পাত' লেখা হয়েছে এবং ষ্টুয়ার্টের অনুবাদে 'পুট্' দেখা যায়। কিন্তু স্থানটির সঠিক নাম 'পাতর' হবে। (তারিখে-মাসুমী', ১৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২। তারিখে-মাসুমীতে এ স্থানের নাম 'দরবিলা' বলে উল্লেখিত হয়েছে। আরস্কিনের গ্রন্থেও এ নামই দেখা যায় (তারিখে-মাসুমী, ১৭১ পৃঃ ও আরস্কিন, ২য় খণ্ড, ২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৩। আবুল ফজল এ দু'জন দূতের নাম আমীর তাহুর সদর ও আমীর সমন্দর বেগ বলে উল্লেখ করেছেন। তারিখে-মাসুমী এ নামই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ষ্টুয়ার্ট ও আরস্কিন 'তাহুর বেগ' ও 'কবীর বেগ' (বা কুম্ভীর বেগ) লিখেছেন। (তারিখে-মাসুমী, ১৭৮ পৃঃ, আরস্কিন, ২য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ ও ষ্টুয়ার্ট, ২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বিলম্ব করছেন বলে যদি মনে হয়, তা' হলে তাঁরা অবিলম্বে ফিরে আসুন। সম্রাট তাঁর এ দ্বিতীয় ফরমানে এ-কথাও জানালেন যে, শাহ হোসেনের এলাকায় যখন তিনি উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁর (শাহ হোসেনের) উচিত ছিল সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা। সম্রাটের এ পত্র পেয়ে কায়সার বেগ অবিলম্বে রাজ-সন্নিধানে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মীর তাহুর থাট্টায় অপেক্ষা করে রইলেন। শাহ হোসেন মীর্জা এ সময়ে সম্রাটকে একটি তাবু, একটি গালিচা, নয়টি ঘোটক, একটি উষ্ট্র ও একটি খচ্চর নজর স্বরূপ প্রেরণ করেন।[৪] থাট্টা থেকে প্রত্যাগত দূত বিদিত করলেন—যথাসম্ভব শীঘ্র হুজুরের এ স্থান ত্যাগ করা উচিত। শাহ হোসেন মীর্জা সম্রাটের কাছে এসে সম্মান প্রদর্শনে প্রথমে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু শেষে যখন সম্রাটের ফরমানের মর্ম তিনি অবগত হলেন, তখন বাহানা উপস্থিত করলেন যে, সম্রাট তো চলে গিয়েছেন, তাঁর সন্ধানে আমি কোথায় যাব? এ বাহানায়ই তিনি আসেন নি।"

এ ঘটনার আগে মীর্জা হিন্দালের কাছ থেকে এক পত্র পাওয়া গিয়েছিল। উক্ত পত্রে হিন্দাল প্রস্তাব করেছিলেন যে, যদি তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয় তা' হলে সম্রাটের পক্ষ থেকে তিনি 'সেওহান' দখল করে নিতে পারেন। সম্রাট তখন মীর্জার নামে এক ফরমান পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, শাহ হোসেন অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি। তাঁর কাছে রাজকীয় দূত প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত কি অবস্থা দাঁড়ায়, তা' দেখার জন্যেই অপেক্ষা করে থাকা উচিত।

কায়সার বেগের প্রত্যাবর্তনের পর হিন্দাল মীর্জাকে জানানো হলো যে, রাজকীয় দূত ফিরে এসেছেন এবং শাহ হোসেন ভালো আচরণের পরিচয় দেন নি। এর পর শাহজাদাকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, শীঘ্রই সম্রাট তাঁর (হিন্দালের) কাছে যাচ্ছেন এবং সকলে একত্রিত হয়েই পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে।

সম্রাট অতঃপর হিন্দাল মীর্জার ওখানে যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হলেন। চার দিন পর রাজকীয় দল সে জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল, যেখানে মীর্জা ইয়াদ্গার নাসির অবস্থান করছিলেন। সম্রাটের উপস্থিতি মাত্রই অগ্রসর হয়ে মীর্জা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। শাহানশাহ সেখানে মীর্জা ইয়াদগারের আতিথ্যে দু' দিন অতিবাহিত করেন। তৃতীয় দিন আবার যাত্রা শুরু করা হয়। মীর্জা ইয়াদগারকে তাঁর অবস্থান-স্থলেই রেখে যাওয়া হয় এবং বলা হয় যে, মীর্জা

৪। শাহ হোসেন মীর্জা তাঁর প্রেরিত এ সামান্য উপহার-দ্রব্য শেখ মীরেক পুরানী ও মীর্জা কাসেম তাফায়ী নামক দু'জন নিজস্ব প্রতিনিধির মারফৎ সম্রাটের নিকটে প্রেরণ করেছিলেন। (তারিখে-মাসুমী, ১৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হিন্দালের সহিত পরামর্শের পর যা স্থিরীকৃত হয়, সে খবর তাঁকে যথা-সময়ে পত্রযোগে জানানো হলে তিনি যেন সে পত্রের মর্মানুযায়ী কাজ করেন। এভাবে মীর্জা ইয়াদ্‌গার নাসিরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজকীয় দল আবার যাত্রা করল। তিনি দিন পর সম্রাট সদলবলে 'পাতর' পৌঁছে গেলেন। শাহজাদা হিন্দাল সিন্ধু নদের দশ ক্রোশ আগে অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি সংবাদ পেলেন যে, সম্রাট এসে গেছেন, তখন এগিয়ে এসে সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। সম্রাটকে হিন্দাল স্বীয় বাসস্থানে নিয়ে গেলেন এবং সর্ব-প্রকারে তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হলো।

নবম পরিচ্ছেদ

হামিদাবানু বেগমের সহিত সম্রাটের পরিণয় ও আউচে প্রত্যাবর্তন

একদিন মীর্জা হিন্দালের জননী সম্রাটকে এক ভোজোৎসবে দাওয়াত করেন। উক্ত খানার মজলিসে এক পবিত্রাত্মা তরুণীর প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। সম্রাট তখন জিজ্ঞাসা করলেন—"এ তরুণী কার কন্যা?" এ প্রশ্নের উত্তরে লোকেরা সম্রাটকে জানাল যে, বালিকা হচ্ছেন মীর্জা হিন্দালের উস্তাদের দুহিতা। সম্রাট তখন জানতে চাইলেন—বালিকার বিবাহ হয়েছে কি না। তাঁকে জানানো হলো যে, বালিকার বিবাহের কথাবার্তা স্থিরীকৃত হলেও, বিবাহের উৎসব তখনো সম্পন্ন হয় নি। একথা শুনে সম্রাট নিজেই কুমারীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।[১]

সম্রাটের এ অভিলাষ শাহজাদা হিন্দালের কাছে ভালো মনে হলো না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে রাগতঃ স্বরে বলে ওঠলেন—"সম্রাট আমার ইজ্জত বৃদ্ধি করতে এখানে আসেন নি', বরং নিজের বিবাহের সন্ধানেই এসেছেন। যদি তিনি সত্যি এ কাজ (অর্থাৎ বিবাহ) করেন, তা' হলে নিশ্চয় আমি তাঁর সম্পর্ক ত্যাগ করব।"

হিন্দালের এরূপ রূঢ় আচরণ দেখে তাঁর জননী দিলদার বেগম অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। পুত্রকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে তিনি বলতে লাগলেন—"তুমি বাদশা'র প্রতি চরম বেয়াদবীর পরিচয় দিয়েছ। অথচ ইনিই তোমায় প্রতিপালন করেছেন। নিজের পিতাকে প্রকৃতপক্ষে তুমি কোন দিন দেখও নি।"[২] জননীর এরূপ শাসন-বাক্য সত্ত্বেও মীর্জা হিন্দাল শান্ত হলেন না। তাঁর এরূপ আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট শেষে খানার মজলিস থেকে বেরিয়ে এলেন এবং এক নৌকায় গিয়ে আরোহণ করলেন। হিন্দালের জননী উক্ত নৌকায় গিয়ে সম্রাটকে অনেক প্রবোধ দিয়ে ও বিশেষভাবে অনুরোধ করে আবার ভোজের

১। গুলবদন বেগম তাঁর গ্রন্থে এ বিবাহের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। (হুমায়ুন-নামা, ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২। হিন্দালের জননীর মুখ দিয়ে জওহর এই যে উক্তি করিয়েছেন, তা' সঠিক নয়। আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী ৯২৫ হিজরী সনের ২রা রবিয়ল-আওয়াল তারিখে হিন্দালের জন্ম হয়। সে-সময়ে বাবুর হিন্দুস্তানের উপর আক্রমণ পরিচালনা করছিলেন বলেই তিনি তাঁর নবজাত পুত্রের নাম 'হিন্দাল' রেখেছিলেন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ৯৩ ও ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মজলিসে ফিরিয়ে আনলেন। হিন্দালকেও তিনি শেষ পর্যন্ত শান্ত করতে সমর্থ হলেন এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে সম্রাটের সহিত হামিদা বানুর বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন করে দিলেন। মজলিসে উপস্থিত সকলে হাত তুলে আল্লাহর দরবারে এ বিবাহের সাফল্যের জন্যে মোনাজাত করলেন।[৩]

সম্রাট অতঃপর নব-বিবাহিতা বেগমকে নিয়ে এক নৌকায় আরোহণ করলেন। মীর্জা হিন্দালও ক্রোধের বশে সম্রাটের দল ত্যাগ করে নিজের লোকজনসহ কান্দাহারের পথে চলে গেলেন। সম্রাট নৌকাযোগে ভাক্কার ফিরে গেলেন এবং সেখানে তাঁর পূর্বতন বাসস্থান সে পুরনো বাগান-বাটীতেই কয়েক দিন অতিবাহিত করলেন। এর পর মীর্জা ইয়াদগার নাসিরকে ভাক্কারে রেখে রাজকীয় দল 'সিওহান্' গমন করল।[৪] শাহ হোসেনের অন্যতম আমীর মীর আলায়কা[৫] সে-সময়ে সিওহানের হাকীম ছিলেন। তিনি সম্রাটের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। সম্রাটের অমাত্যগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে পরে শত্রু-পক্ষ দুর্গে গমন করার সঙ্গে সঙ্গেই অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ দখল করে নিতে হবে। অমাত্যদের এ প্রস্তাবে সম্রাট সম্মত হলেন এবং ওজু করে নামাজ পড়তে চলে গেলেন।

মোগল অমাত্যবর্গ যে মতলব করেছিলেন, তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হলো না। সন্ধ্যা হওয়ার পর মীর আলায়কা স্বীয় সৈন্যদলসহ পুনরায় দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক আক্রমণে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে না পেরে মোগল অমাত্যগণ নিজেদের শিবিরে ফিরে এলেন।

সম্রাট তখন দুর্গ অবরোধের আদেশ দিয়ে দুর্গের চতুষ্পার্শে কতিপয় কামান-মঞ্চ তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু রাজকীয় অমাত্যদের অধিকাংশই

৩। সম্রাটের সহিত হামিদা বানু বেগমের বিবাহের সঠিক তারিখ আবুল ফজল বা গুলবদন বেগম কেহই উল্লেখ করেন নি। উভয়েই লিখেছেন যে, ৯৪৮ হিজরী সনের জমাদিয়াল-আওয়াল মাসে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। গুলবদন বেগম বলেছেন যে, দিনটি ছিল সোমবার এবং দ্বিপ্রহরের সময় মীর আবুল বাকা বিবাহ পড়িয়েছিলেন। (হুমায়ুন-নামা, ৫৩ পৃঃ ও আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৪। ভাক্কার থেকে হুমায়ুনের 'সিওহান' যাত্রার তারিখ ১১ই জমাদিয়ল্-আখের ছিল বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। 'তারিখে-মাসুমী' কিন্তু এ তারিখটা ১১ই জমাদিয়ল্-আওয়াল, ৯৪৮ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। (তারিখে-মাসুমী, ১৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৫। গুলবদন বেগম এ ব্যক্তির নাম 'মীর আলায়হা' বলে বর্ণনা করেছেন। তারিখে-মাসুমীও 'মীর-আলায়কা' লিখেছে। ষ্টুয়ার্টের অনুবাদে কিন্তু 'মীর আল্‌কুম্' লেখা হয়েছে। (হুমায়ুন-নামা, ৫৩ পৃঃ, তারিখে-মাসুমী, ১৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

শাহ হোসেনের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা তাঁদের দ্বারা সম্ভবপর হলো না এবং ফলে কোন রূপেই দুর্গ জয় করা গেল না। মীর শেখ আলী বেগ জালায়ের নামক জনৈক সেনানী এ সময়ে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে, শাহ হোসেন মীর্জা থাট্টা থেকে একদল সৈন্য-সহ রওয়ানা হয়ে নদীতীরের পনেরো ক্রোশ দূরে এসে পৌঁছেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সম্রাট যদি পাঁচ শো অশ্বারোহী সৈন্য প্রদান করেন, তা' হলে রাত-দিন পথ চলে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে শাহ হোসেনকে বিপর্যস্ত করা যাবে এবং আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে রাজকীয় দল চরম বিজয়ের অধিকারী হতে পারবে বলে আলী বেগ মত প্রকাশ করলেন। তিনি এ ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেনাদলের লোকেরা এরূপ অভিযানে সম্মত হলো না। কাজেই শেখ আলী বেগের প্রস্তাব মতো ব্যবস্থাবলম্বন সম্ভবপর হয়ে উঠল না।

নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই কিছু সময় কেটে গেল। এর পর মীর্জা ইয়াদগার নাসিরের প্রতি এক ফরমান পাঠিয়ে সম্রাট তাঁকে অনুরোধ করলেন যে, তর্জী বেগের অধীনে এক দল সৈন্য অগৌণে রাজকীয় বাহিনীর সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এ ফরমান প্রাপ্তির পর তর্জী বেগ আনুমানিক দেড় শো[৬] অশ্বারোহী সৈন্যসহ সম্রাটের খেদমতে হাজীর হলেন। এ সামান্য সংখ্যক সৈন্যের আগমনে দুর্গ দখলের কোন ব্যবস্থা কার্যকরী করা গেল না। সম্রাটের অমাত্যবর্গ অতঃপর পরামর্শ দিলেন যে, দুর্গের অবরোধ প্রত্যাহার করে আমাদের স্থানত্যাগ করাই উচিত। এ পরামর্শ মতোই কাজ হলো এবং রাজকীয় বাহিনীর স্থান-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শাহ হোসেন মীর্জার সৈন্যবাহী নৌকাগুলি পাল খাটিয়ে অতি দ্রুত সেখানে এসে হাজীর হলো।[৭]

৬। কাতেবদের লিপি-বিভ্রাটের জন্যে কোন কোন ইতিহাসে ইয়াদগার মীর্জার প্রেরিত এ সাহায্য-কারী সৈন্যের সংখ্যা দেড় লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ অস্বাভাবিক একটি সংখ্যা কিছুতেই সঠিক হতে পারে না। তৎকালে সম্রাটের প্রতি ইয়াদগার মীর্জা ও অন্যান্য অমাত্যগণের ব্যবহার সম্পর্কে বিবেচনা করলেও দেড় শো সংখ্যাটিকেই সঠিক বলে মনে করতে হয়।

৭। 'সিওহান' দুর্গের অবরোধ ১৭ই রজব তারিখে শুরু হয় এবং ১৭ই জিল্‌কদ্ তারিখে শেষ হয়। এ তারিখ আকবর-নামায় (১৭৬ ও ১৭৭ পৃঃ) উল্লেখিত হয়েছে। জওহর এ অবরোধের কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু অন্যান্য ইতিহাসে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এ অবরোধের ব্যর্থতার কারণ স্বরূপ ঐতিহাসিকগণ সম্রাট হুমায়ুনের অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজকীয় বাহিনীতে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে যে, আশেপাশের স্থান সমূহে পোড়া-মাটী নীতি অনুসরণ করে শাহ হোসেন মীর্জার লোকেরা মোগল বাহিনীর রসদ প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। (আকবর-নামা, '১৭৭ পৃঃ ও 'তারিখে-সিন্ধ', ১৭২ ও ১৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সম্রাটের সিওহান ত্যাগের প্রাক্কালে কতিপয় সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। [illegible] শত্রুদল প্রচার করে যে, অশ্ব থেকে পড়ে গিয়ে সম্রাটের হাত-পা' সবই ভেঙে গিয়েছে। দ্বিতীয় গুজবের মাধ্যমে প্রচার করা হয় যে, শাহ হোসেনের লোকেরা সম্রাটের রসদবাহী নৌকাগুলি দখল করে নিয়েছে এবং সেসব নৌকার আরোহিণী কতিপয় স্ত্রীলোক প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় কোনক্রমে রাজকীয় শিবিরে ফিরে এসেছে। তৃতীয় আর একটি গুজবে বলা হয় যে, শাহ হোসেনের নিকট সম্রাট যে দূত প্রেরণ করেন, পথিমধ্যে তাঁকেও লুটেরা-দলের হাতে পড়তে হয়।

এর পর মোনায়েম বেগকে শাহ হোসেনের নিকটে প্রেরণ করে সম্রাট তাঁকে (শাহ হোসেনকে) অনুরোধ করে পাঠান যে, অহেতুক শত্রুতা পোষণ না করে এ দুঃসময়ে তিনি তাঁর (সম্রাটের) সহায়তা করুন। শাহ হোসেন মীর্জা এক পত্র লিখে মোনায়েম বেগকে জানিয়ে দিলেন —"তোমরা আমার এমন কি উপকার করেছ যে, আমি সে-কথা মনে রাখব!" এমন পরিস্থিতির মধ্যে সম্রাটের দলের অধিকাংশ লোকই হতাশ হয়ে ক্রমে ক্রমে দলত্যাগ করে চলে গেল। সম্রাট [illegible] শহরের সম্মুখে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করলেন। এ-সময়ে তাঁর অমাত্যবর্গ পরামর্শ দিলেন যে, বিশাল-বিস্তৃত সিন্ধু নদ যখন নিরাপদে অতিক্রম করা হয়েছে, তখন আফগান বাহিনীর অনুসরণের আর আশঙ্কা নেই এবং এক্ষণে সম্রাট বিনা-বাধায় কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হতে পারেন।

অমাত্যদের এ কথায় সম্রাট মনঃক্ষুণ্ণভাবেই উত্তর দিলেন—"একান্তভাবে বাধ্য না হলে আমি আমার ভ্রাতাদের কাছে কখনো যাব না এবং তাঁদের অধিকৃত দেশের দিকে মুখ পর্যন্ত ফিরাব না।"[৮]

সম্রাট অতঃপর রওশন বেগ কোকাকে নির্দেশ দিলেন যে, নিকটবর্তী পল্লী-অঞ্চলের দশ-বারো ক্রোশ অভ্যন্তরে গিয়ে সেখান থেকে কতিপয় গরু ও মহিষ সংগ্রহ করে এনে সেসব গরু-মহিষের চামড়া দিয়ে নদী পার হওয়ার উপযোগী মশক তৈরী করা হোক। সম্রাটের এ আদেশ মতোই কাজ করা হলো।

নদী পার হওয়ার সময় একটি নৌকাও পাওয়া গেল। তর্দী বেগ এ নৌকা দখল করে তাঁর লোকজনকে এর সাহায্যে নদীর অপর তীরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজকীয় পরিবারের 'আকা (কর্মাধ্যক্ষ) তখন নৌকার নিকটে গিয়ে তর্দী বেগকে উদ্দেশ করে আদেশের ভঙ্গীতে বল্লেন—"নৌকা

৮। মীর্জা কামরান তখন কাবুলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বাস করছিলেন এবং মীর্জা হিন্দালও কান্দাহারে পৌঁছে সাদরে গৃহীত হয়েছিলেন।

থেকে আপনি নিজের জিনিসপত্র নামিয়ে নিন। এ নৌকা দিয়ে শাহানশাহ ও রাজকীয় পরিবারের লোকজনকে পার করা হবে।" আকার এ কথায় তর্জী বেগ তাকে 'বদমায়েশ' বলে গালি দিলেন। আকাও প্রত্যুত্তরে বলে উঠলেন "বদমায়েশ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার মুখ দিয়ে এ শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে।" একথা শুনে তর্জী বেগ নিজের হাতের ঘোড়ার চাবুক দিয়ে আকাকে আঘাত করলেন। আকাও তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারি বের করে তা' দিয়ে তর্জী বেগকে আঘাত করে প্রতিশোধ নিবার প্রয়াস পেলেন। সৌভাগ্য বশতঃ আকার তরবারির এ আঘাত তর্জী বেগের উপরে না পড়ে তাঁর ঘোড়ার জীনের উপরে গিয়ে পড়ল এবং ফলে জীনের সম্মুখের অংশ কেটে গেল। এ সময়ে লোকজন এসে দু' জনকে পৃথক করে দিল।

এ দুর্ঘটনার সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হলে তিনি তর্জী বেগের উচ্চ পদ-মর্যাদার কথা বিবেচনা করে আকার উভয় হস্ত একখানা রুমাল দিয়ে বেঁধে তাকে তর্জী বেগের সম্মুখে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। সম্রাটের এ আদেশ মোতাবেক আকাকে যখন হাত-বাঁধা অবস্থায় তর্জী বেগের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে সহস্তে তাঁর হাতের বন্ধন খুলে দিলেন এবং সম্মানের সহিত তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। তিনি আকাকে একটি অশ্ব এবং একটি পোষাকও উপহার স্বরূপ প্রদান করলেন।

যে সময়ে রাজকীয় দলের লোকেরা নদী পার হচ্ছিল, সে-সময়ে শাহ হোসেন মীর্জার সৈন্যগণ নদীপথে দু'ক্রোশ দূরে এসে পেঁৗছেছিল। সম্রাটের লোকদের মধ্যে যারা এক ক্রোশ দূরত্বের মধ্যে নদী পার হতে পারল, তারা অপর তীরে গিয়ে রাজকীয় দলের সহিত অনায়াসেই মিলিত হতে সমর্থ হলো। কিন্তু যারা আরো দূরবর্তী স্থানে নদী পার হলো, তাদের মধ্যে অনেকে শাহ হোসেনের সৈন্যদের হস্তে পতিত হলো।

মীর্জা ইয়াদ্গারের[৯] সহিত শাহ হোসেন এরূপ গোপন ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর (শাহ হোসেনের) এক কন্যাকে ইয়াদগারের সহিত বিবাহ দিবেন এবং হুমায়ুনের পরিবর্তে তাঁর নামে খোৎবাহ পড়ানো হবে। মীর্জা ইয়াদ্গার নাসির এ গোপন ব্যবস্থায় সম্মত হয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু বাহ্যতঃ

(৯) মীর্জা ইয়াদগার নাসির সম্রাট হুমায়ুনের জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন এবং তিনি সম্রাট বাবুরের এক কন্যাকেও বিবাহ করেন। রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে তাঁকে পরবর্তী কালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। (Cambridge History of India, Vol. IV, Page 41 দ্রষ্টব্য)।

সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রাখেন। ভাবভাব লক্ষ্য করে সম্রাট সন্দিহান হয়ে পড়েন। কিন্তু মীর্জা ইয়াদ্গার তাঁর খাতির-যত্নের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করলেন এবং তাঁকে স্বীয় আবাসে নিয়ে গেলেন। ভাক্কারে একটি সুন্দর মাদ্রাসা ছিল। মীর্জা ইয়াদ্গার সম্রাটকে নিয়ে সেখানে গেলেন এবং মাদ্রাসার ফটকের মধ্যস্থলে তাঁকে উপবেশন করালেন।

সম্রাট যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, তার ঠিক সম্মুখেই দুর্গ-প্রাচীর দণ্ডায়মান ছিল। কৌতুহল পরবশ হয়ে সম্রাট তাঁর কামানগুলির শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আদেশ দিলেন যে, দুর্গ-প্রাচীর লক্ষ্য করে একটা গোলা নিক্ষেপ করা হোক। সম্রাটের আদেশ মতো গোলা নিক্ষিপ্ত হলে গোলাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দুর্গের ভেতরে গিয়ে পতিত হলো এবং সেখানকার একটি এমারতের বিস্তর ক্ষতি হয়ে গেল। এ ঘটনায় একটা হৈ-চৈ ও শোরগোল শুরু হলো এবং পরক্ষণেই দুর্গের ভেতর থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গোলা এসে সম্রাট ও ইয়াদগার মীর্জা যে ফটকের নীচে বসা ছিলেন, তার শীর্ষদেশে পতিত হয়ে ফটকটি ভেঙ্গে দিল। সম্রাট ও মীর্জা দু'জনেই তখন ফটকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। মীর্জা ইয়াদ্গার হাস্য সহকারে মন্তব্য করলেন—"শাহানশাহ্, এটা একটা খেলা ; আর আপনিই এ খেলার সূচনা করেছেন।" মীর্জার এ কথার পর জনৈক লোক এসে সম্রাটের কানে কানে বল্ল যে, মীর্জা ইয়াদ্গার রাজকীয় অনুচরদের গ্রেফ্তার করার মতলব করেছেন। এ-কথা শোনা মাত্রই সম্রাট ওঠে দাঁড়ালেন এবং স্বীয় লোকজনসহ সে স্থান ত্যাগ করলেন। যাত্রাকালে মীর্জা ইয়াদগার সম্রাটকে একটি জীন-সজ্জিত ঘোটক উপহার দিলেন। সম্রাটকে বহন করে তাঁর শিবিরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি হস্তীও সরবরাহ করা হলো।

ইয়াদ্গার মীর্জা সম্রাটকে যে ঘোটকটি উপহার দিয়েছিলেন, খাজা মোয়াজ্জম তা' পাওয়ার জন্যে সম্রাটের নিকট আবেদন করলেন। সম্রাট তখন ঘোটকটি তাঁকে দান করলেন। খাজা মোয়াজ্জম তখন ঘোটকটিসহ পলায়ন করে মীর্জা ইয়াদগারের নিকটে চলে গেলেন। মীর্জা তখন ঘোটকটি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিলেন এবং তাকে একটা খচ্চর দিয়ে পূর্বেকার ঘোটকটি পুনরায় রাজ-শিবিরে প্রেরণ করলেন। দ্বিতীয় দিন তাখ্চি বেগ এবং ফুজায়েল বেগ নামক দু'জন আমীরও পলায়ন করে ইয়াদগার মীর্জার কাছে চলে গেলেন। এর পর খবর পাওয়া গেল যে, ফুজায়েল বেগ তাঁর ভ্রাতা মোনায়েম বেগকেও সম্রাটের কাছ থেকে ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় আছেন। এ-কথা শুনে সম্রাট মন্তব্য করলেন

যে, ফুজায়েল যদি এখানে আসে, তা' হলে নিজেকে বিনষ্ট করার জন্যেই সে আসবে।

এর পর শোনা গেল যে, মোনায়েম বেগ ও তর্জী বেগ এঁরা দু'জনেও পলায়ন করার মতলব করেছেন। সংবাদ শ্রবণ করে সম্রাট সারা রাত জেগে রইলেন এবং মোনায়েম ও তর্জীকে বাধ্য হয়েই রাতভোর তাঁর কাছে থাকতে হলো। প্রভাতে সম্রাট গোসলখানায় গমন করলে সে সুযোগে মোনায়েম বেগ ও তর্জী বেগ স্ব স্ব অশ্ব নিয়ে পলায়নের উদ্যোগ করলেন। রওশন বেগ তোশক্‌বেগী তৎক্ষণাৎ সম্রাটের কাছে গিয়ে সে সংবাদ দিলে সম্রাট আদেশ দিলেন—"এঁদের ডেকে ফিরাও।" বহু লোকে সম্মিলিত ভাবে তাঁদের ডেকে ফিরাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁরা ফিরে এলেন না, বেপরোয়াভাবেই চলে যেতে লাগলেন। অবশেষে সম্রাট স্বয়ং এসে যখন এঁদের আহ্বান করলেন, তখন আর তাঁদের না এসে উপায় রইল না। তাঁরা দু'জনেই শিবিরে ফিরে এলেন। সম্রাট মোনায়েম বেগকে চোখে চোখে রাখার এবং তাঁর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখার জন্যে সকলের প্রতি আদেশ দিলেন। মোনায়েমের এ নজর-বন্দী দশা তর্জী বেগের মনে ভীতির উদ্রেক করল এবং বাধ্য হয়েই তাঁকেও সম্রাটের সন্নিধানে থাকতে হলো।

অতঃপর রাজকীয় কাফেলা ভাক্কার থেকে যাত্রা করে অগ্রসর হলো। পথিমধ্যে 'আরু' নামক গ্রামে একটি খাদ্য-শস্যের বাজার রয়েছে। সে বাজারে যশল্‌মীর অঞ্চল থেকে দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ আনা হয়ে থাকে। রাজকীয় দল যখন সে স্থানের নিকটবর্তী হলো, তখন লোকেরা ভয় পেয়ে তাদের দ্রব্য-সামগ্রী তাড়াতাড়ি উষ্ট্রের উপর বোঝাই করে পলায়ন করল। তাড়াহুড়া করে পলায়নের সময় কিছু কিছু দ্রব্য লোকেরা ফেলে গিয়েছিল। রাজকীয় দলের লোক-লস্কর সেসব পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হস্তগত করল। অতঃপর সেখানেই শিবির সংস্থাপন করে কয়েক দিন পর্যন্ত বেশ আরামের মধ্যেই কাটিয়ে দেওয়া হলো।

একদিন জোহরের নামাজের সময় সেখান থেকে যাত্রা করে সম্রাটের কাফেলা 'আউচ' নগরীর পথে অগ্রসর হলো। যথেষ্ট রসদ সঙ্গে না থাকায় অতি কষ্টের ভেতর দিয়েই কয়েক দিন পর্যন্ত সকলকে পথ চলতে হয়েছিল। ভাক্কার পরগনার সীমান্তবর্তী স্থান 'মহু' পর্যন্ত এরূপ কষ্টই সকলকে সহ্য করতে হয়।

অবশেষে এমন এক অঞ্চলে গিয়ে কাফেলা পৌঁছাল, যে স্থলে পানী সংগ্রহের সুযোগ খুব কমই ছিল। এক সময় সম্রাটের পানীর বোতলটি খালি হয়ে যাওয়ায়

পিপাসায় কাতর হয়ে তিনি তাঁর এ অধম গোলাম জওহর আফতাবচীকে [১০] জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার বোতলে কিছু পানী আছে কি?" উত্তরে আমি (জওহর) নিবেদন করলাম যে, কিছু পানী আমার কাছে রয়েছে। সম্রাট আদেশ করলেন—তাঁর বোতলে পানী ঢেলে দিতে। সম্রাটের আদেশ মতো তাঁর বোতলে সবটা পানী ঢেলে দিলাম এবং পরে মন্তব্য করলাম—"যেখানে এক ফোঁটা পানী পাওয়া যায় না, এ কেমন ভীষণ দেশ! অথচ সারা রাত আমাদের এখানেই পথ চলতে হবে। এ নৈশ-ভ্রমণে যদি দুর্ঘটনা বশতঃ আমি সম্রাটের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তা'হলে পানীর অভাবে নিশ্চয় আমার মৃত্যু হবে।" আমার এ কথা শুনে সম্রাট হাসতে হাসতে তাঁর বোতল থেকে কিছু পানী আমায় ফিরিয়ে দিলেন।

পরদিন প্রাতে আমরা এক হ্রদের কিনারায় পৌঁছালাম এবং সেখানেই শিবির সংস্থাপন করা হলো। আমি—দীনাতিদীন জওহর আফ্‌তাবচী—পানীতে নেমে সাঁতরিয়ে হ্রদের অপর তীরে গিয়েছিলাম, এমন সময় পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা বড় শিংওয়ালা হরিণ আমাদের শিবিরের মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল। একে মারবার জন্যে লোকেরা অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। হরিণটি দৌড়াতে দৌড়াতে পানীতে এসে ঝাপিয়ে পড়ল এবং সাঁতরিয়ে জঙ্গলের দিকে পলায়ন করার চেষ্টা করল। হরিণের এ সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হলে পর তিনি একে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং হ্রদের কিনারায় এসে আমাকে দেখতে পেয়ে আদেশ করলেন—"হরিণটি যেদিকে যাচ্ছে হ্রদের সে তীরে দণ্ডায়মান লোকটিকে চীৎকার করে বলো একে ধৃত করতে, অথবা তোমার দিকে ফিরিয়ে দিতে।" সম্রাটের হুকুম মতো লোকটিকে চীৎকার করে নির্দেশ দেওয়া হলো। লোকটির কাছ থেকে বাধা পেয়ে হরিণটি পুনরায় আমার (জওহর) দিকে আসতে লাগল। তা' দেখতে পেয়েই আমি লাফিয়ে পানীতে নেমে পড়লাম এবং চীৎকার করে বল্লাম —"হরিণের একটি রান্ কিন্তু আমার।" সম্রাট হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—"তাই হবে।" হরিণটি সাঁতরাতে সাঁতরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং অতি সহজেই তাকে আমি ধরে ফেল্লাম। সম্রাট অতঃপর ফতেহ্ বেগকে আদেশ দিলেন—হরিণটিকে হ্রদ থেকে তোলার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে। তার সাহায্যে হরিণটিকে তীরে তোলা হলো এবং জবেহ্ করে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সম্রাট আদেশ দিলেন—"হরিণটিকে চার ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ জওহরকে দাও।" এ নির্দেশ মতো একটি

১০। মূল ফার্সী গ্রন্থ 'তাজকেরাতুল-ওয়াকিয়াত্'-এর লেখক জওহর আফতাবচী।

রান আমাকে (জওহর) দেওয়া হলো। অবশিষ্ট তিন অংশের মধ্যে দু' অংশ সম্রাটের খাস বাবুর্চিখানায় প্রেরিত হলো এবং এক অংশ সম্রাজ্ঞী হামিদা বানু বেগমের জন্যে হেরেমে প্রেরণ করা হলো।

ভাবী সম্রাট জালালুদ্দীন মোহাম্মদ আকবরের জননী এ সময়ে সাত মাসের গর্ভবতী ছিলেন। সুতরাং পথিমধ্যে কোথাও আর বিলম্ব না করে কয়েক দিন পর আমরা 'আউচ' গিয়ে পৌঁছালাম। সম্রাট এক ফরমান জারী করে বখ্‌শ লেঙ্গাকে নির্দেশ দিলেন যে, একজন রাজানুগত লোক হিসেবে তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর (সম্রাটের) সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের লোকজনকে রাজকীয় শিবিরে রসদাদি সরবরাহের জন্যে আদেশ দেন। কিন্তু এ নির্বোধ সামন্ত রাজকীয় এ নির্দেশ পালনের কোন ব্যবস্থা তো করলই না, বরং রাজকীয় লস্করদের সংগৃহীত রসদ পর্যন্ত তার লোকেরা মধ্যে মধ্যে লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতে লাগল। আমরা দেড় মাস কাল সেখানে ছিলাম। খাদ্যের অভাবে এ-সময়ে আমাদের মধ্যে মধ্যে নিকবর্তী জঙ্গল থেকে সংগৃহীত জাম, কুল প্রভৃতি বন্য ফল দ্বারাও ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়েছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

'আউচ' থেকে যাত্রা ও মরু-পথের দুঃখ-দুর্দৈব

রাজকীয় দলের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে যখন 'আউচে' বন্য-ফলও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল, সে-সময়ে মরুচারী এক দরবেশ যশল্মীরের সীমান্তে রাজা মালদেবের এলাকায় একটি দুর্গ দেখতে পেয়ে সম্রাটের কাছে এসে সে সংবাদ জানালেন। এ দুর্গের নাম 'দেলাওয়াড়ী'।[১] দরবেশের কাছ থেকে দুর্গের অবস্থিতির কথা জানতে পেরে সম্রাট অবিলম্বে সে দুর্গের দিকে যাত্রা করার মনস্থ করলেন এবং যথারীতি ব্যবস্থার পর রাজকীয় কাফেলা সে পথে রওয়ানা হলো। যথা-সময়ে দুর্গের সান্নিধ্যে উপনীত হলে যথেষ্ট খাদ্য-শস্য এবং পানী পাওয়া গেল। সেখানে শিবির স্থাপন করে রাজকীয় দল তিন দিন পর্যন্ত বিশ্রাম ভোগ করল।

শেখ আলী বেগ নামক অমাত্য সম্রাটের কাছে এসে প্রস্তাব করলেন যে, অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে দুর্গটি দখল করে নেওয়া হোক্। ঘৃণায় সহিত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সম্রাট জওয়াব দিলেন—"সমগ্র বিশ্বের রাজত্বের বিনিময়েও আশ্রয়-স্থল আক্রমণ করার মতো দুর্মতি আমার হবে না। তা' ছাড়া, এ দুর্গ আক্রমণ করলে মালদেবের মনেও অযথা আঘাত দেওয়া হবে।"

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সে দুর্গের কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে দিনের অবশিষ্টাংশ এবং সারা রাত চলার পরও পানীর কোন সন্ধান না পাওয়ায় রাজকীয় দলকে পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে হলো এবং অতঃপর এক জায়গায় পানী পাওয়া গেল। সম্রাট এখানেই শিবির সংস্থাপনের আদেশ দিলেন। সেখানে রাত্রি যাপন করে পর দিন দ্বিপ্রহরে আবার যাত্রা করা হলো। সেদিনের অবশিষ্ট দু' প্রহর, রাত্রির চার প্রহর এবং পর দিনের তিন প্রহর বেলা পর্যন্ত কাফেলাকে অব্যাহতভাবে চলতে হলো, পথিমধ্যে কোথাও পানী পাওয়া গেল না। পানীর অভাবে দলের লোকজন মৃতকল্প হয়ে পড়ল। দিনের মাত্র এক প্রহর অবশিষ্ট ছিল, লোকেরা হয়রান পেরেশান হয়ে চার দিকে পানীর খোঁজ করতে লাগল। এ সময়ে—জোহর ও আসরের নামাজের মাঝামাঝি সময়ে—একটি মরু-দ্বীপ নজরে পড়ল। সেখানে পানীভর্তি একটি জলাশয় দেখা গেল।

১। আকবর-নামায় এ স্থানের নান 'দিওরআউল' এবং মাসুমী 'দারাউল্' বলে উল্লেখ করেছেন। (আকবর নামা, ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ এবং তারিখে-মাসুমী ,১৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সম্রাট সেখানেই থেমে গেলেন এবং আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করলেন। এখানে শিবির সন্নিবেশ করা হলো এবং সম্রাট পানীতে বহু মশক ভর্তি করে তাঁর নিজের ঘোটকের উপরে চাপিয়ে পশ্চাতে যেসব লোক মৃতকল্প হয়ে পড়েছিল, তাদের সাহায্যার্থ পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে পিপাসায় কাতর লোকদের মধ্যে পানী বিতরণ করে সম্রাট যখন ফিরে আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে জনৈক মোগলকে পিপাসায় মৃতবৎ পড়ে থাকতে দেখা গেল এবং তার পুত্র পিতার শিয়রে উপবিষ্ট ছিল। সম্রাট এ লোকটির কাছ থেকে এক সময় কিছু অর্থ ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। ঋণ-মুক্তির একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে দেখে সম্রাট লোকটিকে বল্লেন—"তুমি আমায় ঋণ মুক্ত করে দাও, আমি তোমায় পানি দিচ্ছি।" লোকটি তখন বল্ল—"এক কাৎরা পানী আমায় নব-জীবন দান করবে; সুতরাং পানীর বিনিময়ে আমি সম্রাটের সম্পূর্ণ ঋণের দাবী প্রত্যাহার করছি।" সম্রাট অতঃপর লোকটিকে পানী পান করিয়ে সুস্থ করে তুললেন। মোনায়েম বেগ, মোজাফ্‌ফর বেগ ও রওশন বেগ কোকা এ ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পিপাসায় কাতর লোকদের এভাবে পানী পান করিয়ে সুস্থ করার পর শিবিরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং যারা এদিন পানীর অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অতঃপর তাদের দফনের ব্যবস্থা করা হয়।[২] এ জায়গা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পানী সংগ্রহ করে নিয়ে রাজকীয় দল পর দিন পুনরায় যাত্রা করল এবং প্রথমে 'ফালুর[৩] এবং তারপর 'পাহলোদী[৪] নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা-বিরতি করল। শেষোক্ত স্থানে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করা গেল। এ জায়গাটা রাজা মালদেবের এলাকায় অবস্থিত ছিল। এখান থেকে যাত্রা করে সম্রাট অবশেষে মালদেবের রাজধানীর নিকবর্তী স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন।

সম্রাট অতঃপর মালবেদের নামে এক ফরমান জারী করে তাঁকে রাজকীয় শিবিরে এসে সাক্ষাৎ করার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু নানা ওজর-আপত্তি দেখিয়ে তিনি সম্রাটের সন্নিধানে উপস্থিত না হয়ে সামান্য কিছু উপহার-দ্রব্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর বিরোধী মনোভাবের কোন প্রকাশ্য প্রমাণ কিন্তু তখন পর্যন্তও পাওয়া যায় নি।

২। মরু-পথের এ সফরে পানীর অভাবে সম্রাটের দলের বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (Cambridge History of India, Vol. IV, page 39)।

৩। ষ্টুয়ার্ট এ স্থানের নাম 'পিয়ালপুর' লিখেছেন। আকবর-নামার বিভিন্ন সংস্করণে নামটি 'ওয়াসলপুর' ও 'হাসলপুর' রূপে লেখা হয়েছে। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ ও তার ইংরাজী অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৪। পাহলোদী—যোধপুর থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী একটি স্থান। (তারিখে-সিন্ধ, ১৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এ সময়ে রাজু নামক সম্রাটের জনৈক দ্বারবান রাজকীয় শিবির থেকে পলায়ন করে মালদেবের কাছে গিয়ে সংবাদ দিল যে, সম্রাটের নিকট কতিপয় মূল্যবান মণি-রত্ন রয়েছে। উক্ত নেমকহারাম ভৃত্য রাজাকে পরামর্শ দিল যে, মণিরত্নগুলি তাঁকে (রাজাকে) প্রদান করার জন্যে সম্রাটের কাছে দাবী উত্থাপন করা হোক। এদিনই জান মুহাম্মদ আয়শেক্ নামক আর এক ব্যক্তিও সম্রাটের শিবির থেকে মালদেবের নিকটে চলে যায় এবং সেও অনুরূপভাবেই মণিরত্নাদির কথা তাঁকে বিদিত করে। এরূপ উস্কানির ফলে মালদেব স্বীয় লোকজনকে এ মর্মে আদেশ প্রদান করেন যে, সম্রাটের কাছে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, তিনি কথিত মণি-রত্নগুলি রাজার হস্তে সমর্পণ করুন, অথবা তাঁর এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করুন।

সম্রাট এ সময়ে 'যোগী' নামক স্থানে এক জলাশয়ের তীরে অবস্থান করে চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে মালদেবের প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে সংবাদাদি সংগ্রহ করছিলেন। এ সব সংবাদের মাধ্যমে সম্রাট যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোন ইচ্ছা রাজার নেই, বরং সুযোগ পেলেই বিরুদ্ধাচরণ করাও তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়, তখন তিনি (সম্রাট) সে স্থান ত্যাগ করে সম্বর-হ্রদের নিকটে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সম্রাটের অমরকোট যাত্রা ও পথের বিভিন্ন ঘটনা

মালদেবের দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হয়ে সম্রাট অমরকোট যাত্রার মনস্থ করলেন এবং রওশন বেগ কোকা ও শামসুদ্দীন মুহাম্মদ লস্করকে পথ-প্রদর্শক সংগ্রহ করে আনার জন্যে আদেশ দিলেন। এ আদেশ অনুযায়ী অমাত্যদ্বয় দু'জন উষ্ট্র-চালককে ধরে এনে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। সম্রাট আদেশ দিলেন যে, এদের উটগুলি রাজকীয় উষ্ট্রযুথের সঙ্গে বেঁধে রেখে এদের তরবারি কেড়ে নেওয়া হোক এবং অতঃপর নিরস্ত্র অবস্থায় এদের নজর-বন্দীর মতো চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা করা হোক। কাজী মেহ্‌দী আলী উভয় উষ্ট্র-চালকের কাছে গিয়ে তাদের বিশেষভাবে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না; বরং তারা যদি রাজকীয় কাফেলাকে অমরকোটের পথ দেখিয়ে দেয়, তা'হলে তাদের উভয়কে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু লোক ূ' জন অমরকোটের পথ চিনে না বলে ভান করল এবং কিছুতেই পথ-প্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হলো না। অল্পক্ষণ পরই এরা নিজেদের বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে খঞ্জর বের করে তরসুন্ বেগকে[১] আঘাত করল এবং সে আঘাতে বেগের মৃত্যু হলো। ইন্না-লিল্লাহে ও ইন্না এলায়হে রাজেঊন।

এর পর লোক ূ'জন রাজকীয় পশুগুলির নিকটে গিয়ে খঞ্জরের আঘাতে নিজেদের উষ্ট্রদ্বয়কে হত্যা করল। সম্রাটের নিজস্ব পশুগুলির মধ্য থেকেও খচ্চরগুলিকে হত্যা করল। রাজকীয় দলে সে-সময়ে মাত্র তিনটি খচ্চর ছিল। এ সময়ে বহু লোক এসে সেখানে সমবেত হলো এবং তারা উন্মত্ত লোক দু'টিকে মেরে ফেল্ল।

এ শোচনীয় ঘটনায় রাজকীয় দলের লোকজনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হলো এবং কেউ কেউ দলত্যাগ করে অন্যত্র গমনের সঙ্কল্প করল। লোকদের এ-হেন মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে সম্রাট সকলকে আহ্বান করে বল্লেন—"আমাকে ত্যাগ করে তোমরা যাবে কোথায়? তোমাদের অপর কোন আশ্রয়ই যে নেই!" সম্রাটের এরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও খাজা কবীর, খাজা আবীর ও মেহ্‌তের রমজান—এ তিন জন লোক সম্রাটের দল ত্যাগ করে মালদেবের নিকটে চলে গেল।

১। 'তরসুন্ বেগ' বাবা জালায়ের-এর পুত্র ছিলেন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৮১ পৃঃ)।

অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, সোজা পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে সম্রাট আদেশ দিলেন যে, অমাত্যবর্গ নিজেদের দলবল সহ সম্মুখে অগ্রসর হবেন এবং মহিলাগণ ও ভৃত্যদের নিয়ে সম্রাট তাঁদের অনুসরণ করবেন। এ ব্যবস্থা মতোই পর দিন সকাল পর্যন্ত কাফেলা অগ্রসর হতে থাকল।

প্রাতে সূর্যোদয়ের পর দেখা গেল—তিন দল সশস্ত্র লোক রাজকীয় কাফেলার অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। এ তিন দলের প্রত্যেকটিতে প্রায় পাঁচ শো করে লোক ছিল। সম্রাট তখন অগ্রবর্তী অমাত্যদের দলের অবস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন। লোকেরা নিবেদন করল যে, হয় তো বা পথ ভুলে তাঁরা সম্রাটের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পশ্চাদ্দিক থেকে যে তিনটি অশ্বারোহী দল এগিয়ে আসছিল, তারা শত্রু বা মিত্র হতে পারে, এ-স ন্ধেও শাহান-শাহ লোকেদের অভিমত জানতে চাইলেন। কিন্তু সঠিক কোন অভিমত প্রকাশ কারো পক্ষে সম্ভবপর হলো না। সম্রাট তখন আদেশ দিলেন যে, ঘোড়াগুলির পৃষ্ঠে যেসব আসবাবপত্র রয়েছে, সেগুলি উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই করে পদাতিকগণ সেসব ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে তৈরী হোক। এ ব্যবস্থা মতো রাজকীয় দলে তখন মোট ১৬ জন অশ্বারোহী সৈনিক দাঁড়াল।

সম্রাট তখন শেখ আলী বেগকে জিজ্ঞেস করলেন—অতঃপর কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উচিত হবে। শেখ আলী বল্লেন—"আমরা এখন হজরত ইমাম হোসেনের মতো দশায় নিপতিত হয়েছি। সংগ্রাম করে শহীদ হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই।" শেখ আলী বেগ আরো বল্লেন—"শাহানশা'র অনেক নূন-নেমক খেয়েছি; আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। আর আপনার সেবার পথে আমি যা' কিছু করেছি, তার সকল দাবী-দাওয়া থেকে আমিও আপনাকে মুক্ত করে দিলাম। এক্ষণে আমায় কয়েক জন ঘোরসওয়ার দিলে আমি এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারি—যারা আমাদের পিছু-পিছু আসছে, তারা কারা।" সম্রাট সাতজন অশ্বারোহীকে শেখ আলী বেগের সঙ্গে দিয়ে দোয়া করে তাদের বিদায় দিলেন।[২]

শেখ আলী বেগ স্বীয় সহচরগণকে বল্লেন—"দুশমনদের তুলনায় আমরা মুষ্টিমেয়। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবেই আমাদের কাজ করতে হবে। শত্রুদলের নিকটবর্তী

২। বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিজামুদ্দীন আহমদের পিতাও শেখ আলী বেগের সহযাত্রী অশ্বারোহীদের মধ্যে একজন ছিলেন। আরস্কিন্ এ দলের অশ্বারোহী সৈনিকদের সংখ্যা বিশ জন বলে উল্লেখ করেছেন। (আরস্কিন, ২য় খণ্ড, ২৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হয়ে একযোগে আমাদের তীর বর্ষণ করতে হবে। অতঃপর জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে।" অনুসরণকারী লোকদের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র পরিকল্পনা মতো তারা সবাই একযোগে তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। খোদার আশ্চর্য মহিমা! এতেই বিজয় লাভ বাস্তবায়িত হয়ে ওঠল। শেখ আলী ও তাঁর সহচরদের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে দুশমনদের দলের ু'জন সরদার আহত হয়ে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গেল এবং তা' দেখেই দলের অন্যান্যরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করল।

শেখ আলী বেগ তখন ভেবুদ চোব্দারকে আদেশ করলেন—শীঘ্র সম্রাটের কাছে গিয়ে এ বিজয়ের বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করতে। ভেবুদ আহত শত্রু দু'জনের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বীয় বর্শাগ্রে বিদ্ধ করে নিল এবং সম্রাটের নিকটে শুভ-সংবাদ জ্ঞাপন করার জন্যে দ্রুত অকুস্থল থেকে প্রস্থান করল। তাঁকে নিকটে আসতে দেখে সম্রাট লোকদের জিজ্ঞেস করলেন—"এ সওয়ার কে, তোমরা চিনতে পারছ কি?" লোকেরা লক্ষ্য করে জওয়াব দিল যে, ভেবুদ চোব্দার বলেই মনে হচ্ছে। সম্রাট তার আগমনকে সৌভাগ্যসূচক মনে করলেন এবং বল্লেন—"ইন্শাল্লাহ্, এ ব্যক্তি ভেবুদই হবে।" শীঘ্রই ভেবুদ নিকটস্থ হলো এবং সম্রাটের সম্মুখে শত্রুদের কর্তিত মুণ্ডগুলি রেখে যুদ্ধ-বিজয়ের শুভ-সংবাদ জ্ঞাপন করল।

সম্রাট আনন্দিত হয়ে শেখ আলী বেগকে ডেকে পাঠালেন। ভেবুদ গিয়ে আলী বেগকে নিয়ে এলো। সম্রাট অতঃপর ভাবী কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আলী বেগের পরামর্শ চাইলে তিনি বল্লেন—"সম্রাট সদলবলে সম্মুখে অগ্রসর হউন এবং আমরা সকল সৈনিক আপনার পৃষ্ঠরক্ষা করে এগোতে থাকব।"—এ ব্যবস্থা মতোই রাজকীয় দল অতঃপর সামনের দিকে এগিয়ে চল্ল।

রাজকীয় দল যখন জশলমীর এলাকায় ছিল, তখন একদল লোককে সম্রাট রসদ সংগ্রহের জন্যে অন্যত্র প্রেরণ করেছিলেন। এ দলের লোকেরা কতিপয় গরু ও মহিষ সংগ্রহ করে প্রত্যাবর্তনের পথে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে মরুভূমির মধ্যস্থ একটি জলাশয়ের তীরে এসে আড্ডা গেড়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এবার রাজকীয় কাফেলা অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ সে জলাশয়ের তীরে এসে উপস্থিত হলে সেখানে অপেক্ষমান দলের সকল ওমরাহ দৌড়ে এসে মহামান্য সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। সম্রাট সেখানেই শিবির সংস্থাপন করলেন এবং ইতিপূর্বে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সেসব কথা বর্ণনা করলেন। সকল ওমরাহ বাদশার কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁর প্রয়োজনের সময় যে তাঁরা সাহায্য

করতে পারেন নি, সে-জন্যে আফসোস্ করলেন। তাঁরা সবাই হাত তুলে মোনাজাত করলেন যে, সকল সময় যেন তাঁরা সম্রাটের পাশে-পাশে থেকে তাঁর সেবা করতে পারেন।

এ সময়ে জশল্মীর থেকে দু'জন দূত এলো। তারা জানাল যে, রাজা মালদেব সম্রাটের কাছে এ-কথা বলার জন্যে তাদের পাঠিয়েছেন যে, তাঁর দেশ একটি হিন্দু রাজ্য, এখানে গো-বধ নিষিদ্ধ। কিন্তু তবু সম্রাট এখানে অনেক গো-হত্যা করেছেন। সম্রাট এ কাজ ভালো করেন নি। সম্রাটের চলার পথে মালদেবের রাজ্য অবস্থিত। তাঁকে অবহেলা করে কোথাও গমন করা সম্রাটের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

দূতদের মুখে এরূপ ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথা শুনে সম্রাট আমীরদের সহিত পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন দূতদ্বয়কে কি জওয়াব দেওয়া যায়। আমীরগণ উত্তর দিলেন—"নতি স্বীকার করে কাজ চলে না, তলোয়ারের সাহায্যেই কাজ করতে হয়। সুতরাং দূতদ্বয়কে বন্দী করে রেখেই আমাদের এখান থেকে সামনে এগোতে হবে।" এ পরামর্শ মতোই কাজ হলো এবং রাজকীয় দল জশলমীরের পথে রওয়ানা হলো। জশলমীরের কাছাকাছি জায়গায় এক দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে একদল লোক সম্রাটের কাফেলাকে আক্রমণ করল। শত্রুদের নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা এসে পীর মুহাম্মদ আখতার শরীরে বিদ্ধ হলো। শেখ আলী বেগ এ অবস্থা দেখে দৌড়ে অগ্রসর হয়ে আক্রমণকারীকে হত্যা করে পীর মুহাম্মদকে উদ্ধার করলেন। শত্রুরা তরবারির আঘাতে রওশন বেগ তোশকবেগীর দক্ষিণ হস্ত জখম করে দেয়। তরশ্ বেগ দৌড়ে রওশন বেগের কাছে গিয়ে তাকে আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা করেন। শত্রুদের তরবারির আঘাতে তরশ বেগেরও হাতের দু'টি অঙ্গুলি কেটে যায়। জোহরের সময় শত্রুদের এ আক্রমণ শুরু হয়েছিল এবং আসরের প্রাক্কালে আক্রমণকারী দল তাদের দুর্গে গিয়ে পুনঃ-প্রবেশ করে।

জশলমীর থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে এক গ্রামে গিয়ে যখন রাজকীয় কাফেলা পৌঁছাল, সম্রাট সেখানেই শিবির সংস্থাপন করলেন। এ গ্রামে প্রচুর খাদ্য-শস্য ও পানী পাওয়া গেল; কিন্তু খুব কম লোকই গ্রামে উপস্থিত ছিল। এ-সময়ে রাজা মালদেব তার পুত্রকে নির্দেশ দেন যে, সম্রাটের যাত্রা-পথের সবগুলি কূপ যেন বালুকা দ্বারা আগে থেকেই বুজিয়ে দেওয়া হয়। সম্রাটের লোক-লস্কর যাতে পানীর অভাবে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে, এ উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। রাজপুত্র পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

পর দিন দ্বিপ্রহরে একটি কূপের কাছে উপস্থিত হয়ে রাজকীয় দলের লোকেরা দেখে বিস্মিত হলো যে, কূপে আদৌ পানী নেই। বালুকা দ্বারা তার তলদেশ ভর্তি করে পানি শুকিয়ে ফেলা হয়েছে। জানা গেল—সম্রাটের যাত্রা-পথের সকল স্থানেই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। রাজকীয় দল সেখানে না থেমে আরো অগ্রসর হলো এবং জোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে আর একটি কূপের নিকট গিয়েও অনুরূপ অবস্থাই দেখা গেল। তাতেও পানী ছিল না। কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ায় কাফেলাকে সে রাতের মতো সেখানেই থাকতে হলো। শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে উষ্ট্রগুলিকে বৃত্তাকারে রেখে সতর্কতা ব্যবস্থা হিসেবে সম্রাট নিজে সে বৃত্তের চতুষ্পার্শ্বে সারা রাত পাহারা দিবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু শেখ আলী বেগ সম্রাটের এ প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী না হয়ে সম্রাটকে নিদ্রা যাওয়ার অনুরোধ করে জানালেন যে, তিনি নিজে উষ্ট্র-বেষ্টনীর বাইরে সারা রাত পাহারা দিবেন। সম্রাটকে অগত্যা নিজের তাবুর মধ্যে গিয়ে নিদ্রার ব্যবস্থা করতে হলো।

রাত্রি বেলা এক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল। সম্রাট নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময় একটি চোর চুপি-চুপি তাঁর তাবুর মধ্যে প্রবেশ করে শয্যার পাশে রক্ষিত তাঁর তলোয়ারখানা খাপ থেকে বের করার চেষ্টা করল। সম্রাটকে সুযোগ মতো হত্যা করার জন্যে শের খান এ লোকটিকে প্রেরণ করেছিল।[৩] যা' হোক, সতর্কতাসূচক কোন শব্দ শুনেই হয় তো তরবারিখানা অর্ধ-বিমুক্ত অবস্থায় রেখে লোকটি তাবু থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল। পর দিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর তরবারিখানা এরূপ অর্ধ-বিমুক্ত অবস্থায় দেখে সম্রাট বিস্মিত হলেন। সম্রাটের ভৃত্য সৈয়দুল খান সম্বল [৪] সম্রাটের পালঙ্কের পার্শ্বে মেঝেতে নিদ্রিত ছিল। সম্রাট তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তরবারিখানা সে খাপ থেকে বের করেছে কিনা। ভৃত্য বিনীতভাবে নিবেদন করল—"এ দাসের এ রকম দুঃসাহস কেমন করে হতে পারে।" যা হোক, ব্যাপারটা এভাবেই শেষ হয়ে গেল এবং সেখান থেকে যাত্রা করে রাজকীয় কাফেলা এমন এক স্থানে গিয়ে উপনীত হলো যেখানে চারটি কূপ ছিল।

৩। ষ্টুয়ার্ট এ লোকটিকে সাধারণ চোর বলে বর্ণনা করেছেন।

৪। গুলবদন বেগম তাঁর গ্রন্থে অপর এক 'সম্বলের' কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। জওহর বর্ণিত এ 'সম্বল' সামান্য ভৃত্য বলেই মনে হয় এবং এ-জন্যেই অপর কোন ইতিহাসে এর নাম পাওয়া যায় না। (গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন-নামা', ৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

চারিটি কূপের মধ্যে তিনটিতে পানী ছিল এবং অপরটি ছিল শুষ্ক। পানীভর্তি তিনটি কূপের মধ্যে একটি সম্রাট ও তাঁর নিজস্ব লোকজনের জন্যে, দ্বিতীয়টি তর্দী বেগ ও মোনায়েম বেগ এবং তাঁদের লোকজনের জন্যে এবং তৃতীয় কূপটি খালেদ বেগ, নাদিম বেগ কোকা, রওশন বেগ কোকা, মীর মোজাফ্ফর তুর্কমান, আলী বেগ ও তাশের বেগের জন্যে নির্দিষ্ট হয়। পানী উত্তোলনের কোন পাত্র কারো কাছে ছিল না। দড়ির মাথায় হাঁড়ি বেঁধে উটের সাহায্যে সে দড়ি টেনে তুলেই অতি কষ্টে পানী সংগ্রহ করা হচ্ছিল। এভাবে পানী সংগ্রহ করতে গিয়ে লোকেদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। এ-সময়ে একদল লোক সম্রাটের কাছে এসে অভিযোগ করল যে, তর্দী বেগ তাঁর ঘোড়া ও উটগুলির জন্যে সব পানী নিয়ে নিচ্ছেন, অপর কারো অশ্ব বা উটের জন্যে পানী পাওয়া যাচ্ছে না। সম্রাট তর্দী বেগকে বিবেচনা সহকারে কাজ করার কথা জানালেন এবং শেষে নিজে একটি অশ্বে আরোহণ করে কূপের পার্শ্বে গিয়ে তর্দী বেগকে সম্বোধন করে তুর্কী ভাষায় বল্লেন—"ভৃত্যদের প্রতি আপনার ব্যবহার ভালো মনে হচ্ছে না। আপনার লোকদের কূপের কিনারা থেকে সরিয়ে নিন, যেন অন্যান্যরা পানী পেতে পারে। এতে ঝগড়া-ফ্যাসাদ থেকে বাঁচা যাবে।" সম্রাটের এ কথার পর তর্দী বেগ নিজের লোকদের কূপের পাশ্ব থেকে সরিয়ে নিলেন এবং অতঃপর অন্যান্য লোকেরা পানী সংগ্রহ করল। কিন্তু তবু বহু লোকে পানী পেল না এবং অনেককে এ-জন্যে কষ্ট পেতে হলো।

এ-সময়ে দেখা গেল জশলমীরের রাজপুত্র একটি শ্বেত-পতাকা [৫] হাতে নিয়ে সম্মুখের দিক থেকে রাজ-শিবিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজের একজন লোক মারফত বলে পাঠালেন—"রায় মালদেব আপনাকে আহ্বান করেছিলেন। আপনি তাঁর রাজ্য-মধ্যে গো-জবেহ্ করেন নি; সুতরাং কোন অন্যায়ও আপনার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নি'। সে দুর্ভাগা লোকটি [৬] আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং এটা তারই দুরদৃষ্ট। আপনি যে তার অপবিত্র জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, এটা ভালোই হয়েছে। এর পর আপনি যখন এদিকে আসার সঙ্কল্প করেন, তখন পূর্বাহ্নে আমাদের জানানো সঙ্গত ছিল। তা' হলে আপনার সেবার সুযোগ আমরা গ্রহণ করতাম।

৫। ইয়র্টও তাঁর অনুবাদে 'শ্বেত-পতাকার' কথা উল্লেখ করেছেন এবং আরস্কিনের গ্রন্থেও বলা হয়েছে—"জশলমীরের রাজ-পুত্র শ্বেত-পতাকা নিয়ে আসেন।" (আরস্কিন, ২য় খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৬। 'সে দুর্ভাগা লোকটি' বলতে এস্থলে সম্ভবতঃ ইয়াদগার নাসির মীর্জার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যা হোক, আপনি যদি এখানে আরো কিছু দিন থাকতে চান, তা' হলে আমি পানী উত্তোলনের জন্যে ষাঁড় ও বালতী পাঠিয়ে দিয়ে আপনার লোক-লস্করের পর্যাপ্ত পানী পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। এ সেবকের যেসব লোককে আপনি বন্দী করে রেখেছেন, তারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও নিরপরাধ। এদের মুক্তি দানের আদেশ দিলে বাধিত হব।" ৭

রাজা মালদেবের পুত্র কর্তৃক প্রেরিত লোকের মুখে এসব কথা শুনে তর্জী বেগ সম্রাটের নিকট নিবেদন করলেন যে, রাজার বন্দী দূতদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া হোক। সুতরাং মুক্তি দিয়ে এদের বিদায় করা হলো। সম্রাট মন্তব্য করলেন যে, লোক দু'টি বেশ ভালোই ছিল।

সম্রাট অতঃপর বল্লেন—"সম্মুখের যাত্রা-বিরতির জায়গায় মাত্র একটি কূপ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কাজেই পানির অভাবে সেখানে লোকেদের কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং আমাদের তিন দলে বিভক্ত হয়েই পর পর তিন দিনে সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। এ পরিকল্পনা মতো তর্জী বেগ, তামর বেগ, খালেদ বেগ ও রওশন বেগকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাট প্রথম দলে উক্ত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পরবর্তী দলে মোনায়েম বেগ, নাদিম কোকাতাশ ও আরো কতিপয় লোক এবং শেষ দলে শেখ আলী বেগ অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে সেখানে গমন করলেন। এরূপ সতর্কতা ব্যবস্থা সত্ত্বে ও রাজকীয় দলের কতিপয় লোক এ যাত্রা-পথে পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ জায়গা থেকে দশ ক্রোশ দূরে অমরকোট শহর অবস্থিত ছিল। কিন্তু এ সময়ে এক অপ্রীতিকর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পথিমধ্যে হোঁচট খেয়ে রওশন বেগের অশ্বটি অকর্মণ্য হয়ে যাওয়ায় তিনি সম্রাটের নিকটে গিয়ে সম্রাজ্ঞীর বাহন অশ্বটি চেয়ে বসলেন। বলা বাহুল্য, এ অশ্বটি আগে রওশন বেগেরই ছিল এবং তিনি নিজেই সম্রাজ্ঞীর ব্যবহারের জন্যে তা' অর্পন করেছিলেন। রওশন বেগের দাবীর কথা শুনেই সম্রাট তখনি স্বীয় অশ্ব থেকে অবতরণ করে সম্রাজ্ঞীকে তাতে উপবেশন করালেন এবং রওশন বেগের অশ্ব তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। সম্রাট অতঃপর কিছু দূর পর্যন্ত পদব্রজে গমন করলেন এবং অতঃপর পানী বহনকারী একটা উষ্ট্র খালি করিয়ে তাতে আরোহন করে পথ চলতে লাগলেন। এভাবে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর খালেদ বেগ

৭। রাজা মালদেবের পূর্বতন ব্যবহারের সহিত লোক-মারফত প্রেরিত এ আবেদনের সঙ্গতি দেখা যায় না। সম্ভবতঃ সম্রাটের কোন ক্ষতি করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয় বিবেচনা করেই রাজা শেষ পর্যন্ত এরূপ দাস্য মনোভাব প্রদর্শনে বাধ্য হন।

নীর অশ্বটি সম্রাটকে প্রদান করলেন এবং তাতে আরোহণ করে তিনি সাত জন মাত্র অশ্বারোহীসহ অমরকোট শহরে প্রবেশ করলেন।

সম্রাটের আগমন-বার্তা শ্রবণ করেই অমরকোটের রাণা[৮] তাঁর তিন ভ্রাতাকে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে সম্মান প্রদর্শনের পর নিবেদন করলেন যে, সেদিন শুভ-লগ্ন না থাকায় পর দিন প্রাতেই সম্রাটকে স্বাগতঃ জ্ঞাপন করে দুর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রাণা স্বয়ং উপস্থিত হবেন। সম্রাটের যেসব লোক-লস্কর পেছনে ছিল, ইতিমধ্যে তারাও এসে পৌঁছাল। পর দিন প্রাতেই রাণা স্বয়ং সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হয়ে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে রাণা অতঃপর সম্রাটকে জানালেন যে, তাঁর দু' সহস্র নিজস্ব অশ্বারোহী সৈন্য রয়েছে এবং অনুগত পদাতিক সৈন্যও আছে পাঁচ হাজার। মোট এ সাত হাজার সৈন্যের সহায়তায় সম্রাট থাট্টা ও ভাক্কার এলাকা দখল করে নিতে পারেন।[৯] সম্রাট উত্তরে জানালেন যে, সেনাদলের তীরন্দাজদের বেতন প্রদানের মতো আর্থিক সঙ্গতি তাঁর নেই। যা হোক, আমীরদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা যায় কিনা, চেষ্টা করে দেখা হবে। এ সময়ে শাহ মুহাম্মদ খোরাসানী এসে সম্রাটের কানে কানে জানালেন যে, আমীরগণ তাঁদের অর্থাদি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, সে সন্ধান তিনি জানেন।

রাণা প্রস্থান করলে পর সম্রাট তাঁর গোসলের বস্ত্র মাত্র পরিধানে রেখে অন্যান্য সকল পোষাক ধৌত করতে দিলেন। এ সময়ে একটা সুন্দর পাখী উড়ে এসে তাবুর মধ্যে প্রবেশ করল। সম্রাট তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে দরজা বন্ধ করে দিয়ে পাখীটিকে ধরে ফেললেন। চিত্রকর মাসুরকে ডেকে এনে কাগজের ওপর পাখীটির একটি চিত্র অঙ্কন করা হলো এবং অতঃপর কাঁচি দিয়ে কয়েকটা সুন্দর পালক কেটে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একে ছেড়ে দেওয়া হলো।

সম্রাট অতঃপর সকল আমীরকে নিজের কাছে ডেকে আনালেন এবং তাঁদের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য চাইলেন। শাহ মুহাম্মদের সঙ্গে কতিপয় ভৃত্যকে

৮। আবুল ফজল অমরকোটের এ রাণার নাম 'প্রসাদ' বলে উল্লেখ করেছেন। আরস্কিনের ইতিহাসেও 'প্রসাদ' নাম দেখা যায় এবং ষ্টুয়ার্টও এ নামই ব্যবহার করেছেন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৯। জওহরের গ্রন্থে এ-কথার উল্লেখ না থাকলেও অন্যান্য ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমরকোটের রাণার পিতা শাহ হোসেন মীর্জার হস্তে নিহত হন। সম্ভবতঃ এ-জন্যেই রাণা প্রসাদ শাহ হোসেনের 'থাট্টা' ও 'ভাক্কার' এলাকা দখল করে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করতেন। (তাবাকাতে-আকবরী, ২০৭ পৃঃ ও হুমায়ুন-নামা', ৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

পাঠিয়ে সকল লোকের বাক্স-পেটেরা ও গাঁঠড়ী-বোঁচ্‌কা তালাস করে অর্থাদি ও মূল্যবান দ্রব্যাদি যা' পাওয়া যায়, সবই নিয়ে আসার জন্যে তিনি আদেশ দিলেন। এ আদেশ মতো লোকেরা খোঁজ করে কিছু অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী এনে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থাপিত করল। অতঃপর আমীরদের উষ্ট্রগুলির পৃষ্ঠে রক্ষিত থলে থেকেও বহু মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী উদ্ধার করা হলো। এ সময়ে হোসেন কুর্চীকে নিয়ে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। এক বৃদ্ধার আমানত ক্ষুদ্র একটা বাক্স তার কাছে ছিল। শান্তির সময় আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত বৃদ্ধা তার এ বাক্সটি হোসেন কুর্চীর কাছে রক্ষিত রেখেছিল। সংগৃহীত দ্রব্যাদির মধ্যে এ বাক্স দেখে হোসেন তা' বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে হাফেজ মুহাম্মদ সুলতান তাকে ধৃত করে সম্রাটের সম্মুখে নিয়ে এলেন। বাক্স খোলা হলে দেখা গেল—তার মধ্যে তিনটি সোনার তাল, ৪২টি সোনার মোহর ও স্বর্ণখচিত কিছু দ্রব্য রয়েছে। সম্রাট তখন ক্রীতদাস কাফুরকে আদেশ দিলেন—হোসেনের কর্ণের কিয়দংশ কেটে নিয়ে তাকে ছেঁড়ে দিতে। কিন্তু কাফুর ভ্রমক্রমে কিয়দংশের পরিবর্তে হোসেনের সম্পূর্ণ কান কেটে ফেল্ল। সম্রাট এতে কাফুরের উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাকে চাকরা থেকে বরখাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন। একটা রুমাল এনে সম্রাট স্বয়ং হোসেনের ক্ষতস্থানের রক্ত ব করার প্রয়াস পেলেন এবং একজন চিকিৎসক ডেকে তার কান সেলাই করে যথাস্থানে পুনঃ-সংযোজিত করা হলো। দুঃখ প্রকাশ করে সম্রাট হোসেন কুর্চীর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনাও করলেন।

এ সন্ধানে আমীরদের কাছ্ থেকে যে অর্থ পাওয়া গেল, তার অর্ধেক মালিকদের ফেরত দেওয়া হলো ও অবশিষ্ট অর্ধাংশ ভৃত্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হলো। যেসব বস্ত্র ও পোষাক পাওয়া গিয়েছিল, তার অর্ধেক নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে সম্রাট অবশিষ্টাংশ মালিকদের ফিরিয়ে দিলেন।

এ ঘটনার পর সম্রাট রাণার সহিত পুনরায় পরামর্শ করলেন এবং ভাবী কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। রাণা পরামর্শ দিলেন যে, সম্রাটের পক্ষে এক্ষণে 'থাট্টা' যাওয়া দরকার এবং 'জোনে'[১০] গিয়ে সেখানকার অনুগত লোকদের সাহায্য গ্রহণই সঙ্গত হবে। রাণার এ পরামর্শ মতো শুভক্ষণ দেখে সম্রাট একদিন অমরকোট ত্যাগ করলেন। সম্রাটের পরিবারভুক্ত মহিলাদের সকলকেই অমরকোট দুর্গে রেখে যাওয়া হলো। যাত্রার প্রথম দিনেই ১২ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে রাজকীয় কাফেলা এক জলাশয়ের তীরে শিবির সংস্থাপন করল।

১০। আবুল ফজল লিখেছেন যে, সিন্ধু-নদের তীরে অবস্থিত 'জোন্' অবস্থানের দিক দিয়ে ও উৎপাদন-কেন্দ্র হিসেবে দেশের অন্যতম প্রধান স্থান রূপে বিবেচিত হতো। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ এবং 'আইনী-আকবরী', ইংরাজী অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ৩৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অমরকোট দুর্গে শাহজাদা মুহাম্মদ আকবরের জন্ম ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ

মহামান্য সম্রাট পূর্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত জলাশয়টির তীরে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় একদিন ফজরের নামাজের সময় অমরকোট দুর্গ থেকে এক দূত এসে উপস্থিত হলো। দূত সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মোবারকবাদ জ্ঞাপনের পর সংবাদ দিল যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে অমরকোট দুর্গে সম্রাটের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। এ সংবাদ অবগত হয়ে সম্রাট আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর অসীম অনুগ্রহের জন্যে শোক্‌রিয়া জ্ঞাপন করলেন।

শাবান মাসের চৌদ্দই তারিখ শনিবার পূর্ণিমা-রজনীতে শাহজাদার জন্ম হয়।[১] পূর্ণিমার চন্দ্রকে 'বদর' বলা হয়। নবজাত শাহজাদা মুহাম্মদ আকবর বদরুদ্দীনের মতোই দ্বীন ও দুনিয়াকে আলোকিত করার জন্যে শাহী দরবারে শুভাগমন করেন। জালালদ্দীন ও বদরুদ্দীন একই নাম। শবে-কদরের মতো আলোকোজ্জ্বল রজনী আর হতে পারে না। সুতরাং চতুর্দশীর এ রাতের আলোকধারা সমগ্র জগতকে আলোকিত করে দিয়েছে।

সম্রাট নামাজ শেষ করার পর অমাত্যগণ তাঁকে সালাম জানাতে হাজীর হলেন। তিনি তখন এ অধম গোলাম জওহর আফতাবচীকে বল্লেন—"তোমার কাছে আমি যে কতকগুলি জিনিস আমানত রেখেছিলাম, সেগুলি কি?" উত্তরে আমি জানালাম যে, সম্রাট আমার কাছে দু'শো শাহ্‌রুখী আশরফী (রৌপ্য মুদ্রা), একটি রৌপ্য বলয় ও একটি মৃগনাভী রেখেছিলেন। আশরফীগুলি ও রৌপ্য বলয়টি শাহানশা'র আদেশ মতো তাদের মালিককে যে আগেই প্রত্যর্পণ করা

---

(১) সম্রাট আকবরের সঠিক জন্ম-তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আবুল ফজল, নিজামুদ্দীন ও ফেরিশ্‌তা ৫ই রজব রবিবার ৯৪৯ হিজ্‌রী তারিখটাকে আকবরের জন্ম-দিন বলে উল্লেখ করেছেন। গুলবদন বেগম স্বয়ং আকবরের জননী হামিদা বানু বেগমের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাঁর গ্রন্থে তারিখ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর মতে—৪ঠা রজব, রবিবার দিন আকবরের জন্ম হয়েছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁর আত্ম-জীবনী 'তোজ্‌ক্‌-'এ স্বীয় পিতা রবিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন বলে উল্লেখ করেছেন। জওহর সর্বক্ষণ সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন বলে তাঁর উক্তির একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হয়—এ ক্ষেত্রে তিনি সম্ভবতঃ ভুল করেছেন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃঃ, ফেরিশ্‌তা, ২য় খণ্ড, ৪১১ পৃঃ, তাবাকাতে-আকবরী, ২০৭ পৃ. তুজুকে-জাহাঙ্গীরী, ৪ পৃঃ ও হুমায়ুন-নামা, ৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হয়েছে, সে কথাও সম্রাটকে আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম। সম্রাট তখন আদেশ দিলেন—"মৃগনাভিটি নিয়ে এস।" আদেশ মতো আমি তা' হুজুরের খেদমতে পেশ করলে পর সম্রাট চীনা মাটীর একখানা বাসন নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। হুকুম মতো বাসন এনে উপস্থিত করলে সম্রাট মৃগনাভিটি কেটে উক্ত বাসনে রাখলেন এবং আমীরদের মধ্যে তা' বণ্টন করে দিতে দিতে বল্লেন—"আল্লাহ্‌তা'লা অনুগ্রহ করে আমাকে যে সন্তান দান করেছেন, তার জন্মের আনন্দোৎসবেরই নিদর্শন হলো এ মৃগনাভি।" সমাগত সকলেই হাত তুলে নব-জাতকের জন্যে দোয়া করলেন এবং সম্রাটকে অভিনন্দন জানালেন। রাজকীয় দল সেদিন উক্ত স্থানে অবস্থান করেই আনন্দোৎসবের ভেতর দিয়ে দিনটি কাটিয়ে ছিল। মৃগনাভীর সুগন্ধের মতোই আকবরের যশঃ-সৌরভ আজ বিশ্বের চারদিকে পরিব্যাপ্ত।

আসরের নামাজের পর রাজকীয় দল আবার যাত্রা শুরু করল। পাঁচ দিন পথ চলার পর যে স্থানে গিয়ে কাফেলা পৌঁছাল, সম্রাট সেখানে অমরকোটের পূর্বতন হাকীম কশাক জানি বেগের গতিবধি সম্পর্কে সন্ধান নিলেন। লোকেরা তাঁকে অবগত করাল যে, জানি বেগ তখন 'জোনে' অবস্থান করছে। তার সহিত মোকাবিলা করার জন্যে অমরকোটের রাণার একদল সৈন্য ও শেখ আলীর নেতৃত্বে এক শো' মোগল সৈন্যকে পাঠানো হলো। এ সম্মিলিত বাহিনী এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, তাদের বাধা দিবার উদ্দেশ্যে জানি বেগ একদল সৈন্যসহ নদী তীরে মোতায়েন রয়েছে।

রাজকীয় দলের সৈন্যরা অবিলম্বে আক্রমণ করল এবং এ আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে কতিপয় হতাহত সৈন্য ফেলে রেখে জানি বেগ নিজের প্রাণ নিয়ে পলায়ন করল। এ যুদ্ধে জানি বেগের কয়েক জন সৈন্য নিহত এবং কয়েক জন বন্দীও হলো। বন্দীদের মধ্যে মুখমণ্ডলে ভীষণ ভাবে আহত একজন পলাতক মোগলও ছিল। মীর্জা কুলী চুলী একে ধৃত করে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করে জানালেন যে, লোকটি একদিন শাহানশাহ্‌কে 'মুর্খ' বলে গাল দিয়েছিল। সম্রাট লোকটির শোচনীয় অবস্থা দেখে মন্তব্য করলেন—"একে ছেড়ে দাও, আল্লাহ্‌ই এর বিচার করেছেন।" অন্যান্য বন্দীদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

এ যুদ্ধের পর বিনা-বাধায়ই 'জোন' শহর দখল করা সম্ভবপর হলো। এখানে এক শ্যামল বাগানে সম্রাটের তাবু খাটানো হলে স্থানীয় একদল কৃষক সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সমবেত হলো। সম্রাট এদের বাগানের চতুষ্পার্শ্বে একটা পরিখা খননের আদেশ দিলেন। অতঃপর জনৈক ব্যক্তিকে এ মর্মে নির্দেশ

জানানো হলো যে, কয়েক দিনের মধ্যেই অমরকোট থেকে শাহজাদা আকবর ও তাঁর জননীকে 'জোনে' নিয়ে আসতে হবে। এ নির্দেশ অনুযায়ী ২০শে রমজান তারিখে ৩৫ দিন বয়সে শাহজাদা আকবর 'জোনে' স্বীয় পিতার সন্নিধানে আনীত হলেন এবং এভাবেই পিতা-পুত্রে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটল।[২]

এক্ষণে আগেকার কতিপয় ঘটনায় আমি (জওহর) ফিরে যাচ্ছি। যে-সময়ে সম্রাট 'সিওহান্' দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন, সে সময়ে দুর্গের ভেতর থেকে শত্রু-পক্ষের একজন সৈনিক অব্যর্থ লক্ষ্যে বন্দুকের গুলী বর্ষণ করছিল। সৈনিকটির এ কৃতিত্ব দেখে সম্রাট তখন মন্তব্য করেছিলেন—"নিশ্চয় একদিন এ লোকটি আমার হাতে এসে যাবে।" যে চোরটি নিশাযোগে সম্রাটের তাবুর মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর পার্শ্বে রক্ষিত তরবারি অর্ধ-বিমুক্ত করে পালিয়ে গিয়েছিল, তাকেও অনুরূপভাবেই হস্তগত করার ইচ্ছা সম্রাট প্রকাশ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে রাজকীয় বাহিনীর 'জোন্' অধিকার করার সময় এ উভয় ব্যক্তিই সে শহরে উপস্থিত ছিল। একদিন শহরের এক শরাবখানায় বসে দু'ব্যক্তি নিজেদের কৃতিত্বের বড়াই করতে গিয়ে তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাহসিকতাপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করতে থাকে। অন্তরালে থেকে এদের কথা শুনে রাজকীয় দলের কয়েক-জন লোক উভয়কে ধৃত করে সম্রাটের সম্মুখে এনে হাজীর করে। সম্রাট তাদের উভয়ের মুখ থেকে অতীত ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করেন এবং অতঃপর সৈনিকটাকে হত্যা করার এবং চোরটিকে ক্ষমা করে মুক্তি দানের আদেশ দেন।

জোনে অবস্থান কালেই সম্রাট স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিদের তাঁর সন্নিধানে হাজীর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে এক ফরমান জারী করেন। এ আদেশের ফলে সৌডাহা (সৌরাষ্ট্র ?), সমিঞ্চা ও কচ্ছের রাণা এবং ভাক্কারের পূর্বতন প্রধান ব্যক্তিদের অন্যতম জাম সাহেব এসে হাজীর হলেন। এ উপলক্ষে প্রায় পনেরো-ষোল হাজার অশ্বারোহী সৈন্য জোনে সমবেত হয়েছিল।

শাহ হোসেন মীর্জা এ সময়ে সম্রাটের শিবির থেকে চার ক্রোশ দূরে নদী-তীরে এসে উপস্থিত হন। একদিন ইফ্‌তারের সময় সম্রাটের হস্তে পানীর গ্লাস ছিল, এমন সময় সংবাদ এলো যে, তরদুন্ বেগ পালিয়ে গিয়েছেন। এ সংবাদ শ্রবণ করে মর্মাহত হয়ে সম্রাট অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করলেন—"আল্লাহ্ করুন, এ হতভাগ্যের মৃত্যু হোক।" আশ্চর্যের বিষয়, কয়েক দিনের মধ্যেই সম্রাটের এ অভিশাপ দৈব-বাণীর মতোই কার্যকরী হলো। শাহ হোসেনের দলে

(২) গুলবদন বেগম বলেছেন যে, জালালুদ্দীন আকবর ৬ মাস বয়সে জোনে নীত হন। জওহরের উক্তির সঙ্গে এ উক্তির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। (হুমায়ুন-নামা, ৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

যোগদানের পর হোসেন তরসুন্ বেগকে একটি কাফ্রী ক্রীতদাস উপহার দেন। উক্ত ক্রীতদাস একদিন কোন অপরাধ করায় তরসুন্ বেগ তার নাসিকা কর্তন করে দেয়। এর পর ক্রীতদাস প্রতিহিংসাপরবশ হয়ে তিন চার দিনের মধ্যেই তরসুন্ বেগের মস্তক ছেদন করে।[৩] এ ঘটনা থেকে নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ুন বাদশাহ গাজী নূরুল্লাহ্ সাহেবের কারামত বা দৈবী-শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, বাদশাহদের দৈবী-শক্তি চল্লিশ জন আওলিয়ার সমান হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন—"মানুষকে আমি আশ্চর্য শক্তির অধিকারী করেছি, আর তারা হচ্ছে দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র খলিফা স্বরূপ।"

শাহ হোসেন মীর্জা রাণাকে একটি মূল্যবান পোষাক, একটি খুব ভালো খঞ্জর এবং কিছু রাজকীয় উপহার-দ্রব্য প্রেরণ করেন এবং লিখে পাঠান যে, তাঁর সহিত যেন রাণা সহযোগিতা করেন। রাণা সেসব উপহার-দ্রব্য এনে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। সম্রাট বল্লেন—প্রেরিত পোষাক একটা কুকুরকে পরিয়ে তার কোমরে খঞ্জরখানা ঝুলিয়ে দেওয়াই উচিত হবে। সম্রাটের এ পরামর্শ মতোই রাণা কাজ করলেন। এ সংবাদ শাহ হোসেন মীর্জার নিকট পৌঁছালে তিনি অতিশয় লজ্জিত হলেন।

এর পর একদিন খাজা গাজী[৪] ও রাণার মধ্যে এক অপ্রীতিকর কলহ ও কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। এ কলহের ফলে ক্রোধান্বিত হয়ে রাণা সম্রাটের সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর দলবলসহ প্রস্থান করলেন এবং যাবার সময় মন্তব্য করলেন যে, মোগলদের সাহায্য করা সময় ও শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। রাণার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য সকল জমিদারও দলত্যাগ করে চলে গেল। সম্রাট এদের অনেক প্রবোধ দিবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু কোন ফলই হলো না।

এ অপ্রীতিকর ঘটনার পর দিন মোনায়েম বেগও সম্রাটকে ত্যাগ করে শাহ হোসেন মীর্জার নিকটে চলে গেলেন। তিনি শাহ হোসেনকে জানালেন যে, সম্রাট উন্মুক্ত ময়দানে তাবু খাটিয়ে অবস্থান করছেন এবং তাঁর অপর কোন আশ্রয়ও নেই। সৌভাগ্যক্রমে এ সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হলো এবং তিনি শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে পরিখা খননের আদেশ দিলেন। সম্রাট স্বয়ং হাতে একটি

৩। গুলবদন বেগমও এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। (হুমায়ুন-নামা, ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।
৪। খাজা গাজীর পত্নী ধাত্রী রূপে আকবরকে স্বীয় স্তন্য-দুগ্ধ দ্বারা প্রতিপালন করেন এবং এ-জন্যেই সম্রাট হুমায়ুন খাজা গাজীর বেশ অনুরক্ত ছিলেন। সম্রাট এঁকে স্বীয় দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেছিলেন। (আকবর-নামা, ইংরেজী অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ১৩০ ও ১৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ছড়ি নিয়ে সর্বত্র ঘুরে কাজের তদারক করতে লাগলেন এবং তিন দিনের মধ্যে রাজকীয় শিবির একটি সুরক্ষিত দুর্গে রূপান্তরিত হলো। শাহ মীর্জা এসে যখন এরূপ সুরক্ষিত অবস্থা দেখতে পেলেন, তখন তিনি মিথ্যা সংবাদ দানের জন্যে মোনায়েম বেগকে দোষারোপ করলেন। যা হোক, উভয় পক্ষের প্রহরী সৈনিকদের মধ্যে কিছু খণ্ড-যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং এ যুদ্ধের ফলে রাজকীয় দলের অন্যতম সেনানী মুহাম্মদ গির্দবাজ নিহত হন।

এ সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল যে, গুজরাট থেকে বৈরাম বেগ এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্যে সম্রাট সকল অমাত্যকে পাঠিয়ে দিলেন। শীঘ্রই শিবিরে পৌঁছে তিনি সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। তাঁর আগমনে সম্রাট অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মন্তব্য করলেন যে, আমাদের দুঃখকষ্টের একজন অংশীদার পাওয়া গেল।[৫] সেদিন অনেক রাত্রে শাহ হোসেনের ক্রীতদাস 'বাচচা' সম্রাটের শিবিরের নিকটে এসে শিঙ্গাধ্বনি করল। শিঙ্গার আওয়াজ শুনেই বৈরাম বেগ, রওশন বেগ এবং আরো কতিপয় সেনানী শত্রুদলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। সম্রাট বৈরাম বেগকে ডেকে ফিরালেন এবং রওশন বেগ ও অন্যান্য আমীরদের নির্দেশ দিলেন—তাঁরা যেন শত্রুদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে যান। আদেশ মতো সেনানীবর্গ শাহ হোসেনের ছাউনীর কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে শাহ হোসেনের অন্যতম সেনাপতি বাবুর কুলীর সহিত রওশন বেগের এক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয়ে গেল। রওশন বেগের বর্শাঘাতে বাবুর কুলী তাঁর অশ্ব থেকে নীচে পড়ে গেলেন। কিন্তু এ সময়েই অপর কেউ এগিয়ে এসে রওশন বেগের অশ্বের পায়ে ভীষণ ভাবে তরবারির আঘাত করল। আহত হয়েও অশ্বটি তার প্রভুকে পৃষ্ঠে নিয়ে শিবিরে ফিরে এলো এবং অতঃপর মাটীতে পড়ে প্রাণত্যাগ করল। তোপ্‌চাক্‌ জাতীয় অশ্বের এ বিশেষ গুণ রয়েছে যে, প্রাণ দিয়ে হলেও তারা আরোহীকে আশ্রয়-স্থল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবার প্রয়াস পায়।

সম্রাট অতঃপর শেখ আলী বেগকে 'চাচ্‌কা' অঞ্চলে গিয়ে রসদাদি সংগ্রহ করে পাঠাবার আদেশ দিলেন। এ আদেশ মতো অবিলম্বে সেখানে গিয়ে শেখ

৫। কনৌজের যুদ্ধে পরাজয়ের পর অন্যতম প্রধান মোগল সেনাপতি বৈরাম খান পলায়ন করে রাজা মিত্র সিং নামক জনৈক জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত জমিদার কিন্তু শের শা'র ভয়ে বৈরাম খানকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। শের শাহ বেশ সমাদরে বৈরাম খানকে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে সুযোগ বুঝে বৈরাম স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু গোয়ালিয়রের পূর্বতন হাকিম আবুল কাসেমকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় পলায়ন করে গুজরাটে চলে যান। গুজরাট থেকে কাথিওয়াড়ের পথে সিন্ধু-দেশে এসে অবশেষে তিনি 'জোন্‌' নামক স্থানে সম্রাট হুমায়ুনের সহিত মিলিত হন। 'আকবর-নামা' গ্রন্থে বৈরাম বেগ সম্পর্কিত এ বিবরণী পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আলী রসদ পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এ সংবাদ জানতে পেরে শাহ হোসেন মীর্জা সুলতান মাহমুদ ভেক্রী নামক সেনানীকে প্রেরণ করে রাজকীয় শিবিরে রসদ আনয়নের পথে বাধা সৃষ্টির প্রয়াস পেলেন। শাহ হোসেন মীর্জার এ ব্যবস্থার কথা জানতে পেরে সম্রাট অগৌণে তহুর সুলতানকে শেখ আলী বেগের সাহায্যার্থ প্রেরণ করলেন। তহুর সুলতান যখন শেখ আলী বেগের সহিত গিয়ে মিলিত হলেন, তিনি (আলী বেগ) কিন্তু তাঁর আগমন মোটেই পছন্দ করলেন না। শেষ পযন্ত রসদ সংগ্রহের ব্যাপারে দু' জনের লোক-লস্করদের মধ্যে কিঞ্চিৎ কলহ-কোন্দলও হয়ে গেল।

এ সময়ে সম্রাট একদিন মন্তব্য করলেন —"যুদ্ধ করার মতলবে হোসেন মীর্জা তিন-চার বার এসে গিয়েছেন। পর দিন প্রাতে যদি তিনি আবার আসেন, তা' হলে শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরাও যুদ্ধ করব এবং তাঁর শক্তি পরীক্ষা করে দেখব।" এর পর আল্লাহ্‌র দরগায় সাফল্যের জন্যে মোনাজাত করা হলো। অসামরিক যে সব লোকের কাছে অশ্ব ছিল, তাদের কাছ থেকে অশ্বগুলি নিয়ে যুদ্ধক্ষম লোকদের মধ্যে বিতরণ করে এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হলো যে, পর দিন যুদ্ধ করা হবে।

তখন রমজান মাস ছিল। ইফ্‌তারের পর রাত্রি যখন প্রায় এক প্রহর হয়ে গেছে, সে-সময়ে একজন লোক নদীর কিনারা থেকে এসে জানাল যে, নদীর অপর তীরে দাঁড়িয়ে একজন লোক নৌকা পাঠিয়ে দিবার কথা বলছে। সম্রাট তখন আদেশ দিলেন—লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করা হোক। সম্রাটের এ আদেশ মতো নদীতীরে গিয়ে যখন চীৎকার করে লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি উত্তরে নিজের নাম "আলম তামের সুলতান" [৬] বলে উল্লেখ করলেন। সম্রাটকে একথা জানালে তিনি নৌকা প্রেরণ করার আদেশ দিয়ে বলে ওঠলেন —"আল্লাহ্ ভালো করুন!" শীঘ্রই নৌকাযোগে নদী পেরিয়ে তামের সুলতান শিবিরে এসে পৌঁছালেন এবং সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জানালেন যে, আলী বেগ নিহত হয়েছেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি নিজে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। পর দিন যুদ্ধ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছিল; কিন্তু এ ঘটনা অবগত হওয়ার পর সারা রাত সম্রাট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অবস্থায় কাটালেন।

৬। আরস্কিন্ এ নামটা "আয়শান্ তাইমুর" এবং তাওয়ারিখে-মাসুমী 'আসান তাইমুর' বলে উল্লেখ করেছেন (আরস্কিন্, ২য় খণ্ড, ২৬০ পৃঃ ও তারিখে-মাসুমী, ১৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

পর দিন শাহ হোসেন মীর্জা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়ে স্বীয় অশ্বোপরি আরোহণ করছিলেন, এমন সময় মুহাম্মদ হোসেন বেনোয়াজ্ রাজকীয় দল থেকে পলায়ন করে তাঁর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি মীর্জাকে জানালেন যে, তাদের সুলতানের অধীনস্থ সেনাদল পরাজিত হয়েছে এবং শেখ আলী বেগ নিহত হয়েছেন। সম্রাট যে সেদিন যুদ্ধ করার সঙ্কল্প নিয়েছেন, তাও উল্লেখ করে মুহাম্মদ হোসেন বেনোয়াজ মন্তব্য করলেন—"অবস্থা একান্ত সঙ্গীন। সম্রাটের দৃঢ় সঙ্কল্পের বিষয় বিবেচনা করে আপনি তাঁর সহিত আপোস করলেই ভালো হবে এবং তা' হলে সম্রাটও পেরেশানী থেকে বেঁচে যেতে পারেন।"

মুহাম্মদ হোসেন বেনোয়াজের এ পরামর্শের পর শাহ হোসেন মীর্জা সেদিনকার মতো যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখলেন। অতঃপর কয়েক দিন পর্যন্ত উভয় দলের মধ্যে সংস্পর্শ একেবারেই বন্ধ রইল এবং পরে একদিন শাহ হোসেন বাবুর কুলীকে সামান্য কিছু উপহার-দ্রব্যসহ সম্রাটের নিকটে প্রেরণ করলেন। বাবুর কুলী সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শাহ হোসেনের পক্ষ থেকে অতীত কার্যকলাপের জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করলেন এবং জানালেন যে, কেবলমাত্র লজ্জা বশতঃই শাহ হোসেন নিজে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করতে আসতে পারেন নি'।

বাবুর কুলীর সহিত আলাপ করতে গিয়ে সম্রাট একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—তিনি ও রওশন বেগের মধ্যে বয়সে বড় কে? উভয়েই স্ব স্ব বয়স হিসাব করে যখন সম্রাটকে তা' জানালেন, তখন দেখা গেল রওশন বেগের বয়স বাবুর কুলী থেকে কিছু কম। কয়েক দিন আগে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয়, সম্রাট বাবুর কুলীর মুখ থেকে তার বিবরণ জানতে চাইলেন। বাবুর কুলী জানালেন যে, রওশন বেগ বর্শার আঘাতে তাঁকে ঘোড়ার উপর থেকে নীচে ফেলে দেন, কিন্তু আহত করতে পারেন নি'। অতঃপর অপর কোন ব্যক্তি এগিয়ে এসে তরবারি দ্বারা রওশন বেগের ঘোটকটিকে আহত করে।

এ বিবরণ শুনে সম্রাট উভয় সেনাপতিকে পরস্পরের সহিত কোলাকুলি করতে আহ্বান করেন। তাঁরা দু'জনেই পরস্পরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন। বাবুর কুলীকে সম্রাট অতঃপর এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় করেন যে, শীঘ্রই তিনি সিন্ধুদেশ ত্যাগ করবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সিন্ধুদেশ ত্যাগ করে সম্রাটের কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা

বাবর কুলী শাহ হোসেন মীর্জার নিকট প্রত্যাবর্তন করে জানালেন যে, সম্রাট শীঘ্রই সিন্ধুদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ; কিন্তু তাঁর সফরের জন্যে কিছু রাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন রয়েছে। আপোস-আলোচনায় শেষে স্থির হলো যে, দু'হাজার বস্তা খাদ্য-শস্য তিন শো উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করে একটা নির্দিষ্ট গ্রামে শাহ হোসেনের পক্ষ থেকে জমা করতে হবে এবং সে গ্রাম থেকে সম্রাটের লোকেরা তা' নিয়ে যাবেন। এ সিদ্ধান্ত মতো সম্রাট নিজের সকল দ্রব্যাদি নৌকায় বোঝাই করে উক্ত নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছেই দেখতে পেলেন যে, শাহ হোসেন কর্তৃক প্রেরিত খাদ্য-শস্যের বস্তাসমূহ ও উটগুলি আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। সম্রাট উক্ত স্থানেই স্বীয় দলের লোকজনের মধ্যে সরঞ্জামের অনুপাত মতো খাদ্য-শস্য ও উটগুলি ভাগ করে দিলেন এবং অতঃপর সিওহানের দিকে যাত্রা করলেন।[১]

নাসির খস্‌রু মীর্জা (ইয়াদগার নাসির মীর্জা) শাহ হোসেন মীর্জার কন্যাকে বিবাহ করে বাদশাহ হওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু শাহ হোসেন তাঁকে বিশেষভাবে অপমানিত করেই শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দেন। তিনি এরূপ আদেশও দিলেন যে, ইয়াদগার নাসির মীর্জার প্রত্যেকটি লোকের জন্যে একটি করে রৌপ্য-মুদ্রা, প্রত্যেক উষ্ট্রের জন্যে সাত রৌপ্য-মুদ্রা এবং প্রত্যেকটি ঘোটকের জন্যে পাঁচ রৌপ্য-মুদ্রা করে কর প্রদান করতে হবে। এরূপভাবেই বাদশাহী ও শাহ হোসেনের কন্যা লাভের পরিবর্তে ইয়াদ-গার মীর্জাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়েই নদীর কিনারায় এসে পৌঁছাতে হলো। শ্রেষ্ঠ অভিভাবককে ত্যাগ করার এ পুরস্কারই তাঁর ভাগ্যে জুটল!

সিওহান্ থেকে সামনে এগিয়ে সম্রাট ফতেহ্‌পুর-কান্দাওয়ার[২] নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখান থেকে যাত্রা করে দু' দিন চলার পর রাজকীয় কাফেলা এমন এক জায়গায় গিয়ে উপনীত হলো—যার সাম্‌নে ও পশ্চাতে দু'দিকেই দু'টি ঝর্ণা অবস্থিত ছিল। ঝর্ণা দু'টির মধ্যে একটির পানী ছিল সুমিষ্ট এবং অপরটি লবণাক্ত পানীতে পরিপূর্ণ ছিল। সম্রাট জানতে চাইলেন—কোন্ ঝর্ণার পানী

১। সম্রাটের 'জোন্' ত্যাগের তারিখ ৭ই রবিয়স্-সানী, ৯৫০ হিজরী (১০ই জুলাই, ১৫৪৩খৃঃ) বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন।
২। মানচিত্রের 'গুণ্ডাভা'।

সুমিষ্ট। পথ-প্রদর্শক জানাল যে, সাত ক্রোশ পশ্চাতে যে ঝর্ণা ফেলে আসা হয়েছে, তারি পানী সুমিষ্ট। এ-কথা শুনে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। পরে জানা গেল যে, শাহ হোসেনের ইঙ্গিতেই মিষ্টি পানীর ঝর্ণার পথে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে আসা হয়েছে। যা হোক, সম্রাট তখনি কতিপয় লোক সঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে চল্লেন এবং রাত্রি এক প্রহরের সময় মিষ্ট পানীর ঝর্ণার কাছে পৌঁছে গেলেন। ঝর্ণার পানীতে ওজু করে নিয়ে সম্রাট সর্বাগ্রে নামাজ পড়ে নিলেন এবং অতঃপর সুমিষ্ট পানী পান করে তৃপ্ত হলেন। সেখান থেকে প্রচুর পানী সংগ্রহ করে লোকেরা পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে এলো এবং সেদিন সেখানেই অবস্থান করে রাত কাটানো গেল।

পরবর্তী দিবস আসরের নামাজের সময় কাফেলা আবার যাত্রা করল। সেদিনের গন্তব্য-স্থল খুব বেশী দূরে ছিল না, এমন সময় দলের পানী বহনকারী উষ্ট্রটি ক্লান্ত হয়ে অকস্মাৎ পথিমধ্যে বসে পড়ল। এ অধম লেখক জওহর আফতাবচী সম্রাটের নিকটে গিয়ে নিবেদন করল যে, উষ্ট্রটি এত বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, আর চলতে পারছে না। সম্রাট আদেশ দিলেন—উটের পৃষ্ঠ থেকে বোঝা নামিয়ে লোক মারফত বহন করে সেগুলি সম্মুখস্থ শিবিরের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু গন্তব্য স্থল খুবই নিকটে এসে গিয়েছিল বলে কেউ এ নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করল না ; উষ্ট্রটিকে পেছনে ফেলে রেখে প্রায় সকলেই শিবির স্থাপনের জায়গায় চলে গেল। আমি (জওহর) অপর একজন মাত্র সঙ্গীসহ উটটির পাহারায় থেকে গেলাম। একা পেয়ে একদল দস্যু এগিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করল। তারা আমাকে তীরের আঘাতে আহত করল এবং আমার সঙ্গী রুয়ীন তোপচীও অনুরূপভাবেই আঘাত পেল। আমি (জওহর) চীৎকার করে বলতে লাগলাম—"দস্যুদল আমাদের ঘিরে ফেলেছে, তারা আমাদের সব-কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে।" আমার এ চীৎকার শিবির পর্যন্ত গিয়ে পৌছাল। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন-"কার চীৎকার শোনা যাচ্ছে?" তর্জী বেগ উত্তর দিলেন—"লোকেরা আমোদ-স্ফূর্তি করছে, এ সম্ভবতঃ তাদেরি চীৎকার!" কিন্তু সম্রাট এ উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আবার তিনি বল্লেন-"আমি শুনতে পাচ্ছি—চীৎকার করে কেউ বলছে যে, দস্যুরা তাদের ঘিরে ফেলেছে। এ কেমন আমোদ-স্ফূর্তি!" সম্রাটের এ মন্তব্যের পর খাজা মোয়াজ্জম ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের কাছে এসে দেখতে পেলেন যে, দস্যুরা সকল দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে পালিয়ে গিয়েছে। আমরা উটটিকে নিয়ে তাঁর সাথে শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম।

এ জায়গা থেকে যাত্রা করে পর দিন আমরা এমন এক জঙ্গলে গিয়ে উপনীত হলাম—যেখানে গ্রীষ্মকালে লু-হাওয়া প্রবাহিত হয় এবং অত্যধিক গরমে মানুষ কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। শীতকালে আবার এখানে এমন ঠাণ্ডা পড়ে যে, তপ্ত তরল পদার্থও পাত্র থেকে বাইরে বের করার সাথে সাথেই বরফের মতো শক্ত হয়ে যায়। রাজকীয় দলে যাদের গরম বস্ত্র ছিল না, এ স্থানে তাদের শীতে খুবই কষ্ট সহ্য করতে হয়। সম্রাটের কাছে একটি পশুলোমের জোব্বা ছিল। এর বহিরাবরণটি স্বতন্ত্র করে নিয়ে মেহতের ওয়াসেলকে আহ্বান করে তাঁর মারফত উহা বৈরাম বেগকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জোব্বার ভেতরের আস্তরণটি মাহকর আনিসকে[৩] প্রেরণ করা হয়। এঁদের উভয়েই শীতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন এবং এ-জন্যেই সম্রাট তাঁদের প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

এ শীতের জায়গা থেকে রওয়ানা হয়ে রাজকীয় দল কান্দাহার অঞ্চলের পরগনা 'শাল-মস্তান'[৪] নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছাল। সম্রাট স্থানীয় একটি বাগানে শিবির সন্নিবেশ করে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় একটি লোক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম করল। লোকটি সম্রাটকে প্রশ্ন করল মীর্জা আসকারী সম্পর্কে কোন খবর তিনি রাখেন কি না। সম্রাট ব ন যে, তিনি কোন খবর জানেন না; লোকটি যদি কোন খবর পেয়ে থাকে, তা'হলে সে তা' অনায়াসে বলতে পারে। লোকটি তখন সম্রাটকে অনুরোধ করল, সেখানে উপস্থিত সকল লোককে সরিয়ে দিবার জন্যে। সম্রাট ভৃত্যদের সকলকে সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সম্রাটের কথা মতো সকলেই দূরে সরে গেল। কিন্তু এ অধম লেখক (জওহর আফতাবচী) তখনো সম্রাটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। লোকটি আমার প্রতি ইঙ্গিত করে সেখান থেকে চলে যাওয়ার কথা বল্ল। সম্রাট তখন বল্লেন—"এ তো নেহায়েত ছেলে-মানুষ। একে ভয় করার কোন কারণ নেই।" লোকটি তখন সম্রাটকে জানাল যে, পর দিন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে মীর্জা আসকরী সম্রাটের শিবিরে এসে পৌঁছাবেন। তিনি সম্রাটের শত্রুদের সাহায্য করতে চাচ্ছেন। শাহানশাহ তখন লোকটিকে প্রশ্ন করলেন—এ সংবাদ সে কোত্থেকে সংগ্রহ করেছে? উত্তরে লোকটি জানাল যে, তার পুত্র মীর্জার সঙ্গে এসেছে। নিকটবর্তী পাহাড়ী পথ অতিক্রম করার সময় সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন

৩। ষ্টুয়ার্টের অনুবাদে এ নামটি 'আতিস্' লেখা হয়েছে।

৪। আবুল ফজল এ স্থানের নাম শুধু 'শাল্' বলে উল্লেখ করেছেন। কোয়েটার প্রাচীন নাম 'শাল' ছিল। 'মস্তান' প্রকৃত-পক্ষে 'মস্তাং' হবে। 'শাল' ও 'মস্তাং' এক জায়গা নয়, বরং দুটি স্বতন্ত্র স্থান। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হয়ে পড়ে এবং এ সুযোগে সে দলের অন্যান্যদের চেয়ে আগে এসে এ সংবাদ জ্ঞাপন করেছে।

লোকটির কাছ থেকে সংবাদ প্রাপ্তির পর সম্রাট শিবিরের ভেতরে চলে এলেন এবং সামান্য যা' খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত ছিল, তাই দিয়ে ইফতার সম্পন্ন করলেন। সেহ্‌রীর সময়ও অনুরূপভাবেই আহার শেষ করলেন এবং সে-সময়ে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের লক্ষ্য করে মন্তব্য করলেন—"হিন্দুস্তানের লোকেরা প্রকৃতই অত্যন্ত বিশ্বাসী হয়ে থাকে।" অতঃপর ভৃত্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বল্লেন—"তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমাদের বন্ধুদের সদিচ্ছাই পূর্ণ হবে।" সকল ভৃত্য হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরগায় সম্রাটের কল্যাণ ও সাফল্যের জন্যে মোনাজাত করল। ফজরের নামাজের পর সম্রাট বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শয়ন করলেন এবং লোকেরাও সব্বাই নিজ নিজ কাজে চলে গেল।

দ্বিপ্রহরের সময় পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের দিক থেকে আগত একজন অশ্বারোহী অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে শিবিরের সম্মুখে এসে জিজ্ঞেস করল—সম্রাট কি করছেন? উপস্থিত লোকেরা তাকে অশ্বটি সেখানে রেখে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। কিন্তু আগন্তুক তার অশ্বের লাগাম হাতে রেখেই সম্রাটের তাবুর ভেতরে প্রবেশ করল। সম্রাট তখন নিদ্রিত ছিলেন; কিন্তু লোকটির আগমনে তাঁর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। লোকটি শাহানশাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলেন—তিনি কোন সংবাদ পেয়েছেন কি না? উত্তরে সম্রাট জানালেন যে, কোন সংবাদই কোন জায়গা থেকে তিনি পান নি'। লোকটি তখন জানাল যে, মীর্জা আসকরী সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যে এগিয়ে আসছেন। সম্রাট অতঃপর লোকটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। আগন্তুক জানাল যে, তার নাম চোবে বাহাদুর [৫], সে উজ্‌বেক জাতীয় এবং কাসেম হোসেন সুলতান কর্তৃক সে প্রেরিত হয়েছে। সম্রাট অতঃপর লোকটিকে বিদায় দিয়ে বৈরাম বেগকে ডেকে পাঠালেন।

বৈরাম বেগ সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হলে পর সম্রাট তাঁকে প্রাপ্ত সংবাদ জানিয়ে আশু কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। বৈরাম বেগ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, এ-সময়ে সম্রাটের সদলবলে স্থানত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু সম্রাট বল্লেন—"না, তা' হতে পারে না। আমাদের যুদ্ধ করাই উচিত হবে।" বৈরাম বেগ পুনরায় যুক্তি পেশ করলেন—"আমাদের লোক-সংখ্যা নেহায়েত কম; আর

৫। তাজকেরাতুল্ ওয়াকিয়াতের অধিকাংশ কপিতেই এ নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু ষ্টুয়ার্টের অনুবাদে 'জুয়ী বাহাদুর' লেখা হয়েছে। আকবর-নামায় 'জয়-বাহাদুর' দেখা যায়। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৯০ পৃঃ ও ষ্টুয়ার্টের অনবাদ, ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

তারা বিপুল সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসছে। সুতরাং এ জায়গা ছেড়ে আমাদের চলে যাওয়াই ভালো হবে।” সম্রাট কিন্তু তবু বৈরাম বেগের যুক্তি মেনে না নিয়ে বল্লেন—“আমাদের কাছে দু'টো কামান রয়েছে, আর আমাদের অধিকাংশ লোকই বন্দুকধারী। সুতরাং আক্রমণকারী হতভাগাদের উপর আমরা অজস্রধারায় অগ্নি বর্ষণ করতে পারব। তার পর আল্লাহ্ যা' করেন, তাই হবে।”

মীর্জা আসকরীর সৈন্য-সংখ্যার আধিক্যের কথা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত স্থানত্যাগের সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো।[৬] সম্রাট তখন তর্জী বেগের নিকট তাঁর অশ্বটি চাইলেন; কিন্তু এ অমাত্য স্বীয় অশ্ব প্রদান করতে সম্মত হলেন না। অগত্যা বেগমকে স্বীয় অশ্বোপরি উপবেশ করিয়ে সম্রাট শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন। সম্রাটের সঙ্গে তখন মাত্র বেয়াল্লিশ জন লোক ছিল; তন্মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। মহিলা দু'জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন সম্রাটের মহিষী বেগম মরিয়ম মাকানী এবং দ্বিতীয়া হলেন হাসান আলী আয়শেক্ আকার পত্নী। আকার এ পত্নী জনৈক বালুচ সর্দারের কন্যা ছিলেন। শিবিরে অন্যান্য যেসব ভৃত্য ও লোকজন ছিল, তাদের শাহজাদা আকবরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রেখে যাওয়া হলো। শাহজাদার বয়স এ সময়ে দেড় বৎসর হয়েছিল।

শিবির ত্যাগ করে সম্রাটের প্রস্থানের পর মীর্জা আসকরীর অন্যতম পদস্থ কর্মচারী খাজা সেকেন্দার এসে শিবিরে উপস্থিত হলেন। সম্রাট শিবির ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন দেখে তিনি মন্তব্য করলেন যে, সম্রাটের সেবায় ধন্য হওয়ার মতলবেই মীর্জা আসকরী এখানে এসেছেন। সুতরাং সম্রাটের জঙ্গলে আত্ম-গোপনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এর কিছুক্ষণ পরেই স্বয়ং মীর্জা আসকরী এসে সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হলেন। শিশু শাহজাদাকে তখন আসকরীর সম্মুখে নিয়ে আসা হলো এবং তিনি সস্নেহে শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। সম্রাটের যেসব জিনিসপত্র ছিল, মীর্জা আসকরী তার সবই তাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একটি বাক্সে কতকগুলি অদ্ভুত ধরনের প্রস্তর ছিল। বাক্সটি ওজনে খুব ভারী ছিল বলে মীর্জা আসকরী মনে করলেন তার ভেতরে সম্ভবতঃ সোনা রয়েছে। কিন্তু বাক্সটি খুলে দেখা গেল তাতে কতকগুলি প্রস্তর মাত্র ভর্তি করা আছে। মীর্জা এতে খুবই হতাশ হলেন।

(৬) এ ঘটনা আবুল ফজল বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

যাহোক, মীর্জা আসকরী অবশেষে বালক শাহজাদাকে কান্দাহারে নিয়ে গেলেন।[৭] এ অধম লেখক জওহর আফতাবচীকেও শাহজাদার সঙ্গে কান্দাহার যেতে হলো। কিন্তু কিছু দিন পরই কান্দাহার থেকে পলায়ন করে হেরাতে এসে আমি পুনরায় সম্রাটের সহিত মিলিত হওয়ার সুযোগ পেলাম। সম্রাট তখন নিজ মুখে তাঁর বিগত কয়েক মাসের কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন,—যে সময়ে তিনি শিবির ত্যাগ করেন, তখন চল্লিশ জন হিন্দুস্তানী অশ্বারোহী সৈনিক ও দু'জন মহিলা তাঁর সঙ্গে ছিল। মহিলা দু'জন ছিলেন মরিয়ম মাকানী বেগম ও বালুচী বংশের একজন স্ত্রীলোক।

সম্রাট বর্ণনা করেন—"উপর্যুপরি কয়েক রাত পর্যন্ত পথ চলতে চলতে এক স্থানে গিয়ে আমরা কুকুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং স্বভাবতঃই মনে করলাম যে, নিকটে কোথাও নিশ্চয় লোকালয় রয়েছে। ইতিমধ্যে একদল বালুচ এগিয়ে এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমি তখন নিজে তাদের জিজ্ঞেস করলাম—তারা কারা? নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের এও জানালাম যে, আমি হুমায়ুন বাদশাহ। লোকগুলি এক দুর্বোধ্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করল। তাদের কথা বুঝতে না পারায় বালুচী মহিলার সহায়তায় জানতে পারলাম যে, তারা মালিক খাত্তির[৮] লোক। তারা জানাল যে, তাদের সরদার না আসা পর্যন্ত আমাকে দুর্গে অথবা গ্রামে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তাদের কথামত আমি গ্রামে গমন করলাম। লোকেরা সালাম করে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল এবং আমাদের উপবেশনের জন্যে একখানা গালিচা বিছিয়ে দিল। উক্ত গালিচার উপরে আমি ও বেগম উপবেশন করলাম। একটু দূরে গালিচার উপরেই খাজা আবিরও আসন গ্রহণ করলেন।"

পরবর্তী ঘটনাবলীর যে বিবরণ সম্রাট প্রদান করেন, তাতে জানা যায় যে, পরদিন প্রাতে মালিক খাত্তি এসে পৌঁছায়। তাকে দেখেই সম্রাট মনে মনে বলেন যে, লোকটি যদি বন্ধু হয়, তা হলে ডানদিক দিয়ে আসবে, আর শত্রু হলে বাম দিক দিয়ে অগ্রসর হবে। সৌভাগ্য বশতঃ লোকটি সম্রাটের ডানদিক দিয়েই এল এবং এসে সম্মান সহকারে সালাম জানাল। সম্রাট তার কুশল জিজ্ঞেস করলে পর লোকটি নিবেদন করল যে, তিন দিন আগে মীর্জা কামরানের এক

৭। সম্রাট হুমায়ুন কিরূপ অবস্থায় শিশু শাহজাদাকে পশ্চাতে রেখে যান, জওহর পরিষ্কারভাবে তা' বর্ণনা করেন নি। কোন কোন ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, হুমায়ুন এত তাড়াতাড়ি শিবির পরিত্যাগ করেন যে, শিশু আকবরকে সঙ্গে নিবার সুযোগ তাঁর হয় নি। (তারিখে-হুমায়ুন ও আকবর, ৮০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৮। 'আকবর-নামায়' এ বালুচী সরদারের নাম 'মালিক হাতি বালুচ' লেখা হয়েছে।

ফরমান সে পেয়েছে। উক্ত ফরমানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি এ পথে সম্রাট আসেন, তা'হলে তাঁকে যেন বন্দী করা হয়। মালিক খাত্তি অতঃপর সম্রাটকে বল্ল—"কিন্তু আমি মীর্জা কামরানের এ নির্দেশ মতো কাজ করতে চাই না। আমার গ্রামে এসে আমায় আপনি সম্মানিত করেছেন। আমার ইচ্ছা আপনাকে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদে আমার এলাকার বাইরে রেখে আসব।" বালুচী সরদারের ইচ্ছানুযায়ী সম্রাট সদলবলে আবার যাত্রা করলেন এবং মালিক খাত্তি নিজে তাঁকে পনেরো ক্রোশ দূরে এক স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বিদায় নিল।

রাজকীয় দল অতঃপর অগ্রসর হতে হতে 'গরম-সীর' এলাকায় গিয়ে পৌঁছাল। এ অঞ্চল খোরাসান ও কান্দাহার প্রদেশদ্বয়ের মধ্যবর্তী সীমানা নির্দেশ করছে। গরম-সীর অঞ্চলের হাকিম সৈয়দ আবদুল হক[৯] সম্রাটের আগমন-বার্তা অবগত হয়েও তাঁর সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে নি। বরং তার একজন দাস সম্রাটের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করেছিল বলে এ অমানুষ উক্ত দাসের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করে নিতে পর্যন্ত দ্বিধা করে নি। রাজকীয় দলের এস্থানে অবস্থান কালেই মীর্জা আসকরীর কর্মচারী খাজা জালালুদ্দীন মাহমুদ কান্দাহার থেকে পালিয়ে সম্রাটের কাছে এসে উপস্থিত হন। তিনি সঙ্গে করে কতিপয় তাবুর পরদা, কিছু খচ্চর ও ঘোটক নিয়ে এসেছিলেন। সব-কিছুই তিনি সম্রাটের খেদমতে নজর স্বরূপ প্রদান করলেন। তাঁর এ ঔদার্যে সম্রাট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করা হলো। সম্রাটের এ অণুগ্রহের জন্যে খাজা জালালুদ্দীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

রাজকীয় দল এরপর যাত্রা করে কয়েক দিনে 'সিস্তান' নগরে গিয়ে পৌঁছাল। এ নগরের হাকিম বা শাসনকর্তা ছিলেন পারস্যের অধিপতি মহামান্য শাহ তামাস্পের অন্যতম আমীর মুহাম্মদ সুলতান।[১০] ইনি সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হয়ে 'লায়লাতুল-কদর' নামক একটি উচ্চ-শ্রেণীর অশ্ব উপহার দিলেন। নিজের আবাসে নিয়ে গিয়ে তিনি যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত সম্রাটের মেহমানদারী করলেন। তিনি সম্রাটকে জানালেন যে, সেখান থেকে কান্দাহার খুব বেশী দূরে নয়। তিনি এ-কথাও বল্লেন যে, রাজকীয় কর্মচারীদের মধ্যে যারা পরাজিত

৯। আকবর-নামায় এ ব্যক্তির নাম 'সৈয়দ আবদুল হাই' বলে উল্লিখিত হয়েছে। (প্রথম খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১০। কোন কোন ইতিহাসে এঁর নাম 'আহমদ সুলতান শামলু' লেখা হয়েছে। (আকবর-নামা ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃঃ ও 'তাজ্‌কেরা-বায়েজিদ্', ৭ম পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ওয়ের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তারা এসে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সম্রাট সিস্তানেই অবস্থান করুন। তাঁর এ পরামর্শে সম্রাট আরো কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর হাজী মুহাম্মদ খান কোকা, হাসান বেগ কোকা ও মীর্জা কামরান এসে সম্রাটের সহিত মিলিত হলেন।

বৈরাম বেগ ও অন্যান্য ওমরাহ তখন সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন যে, বিনা-অনুমতিতে পারস্য দেশের এলাকায় প্রবেশ করায় মহামান্য শাহ হয়তো কিছু মনে করতে পারেন। সুতরাং অধিক দূর অগ্রসর না হয়ে শাহকে এ-কথা জানানো প্রয়োজন যে, সম্রাট তাঁর দেশে এসেছেন এবং পরবর্তী আদেশের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। এ পরামর্শ মতো শাহ তামাস্পের নিকট এক পত্র প্রেরণ করা হলো।[১১]

এ পত্র পেয়ে মহামান্য শাহ তামাস্প সাফাভী স্বীয় কর্মচারিবর্গ ও অমাত্যদের উদ্দেশ্যে এক ফরমান জারী করে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সম্রাট হুমায়ুন যেখানেই উপনীত হন, সেখানেই তাঁর প্রতি স্বয়ং শাহের চেয়েও অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের কাছেও এক পত্র প্রেরণ করে শাহ জানালেন যে, সম্রাট সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তাঁর সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করা হবে। রাজসভায় গমনের জন্যেও মহামান্য শাহ বাদশাহ হুমায়ুনকে নিমন্ত্রণ করলেন।

সম্রাট অতঃপর সিস্তান থেকে যাত্রা করলেন।

১১। সম্রাট হুমায়ুনের লিখিত এ পত্র বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সর্ব-প্রথমে 'তারিখে আহমদচী নিজামশাহ' নামক কিতাবে এ ঐতিহাসিক পত্রটি প্রকাশ করা হয়। এ গ্রন্থের লেখক 'বোরহান' নিজাম শাহের পক্ষ থেকে পারস্যের রাজ-দরবারে দূত স্বরূপ অবস্থান করছিলেন। বৃটিশ মিওজিয়ামের গ্রন্থাগারে এ প্রাচীন গ্রন্থের এক কপি রক্ষিত রয়েছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সম্রাটের পারস্য দেশে গমন

রাজকীয় কাফেলা খোরাসানের দিকে অগ্রসর হয়ে উক্ত প্রদেশের রাজধানী হেরাত নগরে গিয়ে পৌঁছাল। শাহ তামাস্পের পুত্রও সে-সময়ে উক্ত শহরে উপস্থিত ছিলেন। তরুণ শাহজাদার অভিভাবক মুহাম্মদ খান সেখানকার শাসন-কর্তা ছিলেন। তিনি শহরে ঘোষণা করে দিলেন যে, সাত থেকে সত্তর বৎসর বয়সের সকল নাগরিককে সম্রাট হুমায়ুনের অভ্যর্থনায় উপস্থিত থাকতে হবে। সুতরাং শাসনকর্তা মুহাম্মদ খান ও শাহজাদাসহ শহরের বিরাট জনতা সম্রাটকে অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করলেন। 'বাগে-মুরাদ'[১] নামক উদ্যানে তাঁবু ফেলে সম্রাটের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হলো। প্রায় এক মাস কাল এ উদ্যানে অবস্থান করার পর পারস্যাধিপতির কাছ থেকে এক চিঠি পাওয়া গেল। উক্ত চিঠিতে সম্রাটকে মেশেদে গমন করার অনুরোধ করে বলা হয় যে, সেখানেই মহামান্য শাহ তাঁর সাহত মোলাকাত করবেন।

এ-সময়ে আবির খানের অন্যতম অমাত্য বুবেক বেগ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে, তিনি মক্কা-শরীফে গমন করে পবিত্র কাবা-গৃহের তওয়াফ করার অভিলাষ পোষণ করছেন এবং সম্রাটের সহযাত্রী হয়ে যেতে চান। বুবেক বেগ আরো বলেন যে, এ ব্যাপারে পারস্যাধিপতি কোনরূপ আপত্তি নিশ্চয়ই করবেন না। মেশেদ থেকে আলাদা হয়ে তিনি মক্কা-শরীফে চলে যাবেন।[২] বেগের এ প্রস্তাব সম্রাট মেনে নিলেন এবং হেরাত থেকে যাত্রা করে রাজকীয় দল পবিত্র মেশেদ নগরে গিয়ে উপনীত হলো। এ শহরের শাসনকর্তা ছিলেন শাহ কুলী সুলতান। তিনি স্বয়ং সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং সর্ব-প্রকারে তাঁর প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন করা হলো।

১। বাগে-মুরাদ—'আকবর-নামা' এবং আরো কোন কোন গ্রন্থে এ উদ্যানের নাম 'বাগে-জাহানারা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (আরস্কিন, ২য় খণ্ড, ২৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২। মনে হয় সম্রাট হুমায়ুনের পারস্যে গমনের অন্তরালে এ উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল যে, যদি শাহের সমর্থন পাওয়া না যায়, তা' হলে তিনি (হুমায়ুন) মক্কা-শরীফে গমন করবেন। স্বাভাবিক ধর্মভাবের জন্যে ও পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার ফলে মক্কায় গমনের ইচ্ছা পূর্বেও তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল বলে জানা যায়।

মেশেদ শহরে সম্রাট চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। এ-সময়ে একদিন রাতে সম্রাট মনস্থ করেন যে, হজরত ইমাম আলী মুসার মাজার শরীফে গিয়ে ইমামের সমাধি জিয়ারত করবেন। পাঁচ জন লোক সঙ্গে নিয়ে সম্রাট এতদুদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সম্রাটের সঙ্গী এ পাঁচ জন লোক ছিলেন—দোস্ত বাবা কোরবেগী, মেহতের ওয়াসেল তোশকবেগী, মীর এয়াকুব বেগ সফরচী, কোচেক বেগ এবং এ অধম লেখক জওহর আফতাবচী। সম্রাট মাজারে উপস্থিত হলে পর সমাধি-ভবনের দ্বারবান দরজার শৃঙ্খল খোলার চেষ্টা করেও তা খুলতে পারল না। দ্বারবান তখন সম্রাটকে জানাল যে, সমাধি-ভবনের দরজার শিকল খোলা যাচ্ছে না। দ্বারবানের এ-কথা শ্রবণ করে সম্রাট প্রথমে কয়েক পদ পিছিয়ে গেলেন এবং পরে দরজার সামনে গিয়ে শিকলে হাত দিয়ে বলে ওঠলেন—"হে ইমাম, তোমার মাজারে এসে কাউকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয় নি। তোমার এ দাসও তার অন্তরের কামনা তোমার দরবারে আরজ করার জন্যেই এ পবিত্র মাজারে এসেছে।" সম্রাটের এ কাতর উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই দরজার শিকল খুলে গেল। মনে হলো—আগে থেকেই যেন তা' খোলা ছিল। সম্রাট সমাধি-ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে মাজার প্রদক্ষিণ ও ফাতেহা পাঠ করলেন এবং অতঃপর এক কোণে বসে কোরআন তেলাওত করতে লাগলেন। সমাধির শিয়রে যে বাতি জ্বলছিল, তার সল্‌তের অগ্রভাগ কেটে দিবার জন্যে মাজার-রক্ষক অতঃপর সম্রাটকে অনুরোধ করল। এতে কোনরূপ বেয়াদবী হবে কি না, মাজার-রক্ষককে সম্রাট তা' জিজ্ঞেস করলেন। মাজার-রক্ষক নিবেদন করল যে, এরূপ করার রীতি রয়েছে। সম্রাট আর কোন দ্বিরুক্তি না করে কাঁচি দিয়ে সল্‌তের অগ্রভাগ কেটে দিলেন। অতঃপর আর একবার ফাতেহা পাঠ করে তিনি মাজারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং একটি ধনুক ইমামের মাজারে রেখে আসার জন্যে আদেশ করলেন।

এর পর শাহ তামাস্প সাফাভীর কাছ থেকে আর একখানা পত্র পাওয়া গেল। এ পত্রে সম্রাটকে কাজভিন গমনের জন্যে শাহ অনুরোধ করেছিলেন। সুতরাং অগৌণেই মেশেদ থেকে যাত্রা করা হলো এবং দু'দিন দু'রাত পথ চলার পর রাজকীয় কাফেলা নিশাপুরে গিয়ে পৌঁছাল। নিশাপুর থেকে যাত্রা করে ছয় দিন পর 'সবজ্‌ওয়ার' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছানো গেল। এ জায়গার হাকিম বা শাসনকর্তা আমীর শামসুদ্দীন ছিলেন সম্রাটের একান্ত প্রিয়-পাত্র মীর বারকার আত্মীয়। এ স্থানে রাজকীয় দল চল্লিশ দিন অতিবাহিত করল। পরে 'সবজ্‌ওয়ার' ত্যাগ করে তিন দিন পরে 'দাম্‌ঘান' ও সেখান থেকে দু'দিন পর কাফেলা 'বিস্তাম' নগরে গিয়ে উপস্থিত হলো। ওখান থেকে 'সামনান্‌' এবং পরে

'আগা-কেল্লাহ্', 'ইসহাকের ঝর্ণা' প্রভৃতি স্থান হয়ে 'মাসিমাহ্' নামক জায়গায় গিয়ে পৌঁছানো গেল। এখানে এক আখরুট গাছের ছায়ায় শিবির স্থাপন করা হলো।

তাঁবুর সম্মুখে উপবেশন করে সম্রাট নিকটবর্তী জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এমন সময় দেখা গেল একজন সংবাদবাহী দূত যেন এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি তাঁবুর নিকটে এসে সম্রাটকে অভিবাদন করল। সম্রাট লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন—সে কোত্থেকে আসছে এবং কোন খবর নিয়ে আসছে কি? লোকটি নিবেদন করল যে, সে 'কেল্লা-জাফর' থেকে মীর্জা সোলায়মানের এক চিঠি নিয়ে এসেছে। দূতের হাত থেকে চিঠিখানা গ্রহণ করে সম্রাট তা' পাঠ করলেন এবং অতঃপর মন্তব্য করলেন—"অকৃতজ্ঞ ভাইদের ব্যবহার দেখ! বাদশাহ বাবুরের সহিত এরা অসদ্ব্যবহার করেছে, আর আজ আমার সঙ্গেও অবাধ্য আচরণ করে যাচ্ছে। আলী কুলী আন্দারাবী[৩] মীর্জা সোলায়মানের দুধ-ভাই (দুগ্ধদায়িনী ধাত্রীর পুত্র), অথচ তিনিই মীর্জা কামরানের কথায় মীর্জা সোলায়মানকে পরিবারবর্গসহ বন্দী করে কাবুলে নিয়ে গিয়েছেন!" এরূপ মন্তব্য করার পর সম্রাট চিঠির উত্তরে মীর্জা সোলায়মানকে লিখলেন—"আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো এবং নিরাশ হয়ো না। খোদার অনুগ্রহে শীঘ্রই আমাদের বিপদ কেটে যাবে।" দূতের হাতে পত্রখানা প্রদান করে তাকে বিদায় দিতে গিয়ে সম্রাট মুখে মুখে বললেন—"মীর্জা সোলায়মানকে আমার সালাম দিয়ে তুমি তাঁকে বলো যে, আমার জন্যেই তাঁকে আজ এ-সব কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব-জগতের প্রভু আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের কামনা নিশ্চয় পূর্ণ হবে।"

নামাজের পর রাজকীয় কাফেলা আবার যাত্রা করল। সম্রাটের জন্যে শরবত প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে একটি বোতলে লেবুর আরক রক্ষিত ছিল এবং বোতলটি মেহতের দওলা রেকাবদারের হেফাজতে থাকত। যাত্রার সময় রেকাবদার যখন অশ্বে আরোহণ করতে উদ্যত হয়, তখন সম্রাটের পানীয় জলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে এ অধম লেখক (জওহর আফতাবচী) এগিয়ে গিয়ে তাকে পরামর্শ দেই যে, লেবুর আরকের বোতলটি আমার হাতে দিয়ে সে অশ্বে আরোহণ করুক এবং পরে আমি তার হাতে বোতলটি তুলে দেব। রেকাবদার আমার এ প্রস্তাবে রাজী না হয়ে অশ্বে আরোহণ করার পর নিজেই বোতলটি ভূমি থেকে উত্তোলনের প্রয়াস পেল এবং এ-সময়ে তার হাত থেকে ফসকে গিয়ে তা' ভেঙ্গে গেল। মগরেবের নামাজের সময় এক স্থানে কাফেলা থেমে গেল এবং নামাজ পড়ার জন্যে সম্রাট অশ্ব থেকে নেমে এলেন। এ-সময়ে

৩। কোন কোন গ্রন্থে এ ব্যক্তির নাম "আল্লাহ কুলী" বলে উল্লিখিত হয়েছে।

তিনি শরবত পান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে লেবুর আরকের বোতলটি ভেঙ্গে যাওয়ার কাহিনী বলা হলো। সব কথা শুনে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং গাফিলতির সাজা স্বরূপ আমি জওহর ও দওলা রেকাবদার দু'জনকেই পদব্রজে কাফেলার সাথে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। দু'ক্রোশ পথ এভাবে অগ্রসর হওয়ার পর সম্রাট অনুগ্রহ করে আমাকে পুনরায় অশ্বারোহণের অনুমতি দিয়ে মন্তব্য করলেন—"জওহর বেচারা তো নির্দোষ; সে ঘোড়ায় চড়েই চলবে। প্রকৃত অপরাধী তো দওলা; তাকে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।"

আরো অগ্রসর হয়ে রাজকীয় দল প্রথমে 'সাদুক-বালাক'[৪] এবং অতঃপর 'দরস' দুর্গে গিয়ে পৌঁছাল। এখানে শাহ তামাস্পের এক পত্র পাওয়া গেল। পত্রে শাহ অনুরোধ করেন যে, সম্রাটের পক্ষ থেকে কথা বলার জন্যে বৈরাম বেগকে রাজ-দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। শাহ তামাস্প সে-সময়ে 'কাজভিন' নগরে অবস্থান করছিলেন। সম্রাট দু'জন অশ্বারোহীসহ বৈরাম বেগকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। বৈরাম বেগ শাহ তামাস্পের দরবারে উপস্থিত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করলে পর শাহ তাঁকে মস্তকের কেশ কর্তন করে 'তাজ' পরিধান করতে নির্দেশ দিলেন। বৈরাম বেগ শাহের এ নির্দেশের প্রত্যুত্তরে নিবেদন করলেন যে, তিনি অপর এক জনের অধীনে নিয়োজিত রয়েছেন এবং সে প্রভুর আদেশ মতোই তিনি কাজ করবেন। এ প্রত্যুত্তর শাহের পছন্দ হলো না। তিনি বৈরামকে বল্লেন—"এখন তুমি আমারি অধীনে রয়েছ।" এ কথার পর নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি কতিপয় কয়েদীকে আনিয়ে সেখানেই সকলের সম্মুখে হত্যা করালেন।

শাহ তামাস্প অতঃপর 'কাজভিন' ত্যাগ করে 'চশমায়ে জকী-জকী' নামক স্থানে গমন করলেন এবং সেখান থেকে বাদশাহ হুমায়ুনের নিকটে এক পত্র লিখে জানালেন যে, যে-পর্যন্ত শাহের দরবারে গমন করার আহ্বান-পত্র না পান, সে-পর্যন্ত তিনি যেখানে আছেন সেখানেই যেন অবস্থান করতে থাকেন এবং বুবেক বেগকে যেন শাহের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ পত্রের মর্মানুযায়ী সম্রাট বুবেক বেগ উজবেককে শাহ তামাস্পের দরবারে প্রেরণ করলেন।

অতঃপর শাহ আবার জানালেন যে, সম্রাট হুমায়ুন যেন 'কাজভিন' নগরে তিন দিন অবস্থান করার পর শাহের সহিত মোলাকাত করেন। পারস্যাধিপতির এ নির্দেশ মোতাবেক হুমায়ুন 'দরস' থেকে যাত্রা করে যথা সময়ে 'কাজভিন'

৪। অনেকে মনে করেন এ স্থানটি 'সুজ্-বালাক' হবে; 'সুজ্-বালাক্' শব্দের অর্থ হলো 'ঠাণ্ডা ঝর্ণা'। (আকবর-নামার ইংরাজী অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

নগরে গিয়ে উপনীত হলেন। এ শহরের শাসনকর্তা এগিয়ে এসে সম্রাটকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শাসনকর্তার মেহমান রূপে সম্রাটকে প্রথম দিন যাপন করতে হয়। দ্বিতীয় দিন শহরের কাজী তাঁকে দাওয়াত করেন এবং তৃতীয় দিন নাগরিকগণ তাঁকে এক ভোজ-অনুষ্ঠানে অভ্যর্থিত করেন।

পরদিন জোহরের নামাজের সময় রাজকীয় দল পুনরায় অগ্রসর হলো এবং সমগ্র রজনী অবিরত পথ চলতে লাগল। রাত যখন প্রায় শেষ হয় হয়, সম্রাট তখন আদেশ দিলেন যে, শিবির সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে পানি রয়েছে এমন কোন স্থানের সন্ধান করা হোক যেন আরামের সঙ্গে সেখানে অবস্থান করা যায়। খোঁজ করে একটি জলাশয়ের তীরে গিয়ে শিবির স্থাপন করা হলো। এখানে রাজকীয় দলের অবস্থানের সময়েই সংবাদ পাওয়া গেল যে, বৈরাম বেগ ফিরে আসছেন।

শীঘ্রই বৈরাম বেগ এসে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি জানালেন যে, সম্রাট উদ্দিষ্ট স্থানের খুবই নিকটে এসে গেছেন এবং এখন ফিরে যাওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত হবে না। প্রভাত হয়ে গেলে ফজরের নামাজের পর সম্রাট পুনরায় নিদ্রিত হলেন। ইতিমধ্যে রাস্তা মেরামতকারী শ্রমিকদের গান শোনা গেল। তারা নিকটবর্তী জায়গায় স্থানে স্থানে রাস্তা মেরামত করছিল এবং নিজেদের পরিশ্রম লাঘব করার উদ্দেশ্যে গান গেয়ে যাচ্ছিল। এদের গানের আওয়াজে সম্রাটের ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিদ্রোত্থিত হয়েই সম্রাট আদেশ দিলেন—"লোকগুলিকে গান বন্ধ করতে বলো। সারা রাত পথ চলে ক্লান্ত হয়ে সবে মাত্র ঘুমিয়েছি। এ-সময়ে এদের শোরগোল মোটেই সহ্য হচ্ছে না।" সম্রাটের এ-কথায় আমি অধম (জওহর) নিবেদন করলাম যে, এরা শাহ তামাস্পের লোক; আমাদের শিবির সন্নিহিত রাস্তাঘাট মেরামত করতে এসেছে। আমার কথা শুনে সম্রাট বৈরাম বেগকে পাঠিয়ে দিবার আদেশ দিলেন। বৈরাম বেগ এসে খবর দিলেন যে, শাহ তামাস্পের লোকজন সম্রাটকে অভ্যর্থিত করার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এ-সময়ে সম্রাটের দরবার-কক্ষে অবস্থান করা উচিত।

সম্রাট শয্যাত্যাগ করে গোসল করলেন এবং অতঃপর পোশাক পরিধান করে 'দিওয়ান-খানায়' (দরবার-কক্ষ) গিয়ে উপবেশন করলেন। অতঃপর উভয় বাদশার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হলেন এবং পরে খান ও মীর্জাদের প্রতিনিধিরাও আগমন করলেন। সর্বশেষে শাহের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রধান অভ্যর্থনাকারী কর্মচারী উপস্থিত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। অতঃপর সম্রাটকে অশ্বে

আরোহণ করিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে যাত্রা করা হলো। শোভাযাত্রা গন্তব্য-স্থলে উপনীত হলে শাহের পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অমাত্যগণ বিশেষ সম্মান সহকারে সম্রাটকে স্বাগতঃ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। রাজ-পরিবারের শাহজাদা সাম্ মীর্জা বহু দূরে স্বীয় ঘোটক থেকে অবতরণ করে পদব্রজে এগিয়ে এলেন। সম্রাটও ঘোটক থেকে অবতরণ করেই সাম্ মীর্জাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং উভয়েই পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন। সাম্ মীর্জা এর পর ফিরে গেলেন এবং একটি তীর নিক্ষেপ করলে যত দূর যেতে পারে প্রায় ততটা দূরে গিয়ে স্বীয় অশ্বে পুনরায় আরোহণ করলেন। সাম্ মীর্জা প্রস্থান করলে পর একটি রাজকীয় খেলাত ও সুসজ্জিত একটি অশ্ব নিয়ে শাহজাদা বাহরাম মীর্জা[৫] অগমন করলেন। অতঃপর নকীব ও চোবদারগণ দল বেঁধে অগ্রসর হলো এবং সম্রাট স্বীয় অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। শাহ তামাস্প প্রেরিত একটি গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হলো এবং সম্রাট উক্ত গালিচার উপরে দণ্ডায়মান হলেন। বাহরাম মীর্জা তখন সামনে এগিয়ে এসে সম্রাটকে শাহ তামাস্প প্রেরিত রাজকীয় খেলাত ('তাজ' ব্যতীত) পরিয়ে দিলেন। অতঃপর শাহ কর্তৃক প্রেরিত নূতন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সম্রাট সদলবলে মহামান্য শাহের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

সম্রাটের দু'পাশে অশ্বারোহী প্রহরীরা স্থান গ্রহণ করল। তাঁর যাত্রা-পথে কারমানী অশ্বে আরোহণ করে ছোট-বড় বহু লোক অগ্রসর হয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে সম্মান-প্রদর্শন করল এবং তারাও সহযাত্রী হয়ে এগিয়ে চল্ল। এভাবে অগ্রসর হয়ে সম্রাট যখন পারস্যাধিপতির মহফিলে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন গালিচার প্রান্তদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে শাহ তামাস্প হুমায়ুনকে খোশ-আমদেদ জানালেন। উভয়েই পরস্পরের সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করলেন। শাহ সম্রাটকে দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিয়ে নিজেও তাঁর সান্নিধ্যে স্থান গ্রহণ করলেন। তিনি সম্রাটের কুশল-বার্তা জিজ্ঞেস করলেন এবং পথে তাঁর কোনরূপ অসুবিধা হয়েছে কিনা, তাও জানতে চাইলেন। শাহ অতঃপর হুমায়ুনকে তাঁর প্রদত্ত শিরস্ত্রাণ 'তাজ'[৬] পরিধান করতে অনুরোধ করলে সম্রাট বল্লেন

৫। সাম্ মীর্জা ও বাহরাম মীর্জা পারস্যাধিপতি শাহ তামাস্পের ভ্রাতা ছিলেন। ষ্টুয়ার্ট ভ্রমক্রমে তাঁর গ্রন্থে সাম্ মীর্জাকে শাহের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। (ষ্টুয়ার্টের অনুবাদ, ৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আবুল ফজল আকবর-নামায় বাহরাম মীর্জা ও সাম্ মীর্জাকে পরিষ্কার ভাষায় শাহ তামাস্পের ভ্রাতা বলে উল্লেখ করেছেন। (১ম খণ্ড, ২১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৬। পারস্যের নিজস্ব রাজকীয় শিরস্ত্রাণ। এতে শিয়াদের বারো ইমামের নাম অঙ্কিত থাকায় হুমায়ুন প্রথমে 'তাজ' পরিধান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন বলে আরস্কিন উল্লেখ করেছেন। (২য় খণ্ড, ২৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

"এ তাজ হবে আমার জন্যে সম্মানের শিরোপা। সুতরাং এ 'তাজ' আমি অবশ্যই পরিধান করব।" শাহ তখন সহস্তে হুমায়ুনের মস্তকে 'তাজ' পরিয়ে দিলেন। সমবেত অভিজাতবর্গ ও অমাত্যগণ এ দৃশ্য দেখে সমস্বরে জয়ধ্বনি করে ওঠলেন এবং আল্লাহ আল্লাহ ধ্বনি সহকারে সকলেই এখানকার রীতি মাফিক সেজদায় ঝুঁকে পড়লেন। সম্রাট তখন নিবেদন করলেন যে, যদি অনুমতি হয়, তা' হলে অন্যান্য শাহজাদাগণও আসন গ্রহণ করতে পারেন। শাহ তামাস্প এ কথার উত্তরে জানালেন—তাঁর দেশে এ-রীতি নেই।

অতঃপর খানার আয়োজন হলো। শাহ তামাস্প সম্রাটকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁর (সম্রাটের) খেদমতগারগণই দস্তরখান বিছিয়ে দিক। এ কথা মতো ইয়াকুব সফরচী অগ্রসর হয়ে দস্তরখান বিছিয়ে দিল এবং অতঃপর উভয় বাদশাহ আহার আরম্ভ করলেন। আহার শেষ হওয়ার পর প্রথামতো আবার সকলে সেজদা করলেন। শাহ সম্রাটকে জানালেন যে, বাহরাম মীর্জা ও বদর খান এ দু'জনের গৃহেই তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতঃপর সম্রাটকে বিদায় দেওয়া হলো।

বাহরাম মীর্জা সম্রাটকে স্বীয় ভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে বেশ আরাম-আয়েশের মধ্যে রাত কেটে গেল। প্রভাতে শাহ মহোদয় সুলতানিয়ার ভবনে গেলেন এবং সেখানে যাবার সময় সম্রাটকে সঙ্গে নিলেন। এবার শাহের আচরণে ততটা আন্তরিকতার পরিচয় না পেয়ে সম্রাট কতকটা ভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হতে থাকে—শাহ যেন ভিন্নরূপ মতলব নিয়েই কাজ করছেন। সুলতান মুহাম্মদ খোদা-বান্দার[৭] বাড়ীতে এক্ষণে সম্রাটের থাকার ব্যবস্থা হলো। শিয়া ইমামিয়া মজহাবের প্রসার এ ব্যক্তির কল্যাণেই সম্ভবপর হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে স্বভাবতঃই সম্রাটের লোকজন বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে প্রধান কাজী (কাজী জাহান) সম্রাটের নিকটে এসে উপস্থিত হন। তিনি সম্রাটকে বলেন—"আপনার লোকজন ও কর্মচারিবর্গ সঠিক পন্থা অনুসরণ করছে না। তারা খারিজীদের মতো মতামত প্রকাশ করে থাকে। মহামান্য শাহ এ জন্যে আপনার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" এ কথার প্রত্যুত্তরে সম্রাট কাজীকে জানান যে, তিনি সর্বদাই নিষ্পাপ ইমামদের সমর্থন ও অনুসরণ করে এসেছেন। কাজী তখন শাহ তামাস্পের লেখা তিনখানা বিবৃতি বের করে তন্মধ্যে দু'খানা সম্রাটকে প্রদান করে প্রস্থান করলেন। বিবৃতি দু'খানা পাঠ

৭। খোদা-বান্দা—এর প্রকৃত নাম ছিল 'আলজায়িতু'। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে 'সুলতান মুহাম্মদ খোদা-বান্দা' নাম দেওয়া হয়।

করে বিক্ষুব্ধভাবে সম্রাট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁবুর বাইরে দরজায় এসে উচ্চৈঃস্বরে হজরত রসূলুল্লাহ, তাঁর উত্তরাধিকারিগণ ও ইমামদের দুশমনদের উপর ধিক্কার বর্ষণ করতে লাগলেন। এ-সময়ে শাহ নিজে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর তৃতীয় বিবৃতিটি সম্রাটকে প্রদান করলেন। শাহ তামাস্পের উপস্থিতিতেই হুমায়ুন এ বিবৃতি পাঠ করলেন এবং সত্য মজহাব 'ইমামিয়া আসনা আশরিয়া' গ্রহণ করলেন।[৮]

মহামান্য সম্রাট এর পর আলী আস্‌সাবাহকে সেখানে রেখে শিকার করতে চলে গেলেন। শাহ তামাস্প কাজী জাহানকে সম্রাটের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে তাঁর সঙ্গে দিলেন। তিন দিন পর্যন্ত শিকার চল্ল। একদল সৈনিক বিপরীত দিক থেকে শিকারের পশু তাড়িয়ে নিয়ে এলো এবং বহু জন্তু-জানোয়ার শিকার করা হলো। চতুষ্পার্শ্বে যেসব প্রহরী ছিল, তাদের মাঝখান দিয়ে পথ করে অনেক হরিণ পালিয়ে গেল। যেসব প্রহরীর গাফিলতির জন্যে হরিণগুলি এভাবে পালাতে পারল, তাদের প্রত্যেককে জরিমানা করে সাজা দেওয়ার আদেশ হলো।

পরদিন সম্রাট ও বাহরাম মীর্জা শিকারের উদ্দেশ্যে 'তখতে-সোলায়মানী' অঞ্চলে গমনের সঙ্কল্প করে যাত্রা করলেন। রাতারাতি পথ অতিক্রম করে উভয়ে শিকারের স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। এ-সময়ে বাহরাম মীর্জা সম্রাটকে জানালেন যে, তিন দিন পর শাহ তামাস্প মহোদয় শিকার করতে আসবেন এবং সে উদ্দেশ্যে শিকারের পশুগুলিকে বেড় দিয়ে রাখা দরকার। মীর্জার এ প্রস্তাব মতোই ব্যবস্থা করা হলো। কতিপয় হরিণ ও জংলী শূকর এ বেষ্টনীর মধ্যে আটকা পড়ল। অকস্মাৎ একটি বন্যপশু বাহরাম মীর্জার পাশ দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেল এবং মীর্জা এর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। সম্রাটও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চললেন। সারা রাত অগ্রসর হয়ে পর দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত শিকার করা হলো। জোহরের নামাজের সময় শিকারে ক্ষান্ত দিয়ে সম্রাট ওজু করার জন্যে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। এ সময়ে সম্রাটের কাছে এক মাত্র

৮। হুমায়ুনের শিয়া 'ইমামিয়া আসনা আশরিয়া' মজহাব গ্রহণের কথা অপর কোন কিতাবে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয় নি'। আবুল ফজল 'আকবর-নামায়' শুধু ইঙ্গিত করেছেন যে, কিছু দিনের জন্যে হুমায়ুনের সহিত শাহ তামাস্পের সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ ছিল না। জওহর পারস্যের এ সফরে সর্বদা হুমায়ুনের সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁর প্রদত্ত বিবরণী সমধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে হয়। সম্ভবতঃ শাহ তামাস্পকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই হুমায়ুন অন্তরে না হলেও, অন্ততঃ বাহ্যতঃ শিয়া-মতবাদের প্রতি কতকটা অনুরক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। স্যার রিচার্ড বার্নও (Cambridge History of India, Vol. IV, page 40) জওহরের বিবরণীর সমর্থন করেছেন।

ইয়াকুব সফরচী ব্যতীত অপর কোন লোক ছিল না। ইয়াকুব সম্রাটের অশ্বের বল্গা ধারণ করে দণ্ডায়মান ছিল এবং সম্রাটকে সাহায্য করার মতো অপর কোন লোক নিকটে না থাকায় সে উচ্চৈস্বরে 'আফ্‌তাবচী' বলে ডাকতে লাগল। ইয়াকুবের আহ্বান শুনে আমি (জওহর) দৌড়ে সম্রাটের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। সম্রাট তখন নামাজ শেষ করে স্বীয় অশ্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু অশ্বের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল বলে সম্রাটও কিছুক্ষণের জন্যে সেখানেই বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। তিনি এ অধম জওহরকে আদেশ করলেন, তাঁর শরীর টিপে দিবার জন্যে। আদেশ মতো কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমি সম্রাটের শরীর টিপে দিলাম। সম্রাট অতঃপর অশ্বে আরোহণ করে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান মণিরত্নে পূর্ণ একটি থলে সর্বদা সম্রাটের পকেটে থাকত। তাঁর অভ্যাস ছিল—ওজু করার সময় থলেটি পকেট থেকে বের করে নিকটে রাখতেন এবং পরে আবার তা' পকেটে ভরে নিতেন। এ দিন কিন্তু থলেটি পুনরায় পকেটে রাখতে সম্রাট ভুলে যান এবং তা'ফেলে রেখেই শিবিরে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে অশ্বে আরোহণ করেন। আমি (জওহর) সম্রাটের অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে অশ্বে আরোহণ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম—সবুজ রঙের একটি থলে এবং একটি দোয়াত ও কলম পড়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ জিনিসগুলি আমি তুলে নিলাম এবং সম্রাটের নিকটে গিয়ে তাঁর হস্তে সেগুলি প্রত্যর্পণ করলাম। এ ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন—"হে গোলাম, তুমি আমায় পারস্যাধিপতির কাছে লজ্জা পাওয়া থেকে রক্ষা করেছ। এসব হীরা ও মণি-রত্ন তাঁকে উপহার দেওয়ার জন্যেই আমি রেখেছি।"

আগে এসব মূল্যবান জিনিস রওশন বেগের কাছেই রাখা হতো। কিন্তু একবার তিনি আমানতী দ্রব্যগুলি থেকে কিছু আত্মসাৎ করেন। এ-জন্যেই সম্রাট অপর কাউকে বিশ্বাস না করে সর্বদা মণিরত্নগুলি নিজের কাছে রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। যেতে যেতে সম্রাট বল্লেন—"হজরত সোলায়মানের সিংহাসন (তখতে-সোলায়মান) এলাকা ঘুরেফিরে দেখার পর আমরা শিকারে যাব।" শেষে যখন আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম, তখন দেখা গেল যে, একটা বড় পাহাড় খনন করে প্রাচীন কালের একটা বড় কারাগার বের করা হয়েছে। সেখান থেকে যাত্রা করে আমরা মগরেবের সময় গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, শাহ মহোদয়ের পেশকার আলী আসসাবাহ শিকারের জায়গায় উপস্থিত রয়েছেন। জোহরের নামাজের সময় পর্যন্ত 'তখতে-সোলায়মান' থেকে চার ক্রোশ দূরে এক স্থানে শিকার জমা করা হয়েছিল। সম্রাটও শিকার-স্থলে উপনীত

হয়ে ঘেরাও-করা বন্যপশুগুলির উপর তীর বর্ষণ আরম্ভ করলেন। একমাত্র সম্রাট ব্যতীত তাঁর ভ্রাতৃগণ বা অমাত্যদের কারো তীর ছোঁড়ার অনুমতি ছিল না। দেখা গেল—একটি হরিণ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। হরিণটি দেখতে পেয়ে শাহ তামাস্প সম্রাট হুমায়ুনের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করে মন্তব্য করলেন—"এবার দেখব, আপনি কেমন করে হরিণটিকে মারেন!" শাহের কথা শেষ হতে না হতেই সম্রাটের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে ঘায়েল হয়ে হরিণটি লুটিয়ে পড়ল। এ দৃশ্য দেখে তুর্কমান শিকারীরা এক সঙ্গে বলে উঠল—"বাদশাহ হুমায়ুন নিশ্চয় আবার রাজত্ব করবেন।"

এরপর মহামান্য সম্রাট শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর জন্যে শাহ মহোদয় শিকারলব্ধ নয়টি হরিণ পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক দিন পর সম্রাট মহামান্য শাহকে হীরা ও মণি-মাণিক্যগুলি পাঠিয়ে দিলেন। একটি খাঞ্চার মধ্যস্থলে সবচেয়ে বড় হীরকটি রেখে তার চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য হীরা ও মণি-মাণিক্য সুন্দর-ভাবে সাজিয়ে বৈরাম বেগের হাত দিয়ে শাহ তামাস্পের কাছে পাঠানো হলো। তাঁকে বলে দেওয়া হলো যে, বিশেষ করে শাহের জন্যেই যে এসব মণি-রত্ন সম্রাট নিয়ে এসেছেন, এ-কথা যেন জানিয়ে দেওয়া হয়। হীরা ও অন্যান্য মণিগুলি পাওয়ার পর শাহ মণিকারদের আহ্বান করে সেসবের সম্ভাব্য মূল্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন। মণিকারগণ অভিমত প্রকাশ করল যে, সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত হীরক ও মণি-মাণিক্যসমূহ এত দামী জিনিস যে, তার পরিবর্তে যে-কোন জিনিস দেওয়া হোক না কেন, সে-সব নেহায়েত কম দামী বলেই প্রতিপন্ন হবে। সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত এ উপহার গ্রহণ করে শাহ তামাস্প বৈরাম বেগকে 'খান' উপাধি দ্বারা গৌরবান্বিত করলেন এবং একটি নাকারাও উপহার দিলেন।

অতঃপর দু'মাস কেটে গেল। সম্রাট ও শাহের মধ্যে এ-সময়ে পারস্পরিক সাহায্য বিষয়ক বা অপর কোনরূপ আলোচনাই হয় নি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা ও পরবর্তী ঘটনাবলী

ইতিমধ্যে দু'টি কথা উত্থিত হয়। প্রথমতঃ, সম্রাটের অমাত্য রওশন বেগ কোকা ও খাজা গাজী দেওয়ান এবং মক্কা শরীফ থেকে প্রত্যাগত মীর্জা কামরানের বর্শাধারী কর্মচারী সুলতান মুহাম্মদ পারস্যাধিপতি শাহ তামাস্পের সহিত সাক্ষাৎ করে সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে কতিপয় ভিত্তিহীন অপবাদ উত্থাপন করে। তারা শাহকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, সম্রাটের ব্যবহার যদি ভালো হতো, তা' হলে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে ছেড়ে যাবেন কেন? তারা প্রস্তাব করে যে, শাহ যদি কিছু সৈন্য দিয়ে তাদের সাহায্য করেন, তা' হলে তারা কান্দাহার প্রদেশটি জয় করে তাঁর অধীনে ন্যস্ত করতে পারে। এসব লোক শাহ মহোদয়কে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কিজিলবাশ ও তুর্কমান জাতীয় লোকেরা বলে থাকে যে, হুমায়ুনের পিতা বাবুর বাদশাহ শাহ ইসমাইলের কাছ থেকে প্রতারণামূলকভাবে সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাঁরি পরামর্শে বারো হাজার সৈন্যসহ নাজিম বেগ উজীরকে হত্যা করা হয়েছিল।[১] নিন্দুকের দল শেষে এ অভিমত প্রকাশ করে যে, যদি হুমায়ুনের সাহায্যার্থ তাদের প্রেরণ করা হয়, তা' হলে পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনিও হয়তো সুযোগ মতো সৈন্য-সামন্ত সহ তাদেরও হত্যা করাবেন। মীর্জা কামরানও গোপনীয়ভাবে শাহ তামাস্পের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে নানারূপ বদনাম ছড়ানোর প্রয়াস পান।

দ্বিতীয় প্রচারণার সূত্রটি ছিল অন্য ধরনের। সম্রাটের বিরুদ্ধবাদীরা শাহ তামাস্পের কানে এ কথাও তুলে দেয় যে, গুজরাট-অভিযানের পর আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করে হুমায়ুন একদিন প্রকাশ্য দরবারে বহু লোকের সামনে ঘোষণা করেছিলেন যে, শান-শওকত ও যশঃ-গৌরবে তাঁর স্থান পারস্যের শাহ তামাস্প সাফাভী থেকে

১। সম্রাট বাবুর ও শাহ ইসমাইলের মধ্যবর্তী সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক ইতিহাসেই আলোচনা করা হয়েছে এবং ইতিহাসের এ আলোচনার আলোকে পরিষ্কারই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, কোন কোন ইরানী ঐতিহাসিক সম্রাট বাবুরের বিরুদ্ধে যে অপবাদ রটনা করেছেন, তা' একান্তই ভিত্তিহীন। নাজিম বেগ সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা এই যে, তিনি 'গাজ্‌দোয়ান্‌ দুর্গ' অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং এ অবরোধ চলার সময়েই নিহত হন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অনেক উচেচ। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে শাহকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যেই অবশ্য এসব কথা প্রচার করা হয়। বিরুদ্ধবাদীরা এ-কথাও বলাবলি করতে থাকে যে, সম্রাট হুমায়ুন যদি সত্যি সত্যি ভালো লোক হতেন, তা' হলে তাঁর ভাইয়েরা, অমাত্যগণ ও সৈনিকরা তাঁকে পরিত্যাগ করতেন না ; তিনিও নিশ্চয় সকলকে সন্তুষ্ট রাখতে পারতেন এবং শেরশাহের নিকট তাঁকে পরাজিত হতে হতো না।

এ-ধরনের বিরুদ্ধ প্রচারনায় সম্রাট হুমায়ুনের প্রতি শাহ তামাস্পের মনোভাব বহুলাংশে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছু করবার ক্ষমতা নেই। নবী-পয়গম্বরগণকেও অনেক সময় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। এমন কি, মহানবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত কাফেরদের সহিত ওহোদের যুদ্ধে ইসলামের বহু-সংখ্যক মোজাহেদকে হারাতে হয়েছিল। হজরত আমীর হামজার কলজে বের করে নিয়ে তাজা অবস্থায় এক বৃদ্ধা তা' চর্বণ করে এবং তাঁর পবিত্র দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়। শুধু তাই নয়, হজরত রসূলে-করীমের পবিত্র দন্তও এ যুদ্ধে শহীদ হয়। প্রকৃত বীরদেরই জীবনে দু'চার বার এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুতরাং সত্যিকার বুদ্ধিমান যারা, সর্বক্ষণই তাদের আল্লাহর সাহায্য যাচনা করা উচিত। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছাই সব কিছুর উপর কার্যকরী হয়ে থাকে।

সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যেসব কথা শোনা গিয়েছে, শাহ তামাস্প একদিন তৎসম্পর্কে বাহরাম মীর্জার সহিত আলাপ করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, হুমায়ুনকে সাহায্য করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না বলেই অমাত্যগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। সম্রাটের সহিত বাহরাম মীর্জার গভীরতর প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং শাহ মহোদয়ের কথা শুনে তিনি মর্মাহত হলেন। ব্যথাহত অন্তর নিয়ে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং স্বীয় ভগ্নীর নিকটে সমুদয় অবস্থা বর্ণনা করলেন। অবশেষে ভগ্নীকে তিনি বল্লেন,—"সম্রাট হুমায়ুন হচ্ছেন তৈমুরের বংশধর। তিনি আজ সাহায্যের জন্যে আমাদের পরিবারের শরণাপন্ন হয়েছেন। আমাদের পরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন একান্ত কর্তব্য। সম্রাট বাবুরের মৃত্যুর সময় যেসব কিজিলবাশ্ আমীরের পিতা ও ভ্রাতাদের প্রতারণামূলকভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তারা আজ ইরাণের শাহ মহোদয়ের কাছে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে নানারূপ অপবাদ রটনা করছে। সুতরাং আমার অনুরোধ—যখন শাহ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন, তখন আপনি তাঁর কাছে সম্রাট হুমায়ুনের জন্যে একটু সোপারিশ করবেন।"

শাহ তামাস্প্ পরে যখন স্বীয় ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করতে আসেন, তখন এ মহিয়সী মহিলাকে একান্ত ব্যথিত চিত্তে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনি ভগ্নীর দুঃখের কারণ জানতে চাইলে মহিলা রোদন করতে লাগলেন। এ অবস্থা দৃষ্টে শাহ স্বভাবতঃই চঞ্চল হয়ে ওঠলেন এবং জানতে চাইলেন —কি জন্যে তিনি রোদন করছেন, তাঁর দুঃখের কারণ কি? শাহের ভগ্নী উত্তর দিলেন—"সময়ের অবস্থা দৃষ্টেই আমি রোদন না করে পারছি না।" শাহ তখন ভগ্নীকে জিজ্ঞেস করলেন–"তুমি কি আমার কল্যাণ কামনা কর না?" ভগ্নী উত্তর দিলেন—"মহামান্য শাহের জন্যে রাত-দিন আল্লাহর দরগায় দোয়া করছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার কাছে আমার কিছু নিবেদন রয়েছে। স্বার্থপর কুচক্রী লোকদের কথায় না ভুলে সম্রাট হুমায়ুনকে একদল সৈন্য দিয়ে হিন্দুস্তানের পথে তাঁর পুনরভিযানের সুযোগ করে দেওয়াই আপনার উচিত হবে বলে আমি মনে করছি। তা' হলে ইরানের শাহের গৌরব-দ্যোতিতে সমগ্র বিশ্ব-জগত উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে।" শাহ মহোদয়ের সহোদরা অতঃপর হজরত আলী ও তাঁর বংশধরদের প্রশস্তি-বাণী সম্বলিত সম্রাট হুমায়ুনের রচিত একটি রুবাই কবিতা আবৃত্তি করে ভ্রাতাকে শুনালেন।

হুমায়ুনের এ কবিতা শাহ তামাস্পের মনকে একেবারেই বদলিয়ে দিল। ভগ্নীর কথাগুলির যুক্তিবত্তা স্বীকার করে নিয়ে তিনি জানালেন যে, ইরানের আমীরগণ তাঁকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা' মোটেই ঠিক নয়। শাহ তামাস্প অতঃপর সম্রাট হুমায়ুনের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করে তাঁকে শাহী দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্যে দাওয়াত করলেন।

সম্রাট জোহরের নামাজের পর শাহের দরবারে হাজীর হলেন এবং রাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। দু' নরপতির মধ্যে এ সময়ে অনেক কথাই হলো। শাহ তামাস্প সম্রাটকে আশ্বাস দিলেন যে, ইরান দেশে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য ইনশাল্লাহ সফল হবে। শাহ অতঃপর সম্রাটকে জানালেন যে, কাজী জাহানের কাছ থেকে তিনি আরো কতকগুলি কথা জানতে পারবেন এবং সে-সব কথা মেনে নিতে তাঁর কোন আপত্তি হবে না বলেই তিনি মনে করেন। হুমায়ুন এর পর শাহের শুভ কামনা করে বিদায় নিলেন।

এর পরের কথা। একদিন রাত্রে সম্রাট এমন এক জায়গায় গিয়ে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন, যেখানে এক মাত্র মেহতের কুচেক ব্যতীত সম্রাটের অপর কোন ভৃত্যই উপস্থিত ছিল না। বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত সম্রাটের সাক্ষাৎ না পেয়ে শাহ তামাস্প কতকাংশে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তুর্কমান জাতীয়

লোকেরা কোন প্রকার অপকর্মের অনুষ্ঠান করতে পারে, শাহ এরূপ আশঙ্কা পোষণ করতেন। সুতরাং সেদিন রাত্রে সম্রাটের সন্ধান করার উদ্দেশ্যে একজন মশালধারী সৈনিককে শাহ পাঠিয়ে দিলেন। উক্ত সৈনিক তুর্কী ভাষায় চীৎকার করে সম্রাটের খোঁজ করতে থাকে। সৈনিকের এ চীৎকার-ধ্বনি সম্রাটের কানে গিয়ে পৌঁছালে তিনি উক্ত সৈনিককে ডেকে আনার জন্যে কুচেককে পাঠিয়ে দিলেন। শীঘ্রই কুচেকের সহিত সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হয়ে উক্ত সৈনিক সংবাদ দিল যে, শাহ মহোদয় তাঁর সন্ধান করছেন। এ সংবাদ পেয়ে সম্রাট তখনি অশ্বে আরোহণ করে শাহের শিবিরের দিকে রওয়ানা হলেন। শাহের বাসস্থানের নিকটে পৌঁছে হুমায়ুন সৈন্যদের কতকগুলি তাঁবু দেখতে পেলেন। তিনি নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই শাহ অকস্মাৎ তাঁকে প্রশ্ন করে বসলেন, "বলতে পারেন, এ তাঁবুগুলি কার?" হুমায়ুনও রহস্যচ্ছলে তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিলেন—"এসব তাঁবু হুমায়ুন বাদশার।' এর পর অশ্ব থেকে অবতরণ করে সম্রাট শাহ তামাস্পের করমর্দন করলেন। শাহ তখন সেখান থেকে নিজের শিবিরে চলে গেলেন এবং হুমায়ুনও স্বীয় বাসস্থানে গমন করলেন।

দ্বিপ্রহর রাত্রে সম্রাট স্বীয় ভৃত্যদের বল্লেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ করছেন। সে-সময়ে শাহের জনৈক ভৃত্য সেখানে উপস্থিত ছিল। সে স্বীয় প্রভুর নিকটে গিয়ে প্রকাশ করল যে, সম্রাট ক্ষুধার কথা বলছিলেন। একথা শুনেই শাহ নয় খাঞ্চা পূর্ব করে খাদ্য-সামগ্রী বাদশার শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন। আহার সমাপনের পর সম্রাট ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সে রাত্রি সেখানেই কেটে গেল।

নিকটেই ছিল এক গিরিপথ। শাহ তামাস্প সেদিকে যাত্রা করলেন। সম্রাটের সঙ্গে তখন বাবা দোস্ত কোরবেগী, মেহতের ওয়াসেল তোশকচী, মেহতের ইউসুফ শরবতী, মেহতের কুচেক বেগ দামিয়ানী, ওয়াসেফ খাদেম ও এ লেখক জওহর আফতাবচী—এ কয়জন মাত্র লোক ছিলাম। সবাই মিলে যাত্রা করে আমরা এক অতি মনোরম স্থানে গিয়ে বিশ্রামার্থ যাত্রা-বিরতি করলাম। সম্রাট এখানে ভৃত্যদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, পূর্ব রাত্রে শাহ তামাস্প তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন এবং অনেক আশারও ইঙ্গিত করেছেন। শাহের সহিত তাঁর যেসব কথাবার্তা হয়েছে, সবই সবিস্তারে বর্ণনা করে সম্রাট এও জানালেন যে, কাজী জাহানের কাছ থেকে আরো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বলে শাহ মহোদয় জানিয়েছেন। সম্রাটের কাছ থেকে এসব কথা জানতে পেরে আমরা সকল ভৃত্য হাত তুলে আল্লাহর কাছে তাঁর সুখ-সৌভাগ্যের জন্যে

মোনাজাত করলাম। এর পর আবার যাত্রা করে আমরা শাহ মহোদয়ের শিবিরের কাছে গিয়ে পৌঁছালাম।

শাহ তখন সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে আবার শিকার করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। যে স্থলে এক কালে হজরত সোলায়মানের প্রাসাদ অবস্থিত ছিল, শিকার-ক্ষেত্র সেখানেই রচনা করা হয়। বহু-সংখ্যক হরিণকে সে জায়গায় ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল। শিকারের স্থান থেকে বেরিয়ে আসার একটি মাত্র পথ ছিল। কাজেই আবদ্ধ হরিণগুলির পালাবার কোন উপায় ছিল না। শাহ তামাস্প একটি হরিণকে এক দিক থেকে তাড়া করলে সম্রাট হুমায়ুন অপর দিক থেকে অগ্রসর হয়ে এর শিং ধরে জঙ্গল থেকে টেনে বের করে নিয়ে এলেন এবং অতঃপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। এভাবে শিকার-খেলায় উভয় নরপতি প্রচুর আনন্দ উপভোগ করলেন। সারা দিন এরূপ আনন্দের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়ে গেল।[২]

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা শিবিরে ফিরে এলাম এবং হজরত সোলায়মানের সিংহাসন অবস্থিত ছিল যে জায়গায় সেখানে মগরেবের নামাজের পর আস্তানা রচনা করলাম। মহামান্য শাহ সেদিন থেকে সম্রাট হুমায়ুনের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনে বিশেষভাবে মনোযোগী হন। তাঁর নিজের কাছে যেসব খাদ্য-সামগ্রী ছিল, সম্রাটের ব্যবহারের জন্যে তিনি তার সবই পাঠিয়ে দেন। এস্থলে সম্রাট পাঁচ দিন অবস্থান করেন এবং তখন খবর পাওয়া যায় যে, রওশন বেগ খাজাঞ্চী ও বর্শাধারী গাজী সুলতান মুহাম্মদকে বন্দী করার জন্যে মহামান্য শাহ আদেশ জারী করেছেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে সম্রাট মন্তব্য করলেন— "এরা প্রকৃতই সাজা পাওয়ার যোগ্য।" শীঘ্রই এদের বন্দী করা হলো এবং শাহ তামাস্প আদেশ দিলেন যে, তাঁবুর দড়ি কেটে নিয়ে সে দড়ি দু'জনের কোমরে বেঁধে উভয়কে সেই গভীর গর্তে নিক্ষেপ করা হোক—যেখানে এক কালে হজরত সোলায়মানের কারাগার অবস্থিত ছিল। শাহ মহোদয় এ নির্দেশও দিলেন যে, যদি দড়ি গর্তের তলদেশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, তা' হলে উভয় বন্দীকে সেখানেই পরিত্যাগ করতে হবে, আর যদি দড়ি তত দূর পর্যন্ত না পৌঁছায়, তা'হলে উভয়কে উপরে তুলে এনে অন্য প্রকার সাজার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সাজার আদেশ

২। আবুল ফজল ও বায়েজিদ এ শিকারের বিবরণী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়েজিদ প্রকৃতপক্ষে এ-সময়ে সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর বিবরণকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি বলে গ্রহণ করা যায়। ('আকবর-নামা', ১ম খণ্ড, ২১৭ ও ২১৮ পৃঃ এবং 'তারিখে হুমায়ুন ও আকবর', ৩২—৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এরপর রওশন বেগ সম্রাট হুমায়ুনের নিকটে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করে কাতরভাবে ফরিয়াদ পেশ করল। এ আবেদন-পত্রে বলা হয়েছিল—"পাপী ও বেতমিজ গোলাম আমরা, প্রাণভিক্ষা পাওয়ার দাবী আমরা করতে পারি না। কিন্তু তবু হুজুরের সোপারিশের আশ্রয় আমাদের মস্তকের উপর বিরাজ করছে। নির্বোধ লোকেরাই অন্যায়ের অনুষ্ঠান করে, আর বাদশাহগণ সে অন্যায় ক্ষমা করেন।"৩

রওশন বেগ তার আবেদনে এ-কথাও উল্লেখ করে যে, সম্রাট (হুমায়ুন) তার জননীর দুগ্ধ পান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সম্রাট রওশন বেগের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে শাহ তামাস্পের কাছে এক পত্র লিখে তাঁকে অনুরোধ করলেন যে, পরলোকগত শাহ ইসমাইলের সমাধির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ রওশন বেগকে ক্ষমা করা হোক। সম্রাটের এ পত্র পাঠ করে শাহ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করলেন—"কি বিরাট অন্তরের অধিকারী বাদশাহ হুমায়ুন! এসব লোক তাঁর ধ্বংস সাধনের জন্যে চেষ্টিত ছিল, আর ইনি এদের জন্যেই সোপারিশ করছেন।" শাহ আদেশ দিলেন যে, পরদিন প্রাতে অপরাধী দু'জনকে হুমায়ুনের হস্তে সমর্পণ করা হোক। এ আদেশ মতোই রওশন বেগ ও গাজী সুলতান মুহাম্মদকে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

পারস্যের শাহানশাহ এর পর সম্রাট হুমায়ুনের সম্মানার্থে সাত দিন ব্যাপী এক 'জশন'-উৎসবের আয়োজন করলেন এবং এতে যোগদানের জন্যে সম্রাটকে দাওয়াত করা হলো। উৎসব-স্থলে প্রায় ছয় শো তাঁবু খাটানো হলো, বারো জায়গায় বাদ্য-বাজনার মঞ্চ তৈরী করা হলো এবং মজলিসী সামিয়ানার নিম্নে জাজোচিৎ ফরাস বিছিয়ে সম্মানিত অতিথির আসনের ব্যবস্থা করা হলো। উপযুক্ত মর্যাদার সহিত এ উৎসবে উপস্থিত থেকে সম্রাট এতে অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম দিন নানা প্রকার আহার্য দ্বারা সম্রাটকে আপ্যায়িত করা হয় এবং তাঁকে শাহী 'খেলাত' (রাজকীয় পোশাক), জড়োয়া, তরবারি ও খঞ্জর উপহার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন শাহ মহোদয় সম্রাটকে নিজের পার্শ্বে বসিয়ে সেখানে যেসব দ্রব্য তখন মওজুদ ছিল, সবই তাঁকে দান করেন। এ উপলক্ষে অসংখ্য তাঁবু ও সামিয়ানা এবং বহু উট ও খচ্চর এক জায়গায় সমবেত করা হয় এবং বাদশাহী জলুস্ রাখার জন্যে আরো নানা ধরনের যেসব দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাও এনে

৩। আবুল ফজল ও গুলবদন বেগম উভয়েই রওশন বেগ সম্পর্কিত এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে গুলবদন বেগম বেশ বিস্তৃতভাবেই এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ('আকবর-নামা', ১ম খণ্ড, ২২২ পৃঃ ও 'হুমায়ুন-নামা', ৭০—৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সম্রাটকে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়। এর পর শাহ তামাস্প সম্রাটের সাহায্যার্থে স্বীয় পুত্রের অধীনে বারো হাজার [৪] সৈন্য ন্যস্ত করে ঘোষণা করেন যে, এ সেনা-বাহিনীর সমুদয় রসদপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম 'সিস্তানে' গিয়ে পাওয়া যাবে। এভাবে সম্রাট হুমায়ুনকে সাহায্য দানের পর শাহ তামাস্প দণ্ডায়মান হয়ে স্বীয় বক্ষে হাত রেখে ঘোষণা করলেন—"হে বাদশাহ মুহাম্মদ হুমায়ুন, আমি আপনাকে যা' দিলাম, তা' মোটেই যথেষ্ট নয়; কিন্তু এ ক্ষুদ্র দানকেই আপনাকে কাজে লাগাতে হবে।"

উৎসবের তৃতীয় দিন উভয় নৃপতি তীরের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করার ব্যাপারে স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং সেদিন রাত্রে এক পানোৎসবের মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। সে মজলিসে উপস্থিত সকলে দারুচিনির আরক দিয়ে স্বহস্তে শরবৎ তৈরী করে পান করেন। মজলিসে কোন পরিবেশনকারী 'সাকী' ছিল না। পরদিন প্রভাতে রাজকীয় দল সেখান থেকে যাত্রা করে। যাত্রার প্রাক্কালে সম্রাট শাহ তামাস্পের সহিত মোলাকাত করতে গমন করেন। শাহ তখন ভাঁজকরা একখানা গালিচার উপরে উপবিষ্ট ছিলেন এবং পার্শ্বে বসার উপযোগী অপর কোন আসন ছিল না। সম্রাট অশ্ব থেকে অবতরণ করে বসার কোন আসন দেখতে না পেয়ে কতকটা বিব্রত বোধ করেন। এ সময়ে হাজী মুহাম্মদ কাশকাহ নামক জনৈক মোগল তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নিজের তীর রাখার থলেটি খালি করে বিছিয়ে দিল এবং সম্রাট তাতে উপবেশন করলেন। সম্রাট তার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে তার নাম বলে নিজেকে একজন মোগল বলে পরিচিত করল এবং জানাল যে, সম্রাটের জনৈক কর্মচারীর ভৃত্য সে।[৫]

হজরত সোলায়মানের সিংহাসনের জায়গা ত্যাগ করে উভয় নরপতি অতঃপর তাব্রিজ অভিমুখে যাত্রা করলেন। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার চার ক্রোশ আগেই এক জায়গায় শিবির সন্নিবেশ করা হলো। শাহ তামাস্প তখন সম্রাট হুমায়ুনকে স্বীয় শিবিরে একটি মজলিসের অনুষ্ঠান করার অনুরোধ করে জানালেন যে, সে মজলিসে শাহ সদলবলে উপস্থিত থাকবেন। শাহের এ অনুরোধ মতো সম্রাট স্বীয়

৪। বায়েজিদ ও নিজামুদ্দীন আহমদ এ ইরানী সেনা-দলের সৈন্য-সংখ্যা দশ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজল কিন্তু বারো হাজারই লিখেছেন। (তারিখে-হুমায়ুন ও আকবর, ৩৫ পৃঃ; আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ২১৮ পৃঃ ও তাবাকাতে-আকবরী, ২১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৫। এ ক্ষেত্রে শাহের উচিত ছিল গালিচাটি প্রসারিত করে হুমায়ুনকেও তাঁরি সঙ্গে বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া। কিন্তু তিনি তা' করেন নি'। আরো বহু ক্ষেত্রে শাহ তামাস্প সম্রাট হুমায়ুনের সহিত এরূপ অশোভন ব্যবহার করেছেন এবং হুমায়ুনকে নিজের প্রয়োজনের খাতিরে ধৈর্য ধরেই এ-ধরনের অবমাননা সহ্য করতে হয়েছিল। (Cambridge History of India, Vol. IV, Page 40)।

এক রাজকীয় মজলিসের আয়োজন করলেন এবং নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। শাহ হিন্দুস্তানী খাদ্য প্রস্তুত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মজলিসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর শাহ মহোদয়কে খবর দেওয়া হয় এবং তিনি স্বীয় অমাত্যবর্গসহ সম্রাটের বাসস্থানে এসে উপস্থিত হন। মজলিসে এক দল সুকণ্ঠ গায়কও সমবেত করা হয় এবং পান-ভোজনের বিশেষ আয়োজন সেখানে ছিল।

কিছুক্ষণ গল্প-গুজবে অতিবাহিত হওয়ার পর এক বিরাট খাঞ্চায় উপহার-দ্রব্যাদি ভর্তি করে নিয়ে আসা হলো। শাহ তামাস্প জিনিসগুলি বিতরণ করার আদেশ দিলেন এবং খাজা মোনায়েমের উপর বিতরণের ভার দেওয়া হলো। শাহ বাহাদুরের সম্মুখে এক থালাভর্তি করে উপহার-দ্রব্য রাখা হলো। এরূপ অপর এক থালা সম্রাটের সম্মুখেও স্থাপন করা হলো এবং অবশিষ্ট উপহার-সামগ্রী পদ-মর্যাদা অনুযায়ী অপর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর খানা আনয়ন করা হলে সকলে তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। যেসব হিন্দুস্তানী আহার্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, তন্মধ্যে খোশকা-পোলাও ডাল সহযোগে পরিবেশন করা হয়। ইরান দেশে কিন্তু খোশকা-পোলাও মুরগীর ডিম সহযোগে আহার করার রেওয়াজ প্রচলিত।

আহার সমাধা হওয়ার পর আবার যাত্রা করে 'মিয়ানা' নামক স্থানে পৌঁছানো গেল। শাহ তামাস্প নির্দেশ দিলেন যে, সম্রাট হুমায়ুনের তাঁবুটি এ জায়গায় রেখেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যাক। শাহ বাহাদুরের এ নির্দেশ মতো নিজের তাবুটি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পশ্চাতে রেখেই সম্রাট শাহের দলবলের সহিত নিজের লোকজনসহ অগ্রসর হলেন। কিন্তু দু' ক্রোশ পথ যেতে না যেতেই বৃষ্টির জন্যে কাফেলাকে থামতে হলো। এস্থলে শাহ বাহাদুরের শিবিরেই সম্রাটকে বিশ্রাম ও নিদ্রার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শাহ তামাস্প কর্তৃক সম্রাটকে বিদায় দান এবং হুমায়ুনের কান্দাহার অভিযান

বৃষ্টি থেমে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই শাহ তামাস্প একটি সেব্-ফল (আপেল) ও ছুরি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন এবং সম্রাটকে আহ্বান করে বল্লেন—"বাদশাহ্ মুহাম্মদ হুমায়ুন, এক্ষণে আমি আপনাকে বিদায় দেব।" এরূপ উক্তির পর শুভ-কামনার নিদর্শন স্বরূপ শাহ তাঁর হাতের ফলটি হুমায়ুনের হাতে তুলে দিয়ে দোয়া করলেন। সম্রাটও সম্মান সহকারে শাহ বাহাদুরের হাত থেকে ফলটি গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। শাহ তাঁর ভ্রাতা বাহরাম মীর্জাকে নির্দেশ দিলেন যে, পশ্চাতে ফেলে-আসা সম্রাটের তাঁবু পর্যন্ত তাঁকে পোঁছে দিয়ে যেন তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।[১]

সম্রাট ও বাহরাম মীর্জা আলাপ করতে করতে পাশাপাশি চলতে লাগলেন এবং তাঁদের লোকজন পশ্চাতে অগ্রসর হতে লাগল। হুমায়ুন নিজের হাতে সেব্-ফলটি কেটে তার অর্ধাংশ বাহরাম মীর্জাকে দিলেন এবং বাকী অর্ধাংশ নিজে আহার করলেন। এভাবেই পথ চলতে চলতে তাঁরা গন্তব্য স্থানে পোঁছে গেলেন। সম্রাটের তাঁবুর সম্মুখে গিয়ে বাহরাম মীর্জা স্বীয় অশ্বের লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় প্রার্থনা করলেন। সম্রাট তাঁর পকেট থেকে একটা পাথরবসানো আংটি বের করে বাহরাম মীর্জার হাতে দিয়ে বল্লেন—"এ আংটি আমার জননীর[২] স্মৃতি বহন করছে। নিজের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ আজ এ আংটি আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি এত দিন আমার অন্তরে শক্তি যুগিয়েছ। তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। সারা জীবন এক সঙ্গে কাটিয়ে দেব, এ ইচ্ছাই আমি পোষণ করেছি। কিন্তু তা' হবার নয়। যে-কোন রূপেই হোক না কেন, সময় আমাদের কাটাতে হবেই। একই অবস্থা চিরকাল বজায় থাকে না।" সম্রাটের এসব কথা শুনে বাহরাম মীর্জা মন্তব্য করলেন—"স্বভাবের রীতি এ রকমই হয়ে থাকে। আপনি নিশ্চিন্ত

১। শাহ তামাস্প সম্রাট হুমায়ুনকে সৈন্য সাহায্য দিয়ে বিদায় করেন ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে।

২। কোন কোন গ্রন্থে 'পিতার স্মৃতি' বলে উল্লিখিত হয়েছে। স্টুয়ার্ট ও আরস্কিন 'জননীর স্মৃতি' লিখেছেন এবং মনে হয় এটাই ঠিক। (Cambridge History of India, Vol. IV. Page 40)।

থাকুন, ইনশাল্লাহ আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।" বাহরাম মীর্জা অতঃপর বিদায় গ্রহণ করলেন।

রাত্রি প্রভাতে রাজকীয় দল 'মিয়ানা' থেকে যাত্রা করল এবং পাঁচ-ছয় ক্রোশ অগ্রসর হয়েই এক জায়গায় থেমে গেল। পরে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তিন দিন পরে আজরবাইজানে উপনীত হলো। এখানে পাঁচ দিন অবস্থান করে সম্রাট স্থানীয় 'বাজার-কাইসার' ও 'গম্বুজ-শাম' পরিদর্শন করেন। এ বিখ্যাত গম্বুজ শাম বা সিরিয়া দেশের মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। বাজার পরিদর্শন কালে সম্রাট দু'জন তুর্কীকে দেখতে পান। এরা সম্রাটকে সালাম করলে পর তিনি বলেন—"দেশে ফিরে গিয়ে তোমাদের বাদশার কাছে আমার শুভাশীস জ্ঞাপন করো।"

আজরবাইজান থেকে রওয়ানা হয়ে চার দিন চার রাত পথ চলার পর রাজকীয় কাফেলা 'আর্দবিল' নামক স্থানে উপনীত হয় এবং সেখানে এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করে। সম্রাট এ জায়গায় শাহ তামাস্পের 'সাফাভী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ সফিউদ্দীন ইসহাকের মাজার এবং শাহ ইসমাইলের সমাধি জেয়ারত করেন। শেখ সফিউদ্দীন ইসহাক শেখ কামালের শিষ্য ছিলেন এবং আমীর তাইমুরের সহায়তায়ই ইনি পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।[৩] যাত্রার প্রাক্কালে মহামান্য শাহ তাঁর ভাগিনেয় মাসুম বেগের এক কন্যাকে হুমায়ুনের হস্তে সমর্পণ করে সম্রাটকে আত্মীয়তা-বন্ধনেও আবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। এ আত্মীয়তার খাতিরেও সম্রাটকে 'আর্দবিল' গমন করে সাফাভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও শাহ ইসমাইলের মাজারদ্বয় জিয়ারত করার ব্যবস্থা করতে হয়। মাজারের দ্বারে একটা শিকল ঝুলানো রয়েছে এবং পারস্য দেশে এ ঐতিহ্য গড়ে ওঠেছে যে, কোন অপরাধী যদি এ শিকলের তলায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তা' হলে তার অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন, তাকে ক্ষমা করা হয়।

আর্দবিল থেকে 'বাহরে-কুলজুম'[৪], সেখান থেকে 'তারাম' ও অতঃপর 'সরখাব' হয়ে রাজকীয় দল অবশেষে 'কাজভিন' গিয়ে পৌঁছাল। মহামান্য

৩। পারস্যের সাফাভী বংশের ইতিহাস নিয়ে স্টুয়ার্ট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। স্যার জন ম্যালকমও তাঁর ইতিহাসে এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ সফিউদ্দীন ও তাঁর পিতার কথা বর্ণনা করেছেন। জওহর বলেছেন যে, আমীর তৈমুর শেখ সফিউদ্দীনকে সাহায্য করে-ছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। সফিউদ্দীনের পরবর্তী বংশধর শেখ সদরুদ্দীনের সহিতই তৈমুরের সাক্ষাৎকার ঘটে। (স্যার জন ম্যালকম্ রচিত 'ইরানের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, ৩২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৪। এ স্থান 'বাহ্‌রে-কুল্‌জুম' হতে পারে না। সম্ভবতঃ জওহর 'বহিরা-খাজর' নামক স্থানকেই ভ্রমক্রমে 'বাহরে-কুল্‌জুম' বলে উল্লেখ করেছেন। 'বহিরা-খাজর' জায়গাটি 'তারাম'-এর নিকটে অবস্থিত।

শাহ তামাস্প আগে থেকেই এ শহরে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট শাহ বাহাদুরের নিকটে উপস্থিত হয়ে সেখানে এক সেনাদল দেখতে পেলেন। শাহ সম্রাটকে দেখা মাত্রই জিজ্ঞেস করলেন–"এ সেনা-বাহিনী কার, বাদশাহ হুমায়ুন বলতে পারেন?" সম্রাট ঝটিতি উত্তর দেন—"এ বাহিনী হলো বাদশাহ হুমায়ুনের।" শাহ তামাস্প অতঃপর মেহতের জিয়া নামক সেনানীকে আদেশ করলেন সম্রাটকে বারো ক্রোশ পথ এগিয়ে দিবার জন্যে। এ আদেশ অনুযায়ী মেহতের জিয়া সম্রাটকে 'ফারস' দুর্গ[৫] পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন। কিন্তু এ-সময়েই ঘটে গেল একটা দুর্ঘটনা। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে চার জন অশ্বারোহী সম্রাটের দলের ইয়াকুব সফরচীকে হত্যা করে পালিয়ে গেল। পরে জানা গেল—সম্রাটকে শাহ বাহাদুর যেসব তরবারি উপহার দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে একখানা হাসান আলী আয়শেক গোপনভাবে হস্তগত করে নেয় এবং তাঁর এ কারসাজির কথা ইয়াকুব সম্রাটকে বলে দিয়েছিল। এ-জন্যেই হাসান আয়শেক ষড়যন্ত্র করে ইয়াকুবকে হত্যা করায়।

রাজকীয় কাফেলা এরপর 'সবজওয়ার'[৬] নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছাল। এখান থেকে মহামান্যা বেগম সেনাদলের সহিত 'তাবেস' অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং সম্রাট স্বয়ং স্বল্প সংখ্যক অনুচরসহ ইমাম মুসা রেজার পবিত্র মাজার জেয়ারত করার উদ্দেশ্যে 'মেশেদ' যাত্রা করলেন। মেশেদে পৌঁছে হজরত ইমাম আলী বিন মুসা রেজার মাজারে গমন করে সম্রাট সম্মান সহকারে তা' জেয়ারত করলেন। যাবার সময় যে ধনুকটি ইমামের মাজারের দ্বারে রেখে যাওয়া হয়েছিল, এবার প্রত্যাবর্তনের পথে ছিলাযুদ্ধ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় তা' ফেরত পাওয়া গেল। এ সময়ে সাত দিন পর্যন্ত মেশেদে অবিরত তুষারপাত হয়। তুষারপাত কতকাংশে কমে আসার পর সম্রাট সদলবলে সেখান থেকে যাত্রা করলেন এবং 'রাওয়াত-তারিক'[৭] নামক স্থানে গিয়ে এক দিনের জন্যে যাত্রা-বিরতি করে পরবর্তী পর্যায়ে 'সঙ্গিরায়' গমন করা হলো। সঙ্গিরায় শাহ কাসেম আনওয়ারের মাজার রয়েছে।

৫। এ স্থানের নাম প্রকৃতপক্ষে 'ওরস দুর্গ' হওয়া উচিত। ষ্টুয়ার্ট 'ওরস' নাম ব্যবহার করেছেন (আরস্কিন, ২য় খণ্ড, ২৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৬। 'সবজওয়ারে' সম্রাজ্ঞী হামিদা বানু বেগমের এক কন্যা সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ২২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৭। আবুল ফজল এ স্থানকে 'তারিকের সরাই' বলে উল্লেখ করেছেন এবং বায়েজিদ শুধু 'তারিক' লিখেছেন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ২১ পৃঃ ও 'তারিখে হুমায়ুন ও আকবর', ৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সম্রাট অতঃপর 'কেল্লাহ-কাহ' নামক তীর্থস্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। এস্থানে বারো ইমামদের মধ্যে একজন আবির্ভূত হন বলে কথিত হয়। এখানে আগমন করে সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে কোন কিছু যাচ্না করলে মানুষের অন্তরের কামনা পূর্ণ হয় বলে লোকেরা বিশ্বাস করে। এ স্থানে এক রজনী অতিবাহিত করে সম্রাট অতঃপর 'তাবেস' পৌঁছালেন এবং সেখান থেকে কয়েক দিন পথ চলে অবশেষে সিস্তানে গিয়ে উপনীত হলেন। এখানে রাজকীয় বাহিনীকে প্রায় পাঁচ দিন অবস্থান করতে হয়। শাহানশাহ্ তামাস্প এ অঞ্চলের আমীরদের আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁরা যেন সম্রাট হুমায়ুনের সেনাদলের জন্যে প্রয়োজনীয় রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। চতুর্দিকের বিভিন্ন পরগনার আমীরগণ শাহের এ নির্দেশ মতো নিজেদের এলাকা থেকে রসদ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে এনে এখানেই রাজকীয় শিবিরে জমা দেন। এ স্থান থেকে দশ ক্রোশ দূরেই 'বাজ'-দুর্গ বা প্রাচীন কালের নওশেরওয়াঁ বাদশার রাজধানী 'মাদায়েন' অবস্থিত ছিল।[৮]

এখানকার শাসনকর্তা মীর খালাজ শাহজাদা আসকরীর অন্যতম আমীর ছিলেন। আলী আস্‌সাবাহও সদলবলে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করছেন, দেখা গেল। সম্রাট দুর্গ আক্রমণ করে লুণ্ঠন করার ও বিশ্বাসঘাতকদের হত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তুর্কমান সৈনিক দল জানাল যে, এরূপ কার্য মহামান্য শাহের নির্দেশের বিরোধী হবে। সম্রাট তখন পত্র লিখে শাহ তামাস্পকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করবেন বলে জানালেন এবং সেনাদলকে দলবদ্ধ হয়ে এক স্থানে সমবেত হওয়ার আদেশ দিলেন। সারিবদ্ধভাবে সৈনিকগণ দণ্ডায়মান হওয়ার পর দেখা গেল—যদিও বারো হাজার সৈন্যের কথা মহামান্য শাহ বলেছিলেন, প্রকৃত পক্ষে চৌদ্দ হাজার সৈন্য সেখানে জমায়েত হয়েছে। এ বিপুল সংখ্যক সৈন্য দৃষ্টে ভীতিগ্রস্ত হয়ে আমীর খালাজ নিজের গলায় তলোয়ার বেঁধে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন।[৯]

রাজকীয় বাহিনী অতঃপর কান্দাহারের পথে অগ্রসর হলো। কান্দাহারে উপনীত হয়ে সম্রাট বৈরাম খানকে দূত স্বরূপ কামরানের নিকটে কাবুলে পাঠিয়ে

৮। আবুল ফজল ও বায়েজিদের বর্ণনা মতে এ দুর্গের নাম 'বাস্ত' হওয়া উচিত, 'বাজ' নয়; (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃঃ ও তারিখে হুমায়ুন ও আকবর, ৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৯। জওহর 'বাস্ত' দুর্গের অবরোধের কথা উল্লেখ করেন নি'। আকবর-নামা ও অন্যান্য ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, যথেষ্ট প্রতিরোধের পরই এ দুর্গের পতন হয় এবং মীর খালাজ তখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃঃ ও তারিখে হুমায়ুন ও আকবর, ৩৯ পৃঃ)।

দিলেন। মীর্জা আসকরী সহজে আত্ম-সমর্পণ করতে রাজী হলেন না ; বরং দুর্গের ভেতরে থেকে যুদ্ধের জন্যেই প্রস্তুত হলেন। কিছু খণ্ড-যুদ্ধের অনুষ্ঠানও হয়ে গেল। প্রথম দিনের যুদ্ধে সম্রাটের অনুচরদের মধ্যে বাবা দোস্ত কোরবেগী ও মেহতের ইউসুফ শরবতী প্রাণ হারালেন। সম্রাট অবশেষে দুর্গ অবরোধের আদেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী সেনাদলের বিভিন্ন অংশকে দুর্গের চতুর্দিকে মোতায়েন করা হলো।

ইতিমধ্যে কাবুল থেকে পলায়ন করে আলেগ মীর্জা ও মীর শের-আফগান সম্রাটের কাছে এসে হাজীর হলেন। আলেগ মীর্জাকে কামরান বন্দী করে রেখেছিলেন এবং শের-আফগানের তত্ত্বাবধানেই তাঁকে রাখা হয়েছিল। একদিন একটা পাহাড়ের উপর বিচরণ করতে করতে অনেকগুলি খচ্চর দেখতে পেয়ে সম্রাট জানতে চান—খচ্চরগুলি কার? উত্তরে এক ব্যক্তি সম্রাটকে জানাল যে, মীর্জা আসকরীর জননী এসব খচ্চরের মালিক। এ-কথা শুনে সম্রাট সম্ভ্রমের সহিত মন্তব্য করলেন—"ছেলে-বেলায় ইনি আমার অনেক সেবা-যত্ন করেছেন।" পাহাড়ের উপর থেকে দুর্গের ভেতরে সব-কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সম্রাট দুর্গ-মধ্যে বেপরওয়াভাবে গুলী বর্ষণের নির্দেশ দিলেন। সম্রাটের এ নির্দেশ অনুযায়ী ভীষণভাবে গোলা বর্ষণ শুরু হলো এবং ফলে দুর্গের অভ্যন্তরে আতঙ্কগ্রস্ত লোক-জনের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আসকরীর আত্ম-সমর্পণ ও কান্দাহার দুর্গের পতন

সম্রাট হুমায়ুন যে সময়ে কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, সে সময়েই মীর্জা কামরান পরলোকগত সম্রাট বাবুরের ভগ্নী নওয়াব খানেজাদ বেগমকে অনুরোধ করে পাঠান যে, তিনি যেন মীর্জা আসকরীকে সঙ্গে করে নিয়ে সম্রাটের কাছে গমন করেন এবং তাঁকে ক্ষমা করার জন্যে সোপারিশ করেন। কামরানের এ অনুরোধ মতো বাবুরের ভগ্নী বিপদের সহায় এ বেগম সাহেবা এক দিন আসকরীকে তাঁর দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে সম্রাটের কাছে গমন করেন এবং আসকরীর সকল অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে অনুরোধ করেন। সম্রাট এ সম্মানিতা মহিলার অনুরোধ রক্ষা করে আসকরীকে ক্ষমা করে দেন।

এরপর স্বভাবতঃই কান্দাহার দুর্গের পতন ঘটল। ইরানী আমীরগণ তখন সম্রাটের কাছে দাবী পেশ করলেন যে, আসকরীর যেসব ধনরত্ন দুর্গে রয়েছে, তৎসমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে আসকরাকে শাহ মহোদয়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। নতুবা তাঁর সমুদয় ধনরত্ন শাহের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হোক।

ইরানী অমাত্যদের এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট জানালেন যে, দুর্গে যেসব ধনরত্ন পাওয়া গিয়েছে, নজর স্বরূপ সেগুলি শাহ বাহাদুরের কাছে প্রেরণ করা হবে।[১] এ ব্যাপারে আদেশ প্রচারের পর সম্রাট নিজে দুর্গমধ্যে গমন করলেন। এ-সময়ে সম্রাটের সহিত যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মেহতের ওয়াসেল তোশকচী ও মেহতের আনিস জানকে 'মেহতের খান' উপাধি দেওয়া হলো। এ অধম লেখক জওহর আফতাবচী এবং কতিপয় সৈনিকও সঙ্গে ছিলাম। সম্রাট মীর্জা আসকরীর ভবনে গিয়ে আদেশ দিলেন যে, সমুদয় ধনরত্ন বের করে এক জায়গায় জমা করা হোক। যেখানে ধনরত্ন জমা করা হচ্ছিল, সেখানে সম্রাট নিজে গিয়ে উপবেশন করলেন। সম্রাট ব্যতীত আরো যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কারমানের শাসনকর্তা শাহ কুলী খান ও তাঁর ভ্রাতা (ইনি

১। কান্দাহার দুর্গে প্রাপ্ত ধনরত্নাদির উপর ইরানের শাহের যে কোন অধিকারই থাকতে পারে না, সম্রাট তাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাহের সহিত ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনেই তিনি 'নজর স্বরূপ' ধনরত্নগুলি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সম্রাটের কর্মচারী ছিলেন), শাহ হোসেন সুলতান, সঞ্জাবের শাসনকর্তার পুত্র বাদাগ খান এবং সিস্তানের শাসনকর্তা আহমদ খান সুলতানের নাম উল্লেখযোগ্য। পারস্যে গমনের সময় এ আহমদ খান সুলতান সম্রাটকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেছিলেন। সকলের সম্মুখে ধনরত্নগুলি বাক্সে বন্ধ করে তাতে তালা লাগানো হয় এবং তার উপর স্বয়ং সম্রাট, ইরানের শাহের অমাত্য শাহ কুলা খান ও মীর বাদাগ খানের শীল-মোহর এঁটে দেওয়া হয়। এর পর সকলে দুর্গ থেকে বাইরে চলে আসেন।

কিন্তু তুর্কমান সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, সম্রাট ও মীর্জা আসকরীকে ধনরত্নসহ ইরানের শাহের নিকটে নিয়ে যেতে হবে—যেন তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রচার করতে পারেন। অগৌণেই এ সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন যে, রাজকীয় কামানগুলি এবং পঞ্চাশজন[২] অশ্বারোহী সৈন্যসহ সকল অমাত্য সম্রাটের শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে এসে জমায়েত হউন। সম্রাটের এ আদেশ মতো কামান ও সৈন্যদলসহ মোগল অমাত্যগণ সম্রাটের শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হচ্ছেন দেখতে পেয়ে ইরানী তুর্কমান সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, সম্রাটের মতলব ভালো নয় বলে মনে হচ্ছে। প্রচলিত পুরনো কাহিনী উত্থাপন করে তারা বলতে লাগল যে, সম্রাট হুমায়ুনের পিতা বাদশাহ বাবুর নাজিম বেগ উজীরকে উজবেক ও তুর্কমানদের সাহায্যে হত্যা করেছিলেন। এবার হয় তো হুমায়ুন সকল ইরানী সৈন্যকে এভাবেই নিহত করবেন। এরূপ মনোভাব নিয়েই ইরানী তুর্কমানগণ মীর্জা আসকরীর ধনরত্নগুলি নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল এবং বারো ক্রোশ দূরে এক জায়গায় গিয়ে শিবির স্থাপন করল। এর পর কয়েক দিনে তারা মহামান্য শাহ তামাস্পের দরবারে গিয়ে হাজীর হলো এবং মীর্জা আসকরীর ধনরত্নাদি তাঁর হস্তে সমর্পণ করল। ধনরত্নাদির এ নজর লাভ করে শাহ তামাস্প তার বিনিময়ে সম্রাট হুমায়ুনকে রাজকীয় পোশাক ও একটি তেজী খচ্চর উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। শাহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সম্রাট ক্ষণেকের জন্যে উক্ত খচ্চরের পৃষ্ঠে আরোহণ করে দু' চার পদ অগ্রসর হওয়ার পর ভূমিতে অবতরণ করলেন।

২। ইরানী তুর্কমান সৈনিকদের বিরুদ্ধে রক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে সম্রাট হুমায়ুন স্বীয় শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে যে সেনা-সমাবেশ করেন, তাতে অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যা কত ছিল, তার কোন সঠিক হিসাব কোন ইতিহাসে উল্লেখিত হয় নি'। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মোগল সৈনিকদের সংখ্যা পঞ্চাশ জনের বেশী ছিল।

সম্রাট অতঃপর স্বীয় অনুচরগণসহ যাত্রা করে 'বাগে-খালজাহ'[১] নামক উদ্যানে গিয়ে বাসস্থান নির্দিষ্ট করলেন। এ জায়গায় রাজকীয় দল এক মাস কাল অবস্থান করে।

এ-সময়ে বাদাগ্ খান অভিযোগ করেন যে, সম্রাট হুমায়ুনের পক্ষ থেকে প্রেরিত খাদ্য-শস্যের রসদ সৈনিকদের নিকটে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। এ অভিযোগ শুনে সম্রাট স্বীয় অমাত্যদের সহিত পরামর্শ করতে বসলেন। অমাত্যগণ সম্রাটকে জানালেন যে, তুর্কমান সৈনিকরা ব্যবসায়ীদের কাছে এক হাজার সাত শো অশ্ব বিক্রী করে ফেলেছে এবং সেসব অশ্ব তখনো দুর্গের বাইরে রয়েছে। অশ্বগুলি অবিলম্বে হস্তগত করার জন্যে অমাত্যগণ সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন।

সম্রাট তখন সেনা-বাহিনীকে 'সোফেদ গম্বুজ' নামক স্থানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে নিজে 'বাবা হাসান-আবদাল' নামক স্থানে চলে গেলেন। এখানেই জোহরের নামাজ আদায় করা হলো। অতঃপর সম্রাট আদেশ দিলেন—সকলের আগে যাবেন হাজী মুহাম্মদ কোকা, তারপর রওয়ানা হবেন আলেগ বেগ এবং তাঁর পশ্চাতে যাবেন বৈরাম খান। সকলের পশ্চাতে সম্রাট নিজে রওয়ানা হলেন এবং জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁরা কান্দাহারে উপনীত হয়ে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে অশ্বগুলি হস্তগত করে নিলেন এবং অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এলেন। অর্ধ-রজনী অতিবাহিত হওয়ার পর সেনাদল দুর্গের নিকটে প্রত্যাবর্তন করল। পরদিন প্রাতে সকল অশ্বের গায়ে রাজকীয় সেনাদলের চিহ্ন দ্বারা দাগ দেওয়ার জন্যে আদেশ দেওয়া হলো। যেসব ব্যবসায়ী সৈনিকদের কাছ থেকে অশ্বগুলি ক্রয় করেছিল, তাদের প্রত্যেককে ঋণ-পত্র লিখে দিয়ে বলা হলো যে, পরে তাদের ঋণ পরিশোধ করা হবে। প্রাপ্ত অশ্বগুলি থেকে এক শো পঞ্চাশটি হিন্দাল মীর্জা ও নাসির মীর্জার জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখে অবশিষ্টগুলি মর্যাদা অনুযায়ী দলের অন্যান্য সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো।

৩। আবুল ফজল এ উদ্যানের নাম 'সম্রাট বাবুরের চাহার-বাগ' বলে উল্লেখ করেছেন। (আকবর-নামা, ১ম খণ্ড, ২৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ইরানের শাহজাদার পরলোকগমন ও কান্দাহার দুর্গের উপর হুমায়ুনের অধিকার প্রতিষ্ঠা

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিতভাবে লোক-লস্করের মধ্যে অশ্বগুলি বিতরণের পর সম্রাট হুমায়ুন ইরানী তুর্কমান সৈনিকদের ছেড়ে কাবুল যাত্রার আয়োজন করলেন। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, ইরানের শাহানশাহের যে পুত্র[১] সেনাদলসহ তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বাদাগ্ খান শাহজাদার এ মৃত্যু-সংবাদ সম্রাটকে জানানো প্রয়োজন মনে করেন নি'। শাহজাদার মৃত্যুতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এ অবস্থায় কিংকর্তব্য নির্ধারণের জন্যে সম্রাট স্বীয় অমাত্যদের সহিত পরামর্শে মিলিত হলেন। শাহজাদার মৃত্যুর পর বাদাগ্ খানই দুর্গের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। পরামর্শের পর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বাদাগ্ খানের কাছ থেকে দুর্গের অধিকার হস্তগত করতে হবে।

কিভাবে দুর্গ অধিকার করা যেতে পারে, তৎসম্পর্কে সম্রাট অমাত্যদের মতামত জানতে চাইলে হাজী মুহাম্মদ কোকা এগিয়ে এসে নিবেদন করলেন যে, দুর্গ দখলের দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হোক। সকলের মতানুসারে শেষে হাজী মুহাম্মদের উপরেই এ দায়িত্ব অর্পণ করে ফাতেহা পাঠের পর আল্লাহর সাহায্য কামনা করা হলো। হাজী মুহাম্মদ কোকা তাঁর লোকজনসহ মধ্য-রাত্রে অভিযানে বহির্গত হলেন। প্রভাতে দুর্গের দ্বার খোলা মাত্রই হাজী তাঁর লোকজনসহ অকস্মাৎ দুর্গমধ্যে ঢুকে পড়লেন। তাঁর দলের একজন মাত্র লোক তীর নিক্ষেপ করল এবং তাতেই ভয় পেয়ে বাদাগ্ খান তাঁর লোকজনসহ সংরক্ষিত জায়গায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

সম্রাট এ সময়ে কান্দাহার থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিলেন। হাজী মুহাম্মদ কোকার 'হোশ' নামক ভৃত্য অগৌণে সম্রাটের নিকটে এসে কান্দাহার

১। আবদুল কাদির বদায়ুনী ইরানের এ শাহজাদার নাম 'মুরাদ' বলে উল্লেখ করেছেন।

দুর্গ দখল হওয়ার শুভ সংবাদটি জ্ঞাপন করল।[২] সম্রাট তখনি যাত্রা করলেন এবং দুর্গে পৌঁছে 'আকশাহ' নামক বুরুজের উপরে ওঠে গেলেন।

বাদাগ্ খান দুর্গের ভেতরের অংশে ছিলেন। সম্রাট তাঁকে বলে পাঠালেন—"ইরানের শাহজাদা আমার কাছেও পুত্রবৎ ছিলেন। শাহ মহোদয় তাঁকে আমারি হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলো, অথচ এ সংবাদটা তুমি আমায় জানালে না, এ কেমন কথা! সংবাদ পেলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর জানাজায় শরীক হতাম, তাঁর আত্মার সদগতির জন্যে আল্লাহর দরগায় দোয়া ও দান-খয়রাত করতাম। তুমি যে অপরাধ করেছ, তার সাজা এই হলো যে, তুমি আর বেরিয়ে এসো না। আমার সন্দেহ হচ্ছে—তুমি বাইরে এলে চুগতাই জাতীয় লোকেরা তোমায় হত্যা করবে। কিন্তু তোমায় আমি প্রাণ দান করছি। অবগুণ্ঠন পরিধান করে দুর্গের পেছনের দরজা দিয়ে তুমি বেরিয়ে যাও। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না।"

শেষ পর্যন্ত বাদাগ্ খানকে এ পন্থাই অবলম্বন করতে হলো। ঘোমটা পরে দুর্গের পেছনের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে তিনি পলায়ন করলেন। সম্রাট অতঃপর কান্দাহার প্রদেশকে স্বীয় অমাত্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। ইরানী তুর্কমান সৈনিকরা লোকদের ফসলের একাংশ আগেই আদায় করে নিয়েছিল বলে সম্রাটের আমীরগণ অতি সামান্য ফসলই রাজস্বের অংশ রূপে নিজেদের ভাগে পেলেন।

সম্রাট বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে সম্রাজ্ঞীকে কান্দাহার দুর্গে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বৈরাম খানই এ দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। অন্যান্য বেগমদের সঙ্গে নিয়ে সম্রাট এর পর খাজা আম্বরের বাসস্থান থেকে সসৈন্যে কাবুলের পথে যাত্রা করলেন। এর আগেই মীর্জা কামরানের সকল আমীর

২। আবুল ফজলের মতে—সম্রাট হুমায়ুন শাহ তামাস্পকে কান্দাহার প্রদেশ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সে প্রতিশ্রুতি মতোই দুর্গের অধিকার ইরানীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি কাবুল যাত্রার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ইরানী তুর্কমান সৈন্যরা কান্দাহারীদের উপর নানারূপ জুলুম-জবরদস্তি করতে থাকে। ইতিমধ্যে শাহজাদার মৃত্যু হওয়ায় বাদাগ্ খানের ব্যবস্থাপনায় অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। সম্রাট কতিপয় জিনিসপত্র ও রাজ-পরিবারের মহিলাদের দুর্গমধ্যে রাখার দাবী করলে বাদাগ্ খান তাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এভাবে নানা প্রকারে বিরক্ত হয়েই হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত কান্দাহার দুর্গ পুনর্দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আবদুল কাদির বদায়ুনী লিখেছেন যে, ইরানী সৈন্যরা 'তাবাররাহ্' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় সুন্নী মুসলমানদের মনোভাবে অবিরত আঘাত দিতে থাকায়ও হুমায়ুন অতি-মাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেছিলেন। ('আকবর-নামা' ১ম খণ্ড, ২৩৮—২৩৯ পৃঃ; 'তাবাকাতে-আকবরী', ২১ পৃঃ ও 'মুনতাখবুল তাওয়ারিখ্', ১২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সম্রাটের কাছে এক আবেদন-পত্র পাঠিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং সর্বপ্রকারে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও তাঁরা সে পত্র মারফত প্রদান করেছিলেন। রাজকীয় বাহিনী মীর্জা আলেগ বেগের জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত হাজারা জেলার 'তেরী' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলে পর মীর্জা হিন্দাল ও তর্জী বেগ এসে সম্রাটের সহিত যোগদান করলেন।

মীর্জা কামরান কাবুল থেকে বেরিয়ে এসে 'বাগে-গজর' নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করলেন। সম্রাট স্বীয় বিজয়ী বাহিনীসহ অগ্রসর হচ্ছিলেন, এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, মীর্জা কামরানের পক্ষ থেকে কাসেম বার্লাস নামক সেনানী যুদ্ধার্থে 'খেমার'[৩] গিরিপথ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। এ সংবাদ পেয়ে সম্রাট হাজী মুহাম্মদ কোকা, খাজা মোয়াজ্জম বেগ, তোলক তোর্‌চি এবং এরূপ আরো কতিপয় লোককে কাসেম বার্লাসের সহিত যুদ্ধ করার জন্যে মনোনীত করেন। এঁদের সহিত খেমার গিরিপথে কাসেম বার্লাসের সৈন্যদের তীব্র সংগ্রাম হয়। খাজা মোয়াজ্জম ও তোলক তোরচী এ যুদ্ধে অসাধারণ তরবারি চালনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে রাজকীয় বাহিনী বিজয়-গৌরবের অধিকারী হয়। বিপক্ষ দল পরাজিত-পর্যুদস্ত হয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করে। শীঘ্রই সম্রাট গিরিপথে এসে উপনীত হন এবং অমাত্যগণ সকলে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে বিজয়ের জন্যে তাঁকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সময়ে কতিপয় আমীর ও উচ্চ-রাজকর্মচারী সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, শাহজাদা মীর্জা কামরানের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হোক। এ প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে সম্রাট জানালেন যে, আগে কাবুলে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণের পরই ক্ষমা-প্রদর্শনের কথা বিবেচনা করা হবে।

রাজকীয় বাহিনী কাবুলের পথে যাত্রা করার উদ্যোগ করেছে, ঠিক এমনি সময়ে আলী কুলী ও বাহাদুর নামক দু'জন সৈনিক অগ্রসর হয়ে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পর জ্ঞাপন করল যে, তাদের পিতা হায়দর সুলতান পরলোক-গমন করেছেন। সম্রাট দু' ভ্রাতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রবোধ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন—"আজ থেকে আমিই তোমাদের পিতার স্থান গ্রহণ করলাম এবং পিতার মতোই তোমাদের প্রতিপালন করব।" সম্রাট স্বয়ং সঙ্গে গিয়ে হায়দর সুলতানকে কবরস্থ করার পরই রাজকীয় বাহিনীর যাত্রা শুরু হলো।

৩। কোন কোন ইতিহাস-গ্রন্থে এ স্থানের ভিন্নরূপ নাম বর্ণিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'আকবর-নামায়' স্থানটিকে 'তাকিয়া-চামার' রূপেই পরিচিত করা হয়েছে।

'খাজা বুস্তান'[৪] নামক স্থানে গিয়ে রাজকীয় কাফেলা শিবির স্থাপন করল। এ স্থান 'বাগে-গজর' থেকে মাত্র তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। পীরজাদা খাজা আবদুল হক ও খাজা জান মুহাম্মদ[৫] সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে সম্রাটের সহিত এখানে সাক্ষাৎ করলেন। সম্রাট অশ্ব থেকে অবতরণ করে এঁদের সমাদর করেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর পীরজাদাদের সহিত যহরের নামাজ আদায় করেন। পীরজাদাদ্বয় সম্রাটকে অবশেষে জানালেন যে, উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের মতলবেই তাঁরা এসেছেন। যদি মীর্জা কামরান তাঁদের প্রস্তাব মেনে নেন, তা' হলে জোহর ও আসরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে আবার তাঁরা সম্রাটের সহিত এসে সাক্ষাৎ করবেন। এ নির্ধারিত সময়ে যদি তাঁরা ফিরে না আসেন, তা' হলে সম্রাট যথেচ্ছভাবে কাজ করতে পারবেন বলে মত-প্রকাশ করে তাঁরা প্রস্থান করেন।

সন্ধির ব্যাপারে মীর্জা কামরানের সহিত মতৈক্য না হওয়ায় পীরজাদাদ্বয় কাবুলে প্রস্থান করেন।[৬] নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেও পীরজাদাগণ পুনরায় না আসায় সম্রাট রওশন তোশকবেগীকে মীর্জা কামরানের নিকটে প্রেরণ করে বলে পাঠালেন—"আমরা হচ্ছি পথিক-মুসাফির, আর তোমরা গৃহবাসী। ইচ্ছা করলে তোমরা এগিয়ে আসতে পার; আর না এলে এটাই বুঝা যাবে যে, তোমরা আমাদের চাও না।" মীর্জার নিকটে গমন করলে পর তিনি রওশনকে সমাদরে গ্রহণ করলেন। রওশন তোশকবেগী তাঁর পরিচিত ছিলেন। মীর্জা কামরান ওজু করে প্রস্তুত হলেন এবং রওশনকে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই গোলমাল শুরু হয়ে গেল; লোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে কাবুলের দিকে পলায়ন করতে লাগল। এরূপ অবস্থা দেখে কামরানের জন্যে আর অপেক্ষা না করেই রওশন তোশকবেগী সম্রাটের শিবিরে ফিরে এলেন এবং কামরানের ওখানে যা-কিছু তিনি দেখে এসেছেন, সবই সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

৪। 'আকবর-নামায়' এ স্থানের নাম "খাজা পেশ্‌তা" (২৪৩ পৃঃ) এবং 'তারিখে হুমায়ুন ও আকবর' গ্রন্থে (৫৬ পৃঃ) "খাজা বাস্তা" লেখা হয়েছে।

৫। বায়েজিদ "খাজা খান মুহাম্মদ, খাজা আবদুল হক ও খাজা দোস্ত খাওয়ান্দ" এ তিনটি নাম উল্লেখ করেছেন। 'আকবর-নামায়' খাজা জান মুহাম্মদের পরিবর্তে 'খাজা খাওয়ান্দ মাহমুদ' লেখা হয়েছে। (বায়েজিদ—৫৭ পৃঃ ও আকবর-নামা, ২৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৬। বায়েজিদ বর্ণনা করেছেন যে, মীর্জা কামরান সন্ধির জন্যে দু'বার তাঁর দূতগণকে হুমায়ুনের নিকটে প্রেরণ করেন। কিন্তু দু'বারই সম্রাট প্রস্তাবিত সন্ধির শর্তাবলী মেনে নিতে রাজী হন নি'। (বায়েজিদ—৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সম্রাট অতঃপর শাহজাদা মীর্জা হিন্দাল, হাজী মুহাম্মদ কোকা এবং আরো কতিপয় আমীরকে তাঁদের লোকজনসহ তখনি কাবুল অভিমুখে যাত্রা করার আদেশ দিলেন। সাত শো' বর্শাধারী অশ্বারোহী সৈন্য নিজের সঙ্গে নিয়ে সম্রাটও পরে রওয়ানা হলেন।

কাবুলে সম্রাটের উপস্থিতির পর খাজা কালান বেগের পুত্র মীর্জা কামরানের আমীরুল-ওমরাহ খাজা মোসাহেব বেগ সর্বাগ্রে এসে সম্মান প্রদর্শন করলেন। অন্যান্য আমীরগণও দূরে থেকে সম্রাটকে অভিবাদন জানালেন। আশীর্বাণী দ্বারাই সম্রাট সকলকে গ্রহণ করলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্রাটের কাবুল বিজয় ও মীর্জা কামরানের পলায়ন

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শান-শওকতের সহিত সম্রাট যখন কাবুলে প্রবেশ করলেন, মীর্জা কামরান তখন দুর্গের অভ্যন্তরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। করাচা খান ও খাজা দোস্ত খান নামক দু'জন লোককে তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, যে-পর্যন্ত স্বীয় পরিবারবর্গকে তিনি দুর্গ থেকে অপসারিত না করছেন, তাঁরা যেন সম্রাটকে কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখেন। এঁরা দেখতে পেলেন যে, দুর্গের ভেতরে প্রবেশ না করে সম্রাট নিজে থেকেই বাইরে অপেক্ষা করে রইলেন। মীর্জা কামরান যেদিন তাঁর পরিবারবর্গকে দুর্গ থেকে বের করে বাইরে নিয়ে গেলেন, সেদিন রাত্রে করাচা খান ও খাজা দোস্ত খান সম্রাটের নিকটে হাজীর হয়ে মোবারকবাদী জ্ঞাপন করে তাঁকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করার জন্যে অনুরোধ করলেন।

সম্রাট এভাবেই অবশেষে বিজয়ী বেশে কাবুল দুর্গে প্রবেশ করলেন[১] এবং মীর্জা কামরানের দরবার-কক্ষের সম্মুখস্থ চত্তরে বড় একটা তাঁবু খাটিয়ে তাতে স্বীয় বাসস্থান নির্দিষ্ট করলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় ওয়াসেল তোশকচীকে আহ্বান করে সম্রাট জানালেন যে, এত রাত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর তখন পর্যন্তও ইফতার করা হয় নি'। তিনি গরম কিছু খাদ্য সংগ্রহের জন্যে আদেশ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর মনে পড়ে গেল বিগা বেগমের কথা। তিনি সম্রাটের অন্যতমা মহিষী এবং তখন কাবুলেই বাস করছিলেন। সম্রাট ভৃত্যদের আদেশ দিলেন—এ বেগম সাহেবার বাড়ীতে গিয়েই সেখান থেকে কিছু খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে। সম্রাটের আদেশ মতো মেহতের ওয়াসেল,

---

১। সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক কাবুল বিজিত হওয়ার তারিখ ৯৫২ হিজরী সনের ১২ই রমজান বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। বায়েজিদ এ তারিখটা ৯৪২ হিজরী সনের ১০ই রমজান বলেছেন এবং ফেরিশতায়ও ১০ই রমজানই বলা হয়েছে। বায়েজিদ যে ভুল সন উল্লেখ করেছেন,. তা' পরিষ্কারই বুঝা যায়। Cambridge History of India (Vol. IV, page 41) গ্রন্থে স্যার রিচার্ড বার্ন বলেছেন যে, ১৫৪৪ খৃষ্টীয় সনের নভেম্বর মাসে হুমায়ুন কাবুল দুর্গ বিজয় করে স্বীয় পুত্র আকবরের সহিত মিলিত হন। এখানেও স্যার রিচার্ড একটা ভুল সন উল্লেখ করেছেন, দেখা যায়। কারণ, পূববর্তী পৃষ্ঠায়ই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শাহ তামাস্প হুমায়ুনকে সৈন্য সাহায্য প্রদান করেন। সুতরাং পরিষ্কারই বুঝা যাচ্ছে যে, হুমায়ুনের কাবুল দুর্গ বিজয়ের খৃস্টীয় সন হবে ১৫৪৫। (আকবর-নামা, ২৪৪ পৃঃ; তাবাকাতে-আকবরী, ২১২ পৃঃ ও ফেরিশ্তা, ১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

তোশক বেগ ও জওহর আফতাবচী (মূল ফার্সী গ্রন্থের লেখক) এ তিন জন বিগা বেগমের বাড়ীতে গিয়ে সম্রাটের কথা জ্ঞাপন করলে পর বেগম সাহেবা গরুর গোশতের কালিয়া এবং গরুর গোশৎ দিয়েই তৈরী আর একটা আহার্য-বস্তু সম্রাটের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।

মেহতের ওয়াসেল দস্তরখান বিছিয়ে সম্রাটকে বিগা বেগম কর্তৃক প্রেরিত আহার্য পরিবেশন করলেন। পেয়ালায় চামচ ফেলে সম্রাট যখন দেখতে পেলেন যে, বেগম গরুর গোশৎ প্রেরণ করেছেন, তখন হাত থেকে চামচ ফেলে দিয়ে তিনি করুণ কণ্ঠে মীর্জা কামরানের ব্যবহারের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। রাজ-পরিবারের সম্মানিতা মহিলাদের পর্যন্ত কামরান এরূপ দুর্দশার মধ্যে রেখেছেন যে, তাঁরা সাধারণ গরুর গোশৎ দ্বারা জীবন রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন, এ-কথা উল্লেখ করে সম্রাট দুঃখ করতে লাগলেন। অবশেষে সম্রাট এক পেয়ালা শরবৎ পান করেই দ্বিতীয় দিন রোজা রাখার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

মীর্জা কামরানের ছোট-বড় সকল অমাত্যই শেষ পর্যন্ত সম্রাটের নিকটে এসে আনুগত্য প্রকাশ করলেন। তিনি সকলকেই আশ্বাস দিলেন এবং যথা-সম্ভব খুশী করবার প্রয়াস পেলেন। এভাবেই কাবুলে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। সমগ্র এলাকাকে অমাত্যদের পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। অতঃপর মীর্জা সোলায়মানের নামে এক ফরমান জারী করে তাঁকে বলে পাঠান হলো যে, সম্রাটের জন্যে কামরানের হস্তে তাঁকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে সর্বপ্রকারে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সম্রাট মীর্জা সোলায়মানকে নিশ্চিন্ত থাকার পরামর্শ দিয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রত্যুত্তরে মীর্জা সোলায়মান সম্রাটকে লিখে জানালেন যে, মীর্জা কামরানের সহিত তাঁর এরূপ চুক্তি হয়েছে যে, বিনা-যুদ্ধে যেন তিনি আত্মসমর্পণ না করেন। সুতরাং বর্তমানে সাক্ষাৎ সম্ভবপর নয়।

সম্রাট অতঃপর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহজাদা মুহাম্মদ আকবর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় উদ্যোগী হলেন। দরবার-কক্ষ সুসজ্জিত করার জন্যে তিনি আদেশ দিলেন এবং কান্দাহার থেকে সম্রাজ্ঞী হামিদা বানু বেগমকে কাবুলে নিয়ে আসার জন্যে করাচা বেগ ও মোসাহেব বেগকে প্রেরণ করলেন। স্থির করা হলো যে, সম্রাজ্ঞী কাবুলে এসে পৌঁছালে পর শাহজাদা আকবরের খৎনা-উৎসব সম্পন্ন করা হবে। সম্রাট এর পর 'বারান' নদীর দিকে সফর করার উদ্দেশ্যে সদলবলে বেরিয়ে গেলেন।

দু'মাস পর সম্রাজ্ঞী হামিদা বানু বেগম কান্দাহার থেকে কাবুলে এসে পৌঁছালেন। এ সময় মধ্যে সম্রাটও সফর শেষ করে কাবুলে ফিরে এসেছিলেন। আসন্ন উৎসবের জন্যে বিরাটভাবে উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়ে গেল। সম্রাটের জন্যে এক সিংহাসন তৈরী করা হলো এবং কোন কোন শাহজাদার জন্যেও কুর্সি প্রভৃতি আসনের আয়োজন করা হলো। সম্রাট বিশেষ শান-শওকতের মধ্যে সিংহাসনে আসীন হলেন। মীর্জা ও আমীরগণ তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী কুর্সিতে উপবেশন করলেন, অথবা তাকিয়া ঠেশ দিয়ে ফরাসের উপর আসন গ্রহণ করলেন। শাহজাদা আকবরের খৎনা-উৎসব সম্পাদন করার পর মীর্জা ও আমীরদের পদমর্যাদা অনুযায়ী 'খেলাত' ও উপঢৌকনাদি প্রদান করে সম্মানিত করা হলো। এভাবেই বিপুল আনন্দোৎসবের মধ্যে রাজকীয় মজলিস শেষ হয়ে গেল।

এ উৎসবের পরে সম্রাট 'জাফর' দুর্গের দিকে রওয়ানা হলেন। মীর মুহাম্মদ আলী তাগাইকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলো এবং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রাজকীয় বাহিনী সম্রাটের অনুসরণ করল। সম্রাটের সৈন্যদল 'তীরগারান' গ্রামের নিকটে উপনীত হলে বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়ে মীর্জা সোলায়মান বাধা প্রদান করলেন। সুতরাং দু'দলে যুদ্ধ বেধে গেল। আল্লাহর মেহেরবানীতে সম্রাট সহজেই জয়ী হলেন এবং পরাজিত-পর্যুদস্ত হয়ে মীর্জা সোলায়মান পলায়ন করলেন।

যুদ্ধের পর 'কাশাম' নামক স্থানে ফিরে এসে সম্রাট তিন মাস কাল সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরবর্তী এক স্থানে এসে শিবির সংস্থাপন করা হলো। এখানে সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একদিন সম্রাটের অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়ল যে, অনেকে তাঁর জীবন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। এ অবস্থায় রাজকীয় দলের অনেকের মধ্যে দলত্যাগের প্রবণতা দেখা দিল। বিদ্রোহী ভাবাপন্ন মীর্জা আসকরীকে কৌশলে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে করাচা খান তাঁকে আটক করে রাখলেন। রাজমাতা চুচেক বেগম বার্ধক্যের দরুন শক্তিহীন হয়ে পড়া সত্ত্বেও প্রত্যহ আনারের রস নিষ্কাশন করে সম্রাটের মুখে ঢেলে দিতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে সম্রাট সুস্থ হয়ে উঠলেন। চোখ খুলে বেগমকে শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখে তিনি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি? বেগম জানালেন যে, সম্রাটের অসুস্থতার জন্যে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। সম্রাট করাচা খানকে নিকটে আহ্বান করে জানালেন যে, তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন—এ খবর সকলকে জানিয়ে দেওয়া

হোক। নির্দেশ মতো বাইরে এসে সম্রাটের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে করাচা খান প্রকাশ্যে ঘোষণা প্রচার করলেন।

সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার পর সম্রাট সদলবলে 'জাফর' দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে মেহতের ওয়াসেল ও মেহতের ওয়াকিলাকে [২] হিন্দুস্তানে অভিযান করার উপযোগী তাঁবু ও সরঞ্জামাদি প্রস্তুত রাখার জন্যে কাবুলে প্রেরণ করা হলো।

২। এ নামটি 'মেহতের ওয়াকিল' হবে ; লিপিকর-প্রমাদের জন্যেই সম্ভবতঃ 'ওয়াকিলা' হয়ে গিয়েছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

মীর্জা কামরানের কাবুলে প্রত্যাবর্তন ও শাহজাদা আকবরকে নিজের হেফাজতে গ্রহণ

সম্রাটের আদেশ মতো কাবুলে গিয়ে মেহতের ওয়াসেল ও মেহতের ওয়াকিলা সম্রাটের হিন্দুস্তানে অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজনে লিপ্ত হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই মীর্জা কামরান ভাক্কার থেকে পুনরায় কাবুলের দিকে অগ্রসর হলেন। 'তেরী' নামক স্থানে উপনীত হয়ে সম্রাটের সমর্থক আলী নামক সরদারকে ধৃত করে তাঁর দু'টো চোখই তিনি উৎপাটিত করে ফেললেন। সেখান থেকে গজনীতে গমন করে জাহিদ বেগকেও তিনি ধৃত করতে সমর্থ হন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। কামরান অতঃপর গজনী থেকে কাবুলের পথে এগিয়ে এলেন এবং সেখানে পৌঁছে ফাজায়েল বেগ (মোনায়েম খানের ভ্রাতা), মেহতের ওয়াসেল ও মেহতের ওয়াকিলাকে ধৃত করতে সমর্থ হন। এদের তিন জনকেই তিনি অন্ধ করে দেন। সম্রাটের পক্ষ থেকে নিয়োজিত কাবুলের শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী তাগাইকেও মীর্জা কামরান বন্দী করে নিহত করেন।[১] এভাবে হুমায়ুনের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী শাহজাদা মুহাম্মদ আকবর পুনরায় মীর্জা কামরানের হস্তে পতিত হন।

মীর্জা কামরানের এসব জবরদস্তি ও অত্যাচারের সংবাদ শীঘ্রই সম্রাটের কর্ণগোচর হয়। হুমায়ুন তখন মীর্জা সোলায়মানের সহিত এক সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ সন্ধির শর্ত অনুসারে 'জাফর' দুর্গের উপর মীর্জা সোলায়মানের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। কান্দাহারের দুর্গ এত দিন পর্যন্ত 'জাফর' দুর্গের এলাকাধীন রূপে বিবেচিত হয়ে আসছিল। এক্ষণে কান্দাহারকে স্বতন্ত্র একটি এলাকায় পরিণত করে সেখানকার দুর্গ মীর্জা হিন্দালের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করা হয়। এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়ার পর সম্রাট কাবুলের দিকে অভিযান করেন।

এ সময়েই কুচ বেগের পিতা শের-আফগান সম্রাটের দল থেকে পলায়ন করে মীর্জা কামরানের সহিত গিয়ে মিলিত হন। কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর 'তালিকান' নামক স্থানে পৌঁছে সম্রাট যাত্রা-বিরতি করতে বাধ্য হন।

১। আবুল ফজল বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ আলী তাগাই হাম্মামে গোসল করছিলেন, এমন অবস্থায় তাঁকে ধৃত করে সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করা হয়।

কয় দিন পর্যন্ত সেখানে ভীষণভাবে তুষারপাত হতে থাকে বলেই রাজকীয় দলের অগ্রগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তুষারপাত বন্ধ হওয়ার পর এখান থেকে যাত্রা করে রাজকীয় কাফেলা কান্দাহারে গিয়ে পেঁাছে। মীর্জা হিন্দাল সে সময়ে কান্দাহারে ছিলেন। কয়েক দিন পর্যন্ত সম্রাট হিন্দালের মেহমান রূপেই অবস্থান করেন। শের-আফগানের দলত্যাগের ফলে সৈনিকদের মধ্যে কতকাংশে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। করচা খানের পরামর্শে সম্রাট এ ব্যাপারে লোকদের বুঝ-প্রবোধ দেন এবং তার ফলে সেনাদলের মনোবল আবার ফিরে আসে।

কান্দাহার থেকে কাবুলের পথে অগ্রসর হতে রাজকীয় দলকে অবিরত তুষারপাতের জন্যে ভীষণ অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়েছিল। অনেক স্থলে স্তূপীকৃত তুষারে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং পথচলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। প্রথমে তুষার-স্তূপ অপসারণ করে রাস্তা পরিষ্কার করতে হচ্ছিল এবং তার পরই অশ্ব ও উষ্ট্রগুলি সে পথে ধীর গতিতে এগোতে পারছিল। 'চারইয়া-কারান' নামক স্থানে পৌঁছে জানা গেল যে, মীর্জা কামরান যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে অবস্থান করছেন। রাজকীয় বাহিনী 'বাবা-খাতুন' [২] নামক স্থানে পৌঁছে রণসাজে সজ্জিত হয়েই পরবর্তী মঞ্জীলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চল্ল। পরবর্তী মঞ্জীলে ওজু করার জন্যে সম্রাট অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। ওজু করতে করতে তিনি যেন শুভ ইঙ্গিত পেলেন। তিনি ঘোষণা করলেন—"ইনশাল্লাহ, যুদ্ধে আমাদের জয় হবে!"

এ স্থান থেকে যাত্রা করে 'দেহা-আফগানান' নামক জায়গার উদ্দেশ্যে রাজকীয় বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় মীর্জা কামরানের পক্ষ থেকে শের আফগান যুদ্ধার্থ এগিয়ে এলেন। তাঁর মোকাবিলা করার জন্যে সম্রাটের পক্ষ থেকে মীর্জা হিন্দাল অগ্রসর হলেন এবং তীব্র সংগ্রামের সূচনা হলো। হিন্দালের একজন সৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হলো। উভয়েই পরস্পরের প্রতি পূর্ণ-শক্তিতে হামলা চালাতে লাগলেন। সম্রাট এ সময়ে নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে এগিয়ে এলেন। কিন্তু করাচা খান এসে সম্রাটের কাছে নিবেদন করলেন যে, তিনিই আগে যুদ্ধে গমন করবেন। সম্রাট করাচা খানকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দিলে তিনি বিপুল বিক্রমে শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন। শের আফগান তিন বার করাচা খানকে তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী করার প্রয়াস

২। ষ্টুয়ার্ট তাঁর অনুবাদে এ স্থানের নাম 'মামা-খাতুন' বলে উল্লেখ করেছেন। (৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

পেলেন। কিন্তু তিন বারই নিজের তরবারি দ্বারা আঘাত সামলে নিয়ে করাচা শের আফগানের সকল আক্রমণ প্রতিহত করে দিলেন। কিন্তু এতেও শের আফগান দমিত হলেন না। চতুর্থ বার করাচার প্রতি তরবারির আঘাত হানতে উদ্যত হওয়া মাত্র শের আফগানের অশ্ব মাটিতে পড়ে গেল। করাচা এ সুযোগে নিজের অশ্বকে তাঁর অশ্বের উপরে তুলে দিলেন এবং শের আফগানকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করতে সমর্থ হলেন। বন্দীকে ধরে এনে করাচা সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করলে সম্রাট তাঁকে নজরবন্দী অবস্থায় রাখার আদেশ দিলেন। কিন্তু করাচা খান বল্লেন যে, এমন নেমকহারামকে হত্যা করাই উচিত হবে। শেষে সম্রাট তাঁর হত্যার আদেশ দিলেন এবং তখনি শের আফগানকে হত্যা করা হলো। এভাবেই সম্রাট আল্লাহর মেহেরবানীতে যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জনে সমর্থ হলেন। শের আফগানের যে সব লোক ধরা পড়ল, মীর্জা হিন্দালের অনুরোধে সম্রাট তাদের প্রাণভিক্ষা দিলেন।

করাচা খান এসে এ খবরও দিয়েছিলেন যে, মীর্জা কামরান কাবুলের বাইরে চলে যাওয়ার মতবল করেছেন। এ সংবাদ পেয়ে কামরানের বাইরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিবার বিষয় বিবেচনা করে সম্রাট ঘোষণা করলেন যে, তিনি নিজে কালো-পাথরের (সিয়া-সঙ্গ) রাস্তা পাহারা দিবেন। করাচা খানকেও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলে দিলেন যে, কাবুলের আশে-পাশে সতর্ক-ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। দুর্গের প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে সম্রাট এক ব্যক্তিকে সেখানেও প্রেরণ করলেন।

পরে জানা গেল যে, মীর্জা কামরান দুর্গ মধ্যে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং বাইরে যাওয়ার কোন পরিকল্পনা তাঁর নেই। এ বিষয় অবগত হয়ে সম্রাট নিজে করাচা খানের বাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বাসস্থানে সম্রাটকে উপস্থিত হতে দেখে করাচা নিজেকে এতটা অনুগৃহীত মনে করলেন যে, তিনি নিজের মাথার পাগড়ী খুলে সম্রাটের পায়ে স্থাপন করেই আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন। সম্রাট তখনি পাগড়ীটি তুলে নিজ হস্তে করাচার শিরে আবার পরিয়ে দিলেন। করাচা খানের আচরণে সম্রাট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। এ ঘটনার পরেই মীর্জা কামরান করাচা খানকে তাঁর দলে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জানিয়ে দিলেন যে, যদি করাচা মীর্জার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তা' হলে তাঁর (করাচার) পুত্র সরদার বেগকে হত্যা করা হবে। মীর্জার এ ভীতি প্রদর্শনের কথা করাচা সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটকে জানালেন। সম্রাট তাঁকে বল্লেন—"আমিও যে তোমার

কাছে সরদার বেগেরই মতো।" সম্রাটের এ কথার প্রত্যুত্তরে করাচা দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করলেন—"সম্রাটের একটি মাত্র পশমের জন্যে শত-সহস্র সরদার বেগকেও আমি কোরবানী দিতে পারি।"—তাঁর এ অসাধারণ প্রভুভক্তি দেখে সম্রাট মোহিত হলেন।

পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাট দুর্গ অবরোধ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করে বিভিন্ন সেনানীকে দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন অংশে মোতায়েন করার আদেশ প্রচার করলেন। সম্রাট নিজে 'আকাবিন-পর্বতের' (কোহ্-আকাবিন) দিকে গিয়ে শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন। এ জায়গা থেকে কাবুল দুর্গ বেশ ভালোভাবেই দৃষ্টিগোচর হতো। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে যুদ্ধের কামান-গুলি স্থাপন করা হলো। এভাবে চারদিকে কামান স্থাপন করা হচ্ছে দেখতে পেয়ে কামরান সম্রাটকে খবর দিলেন যে, যদি কামানগুলি থেকে দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ করা হয়, তা' হলে শাহজাদা আকবরকে এনে কামানের লক্ষ্যস্থলে বসিয়ে দেওয়া হবে।[৩] এ সংবাদ পেয়ে সম্রাট বিশেষ ভাবিত হলেন এবং গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন। সৈনিকদের প্রত্যেককেই সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় থাকতে এবং নিজেদের ব্যূহ দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করার জন্যেও তিনি উপদেশ দিলেন।

৩। আবুল ফজল বর্ণনা করেছেন যে, কামরান বস্তুতঃই শাহজাদা আকবরকে হুমায়ুনের গোলাগুলীর লক্ষ্যস্থলে বসিয়ে দিয়েছিলেন। স্যার রিচার্ড বার্নও এ-কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জওহর নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বিধায় তাঁর বিবরণীকেই সঠিক বলে মনে করা যেতে পারে। (আকবর-নামা, ২৬৫ পৃঃ এবং Cambridge History of India, Vol. IV, page 41 দ্রষ্টব্য)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্রাট কর্তৃক কাবুল দুর্গ পুনরধিকার ও কামরানের পলায়ন

তিন মাস পর্যন্ত কাবুল দুর্গের অবরোধ চলার পর একদিন রাত্রে দুর্গ থেকে গোপনে বেরিয়ে মীর্জা কামরান 'জাফর' দুর্গের দিকে চলে গেলেন।[১] সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহে মহামান্য সম্রাট বিজয়ের অধিকারী হলেন। কামরানের অনুসরণ করার জন্যে মীর্জা হিন্দালকে তিনি প্রেরণ করলেন। সম্রাটের আদেশ মতো অগ্রসর হয়ে হিন্দাল এক জায়গায় দেখতে পেলেন যে, কামরান একটি লোকের পৃষ্ঠে আরোহণ করে পলায়ন করছেন। হিন্দাল তাঁকে তখনি ধৃত করার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু কামরান মিনতি করে বল্লেন যে, যদি তাঁকে ধৃত করে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তা' হলে নিশ্চয় তাঁকে হত্যা করা হবে। কামরানের এ কথায় হিন্দালের মনে দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি তাঁকে একটি অশ্ব প্রদান করলেন এবং দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মীর্জা হিন্দাল অতঃপর কাবুলে ফিরে এলেন।[২]

কাবুলের সাধারণ অধিবাসীদের আচরণে সম্রাট বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাদের আদর্শহীন ও সুযোগ-সন্ধানী মনে করে সমুচিত শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সেনাদলকে লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। সারা রাত বেপরওয়া লুণ্ঠন চল্ল এবং অতঃপর লুটপাট বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ জারী করা হলো। সম্রাট আদেশ দিলেন যে, এর পরও যদি কেও কারো উপর জোর-জবরদস্তির অনুষ্ঠান করে, তা' হলে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে।

মীর্জা কামরান এর পর 'জাফর' দুর্গে গিয়ে আক্রমণ পরিচালনার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু মীর্জা সোলায়মানের সহিত যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হলো। তিনি তখন নিরুপায় হয়ে আশ্রয় ও সাহায্য লাভের আশায় উজবেক সম্প্রদায়ের এলাকায় গমন করলেন। উজবেকদের সহায়তায় কিছু লোক-লস্কর

১। কাবুল দুর্গ থেকে মীর্জা কামরানের পলায়নের তারিখ ৭ই রবিয়ল-আওয়াল ৮৫৪ হিজরী (১৫৪৭ খৃঃ) বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন।

২। মীর্জা কামরানের পলায়নের বিবরণ 'আকবর-নামায়' বিস্তৃতভাবে প্রদান করা হয়েছে। কামরানের প্রতি হিন্দালের অনুগ্রহের কথা বায়েজীদও বর্ণনা করেছেন এবং Cambridge History of India গ্রন্থেও তা উল্লেখিত হয়েছে। (আকবর-নামা, ২৭৮ পৃঃ; বায়েজীদ ৮৪ পৃঃ ও Cambridge History, Vol. IV, page 41 দ্রষ্টব্য)।

সংগ্রহ করে ইনি 'কান্দোজ' দুর্গ[৩] অবরোধ করলেন। এ দুর্গে তখন মীর্জা হিন্দালও অবস্থান করছিলেন। কামরান হিন্দালকে এ মর্মে একখানা পত্র প্রেরণ করলেন যে, উজবেক্‌রা তাঁদের দু' জনেরই দুশমন; একটা বাজে ছুঁতায় তিনি এদের নিয়ে এসেছেন এবং হিন্দাল যদি দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন, তা' হলেই এদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেতে পারে। এ চিঠিখানা উজবেকদের হাতে পড়ে গেল। তারা উপলব্ধি করতে পারল যে, আদতে দু' ভাই একই মতের অনুসারী; এঁদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এর পর কামরানকে পরিত্যাগ করে উজবেকরা নিজেদের এলাকায় প্রস্থান করল।

করাচা খান, মোসাহেব বেগ ও পাবুস্‌ বেগের[৪] দলত্যাগের কাহিনী আমি (জওহর) এক্ষণে বর্ণনা করব। একদিন জনৈক লোককে সঙ্গে করে সম্রাটের নিকটে গিয়ে করাচা খান অনুরোধ করেন যে, লোকটিকে দশ তোমান্ (রৌপ্য মুদ্রা) প্রদান করা হোক। সঙ্গে সঙ্গেই একটি আদেশ-পত্র লিখে লোকটিকে দশটি মুদ্রা প্রদানের জন্যে সম্রাট নির্দেশ প্রদান করেন। লোকটির হস্তে আদেশ-পত্রটি প্রদান করে করাচা খান তাকে খাজা গাজীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু লোকটি যখন খাজা গাজীর কাছে গিয়ে তাঁকে আদেশ-পত্রটি প্রদর্শন করল, তিনি তা' দেখেও অর্থ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে জানালেন যে, কাকেও দান করার মতো অর্থ তহবিলে নেই। হতাশ হয়ে লোকটি তখন করাচা খানের কাছে গিয়ে আদেশ-পত্রটি ফেরত দিল। খাজা গাজীর এ আচরণে নিজেকে অপমানিত বোধ করে করাচা সম্রাটের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন। কিন্তু সম্রাট এ অভিযোগের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। করাচা তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে আরো কতিপয় আমীরসহ দলত্যাগের সঙ্কল্প করলেন।

এঁদের দলত্যাগের সঙ্কল্পের কথা সম্রাট যখন জানতে পারলেন, তখন নানাভাবে তাঁদের বুঝাবার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁদের বুঝ মানানো গেল না। অবশেষে করাচা খান, মোসাহেব বেগ, পাবু্ বেগ এবং মোগল সৈনিকদের একটি দল কামরান মীর্জার সহিত যোগদানের উদ্দেশ্যে দলত্যাগ করল। আমীরদের এ-হেন নেমকহারামীর সংবাদ পেয়েই সম্রাট একদল সৈন্যসহ তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং 'এশতার-কেরাম' নামক

৩। কোন কোন গ্রন্থে 'কান্দোজ' দুর্গের পরিবর্তে 'কান্দাহার দুর্গ' লেখা হয়েছে।

৪। 'আকবর-নামা' ও 'তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর' গ্রন্থে এ ব্যক্তির নাম 'বাবুস্ বেগ' লেখা হয়েছে। আরস্কিনের অনুবাদে 'বাপুস্ বেগ' দেখা যায়।

স্থানে গিয়ে যুদ্ধ করে তাঁদের পরাজিত করলেন। পরাজিত হয়েও এঁরা মীর্জা কামরানের দলে যোগদান করতেই চলে গেলেন।

সম্রাট অতঃপর কাবুলে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মুহাম্মদ সুলতান মীর্জাকে আহ্বান করে ভাবী কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সহিত পরামর্শ করলেন। দীর্ঘ দিন যাবত এ অঞ্চলে বাস করার ফলে এখানকার রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে সুলতান মীর্জার অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। আলোচনার পর তিনি সম্রাটকে জানালেন যে, সর্বাগ্রে যে দল হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করতে পারবে, তারাই পরিণামে বিজয়ের অধিকারী হবে। যেসব আমীর দলত্যাগ করে বিরোধী দলে গিয়ে যোগদান করেছেন, মুহাম্মদ সুলতান মীর্জা তাঁদের আত্মম্ভরী ও গর্বান্ধ বলে মন্তব্য করায় সম্রাট বলে উঠলেন—"ওরা যদি আত্মম্ভরী হয়ে থাকে, তা' হলে আমি নিজের অসহায়তা ও দীনতার কথাই আল্লাহ্-পাকের সম্মুখে উত্থাপন করছি। ইনশাল্লাহ, বিজয় আমাদেরই হবে এবং আমরাই নিশ্চয় সর্বাগ্রে এ পাহাড়-শ্রেণী অতিক্রম করতে সমর্থ হব।" —এর পর বাদশাহ হাত তুলে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা জানালেন।

মঙ্গলবার দিন রাত্রে যাত্রা করে 'রাইওয়াস-জালাক' নামক স্থানে প্রথম বারের মতো যাত্রা-বিরতি করা হলো। হাজী মুহাম্মদ কাশকাহ এ-সময়ে গজনীতে ছিলেন। এক ফরমান জারী করে তাঁকে স্বীয় আমীরগণসহ অবিলম্বে এসে সম্রাটের সহিত মিলিত হবার জন্যে অনুরোধ করা হলো। রাজকীয় দলের অনেকেই মত-প্রকাশ করলেন যে, হাজী কাশকাহ্ সম্ভবতঃ এ অনুরোধ রক্ষা করবেন না। কিন্তু সকলের অনুমানকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে দিয়ে রাজকীয় ফরমান প্রাপ্তি মাত্রই হাজী সাহেব স্বীয় লোকজনসহ এসে সম্রাটের সহিত যোগদান করলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধে কামরানের পরাজয় ও আনুগত্য স্বীকার

রাজকীয় দলের পানি রাখার জায়গায় একটা সুদর্শন সাদা মোরগ থাকত। সম্রাট একে বেশ আদর করতেন এবং অনেক সময় স্বহস্তে কিসমিস খাওয়াতেন। মোরগটি শেষ রাতে বাঙ্ধ্বনি করে সকলকে জাগিয়ে দিত এবং অতঃপর লোকেরা যার-যার কাজ-কর্মে আত্মনিয়োগ করত। একদিন সম্রাট পানি রক্ষণাগারের নিকটে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে ধারণা জন্মাল যে, মোরগটি যদি তাঁর কাঁধে বসে বাঙ্ধ্বনি করে, তা' হলে বুঝা যাবে যে, আবার তিনি রাজ্য ফিরে পাবেন। আশ্চর্যের বিষয়, মোরগটি তখনি এসে তাঁর স্কন্ধে বসে উচৈচস্বরে বাঙ্ধ্বনি করে উঠল। সম্রাট একে ভাবী সাফল্যের ইঙ্গিত স্বরূপ গ্রহণ করে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং মোরগটির পায়ে রূপার আংটি পরিয়ে দিবার জন্যে তাকে ধরে ফেল্লেন।

আবার যাত্রা করে পরবর্তী পর্যায়ে 'কারাবাগ'[১] নামক স্থানে গিয়ে শিবির সংস্থাপন করা হলো। এর পর 'চারকারাম' ও 'গুলবাহার' হয়ে এক মনোরম শস্য-শ্যামল উপত্যকায় অবস্থিত 'পাঞ্জশির' নামক স্থানে রাজকীয় কাফেলা যাত্রা-বিরতি করল। কৃষ্ণ-বসন পরিহিত "কাফির" সম্প্রদায়ের সহিত এ স্থানের অধিবাসীদের যোগাযোগ ছিল। কাবুলের শাসন-ব্যবস্থার অধীনেই তারা বাস করত। এখান থেকে যাত্রা করে অবশেষে রাজকীয় দল এক গিরিপথ দিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে 'বাঙ্গি' নদীর তীরে এসে শিবির স্থাপন করল। এ স্থানে মীর্জা হিন্দালের কাছ থেকে এক পত্র ও কিছু দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া গেল। জোহরের পর পুনরায় যাত্রা শুরু করা হলো এবং এক প্রহর রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর খবর পাওয়া গেল যে, মীর্জা হিন্দাল তাঁর দলবল নিয়ে সম্রাটের সহিত মিলিত হওয়ার জন্যে এসে গেছেন। নিকটবর্তী হয়ে হিন্দাল স্বীয় অশ্ব থেকে অবতরণ করার উপক্রম করতেই সম্রাট তাঁকে বাধা দিয়ে পাশাপাশি চলার নির্দেশ দিলেন। নানাভাবে হিন্দালকে সাহস ও ভরসা দিয়ে সম্রাট অতঃপর প্রশ্ন করলেন

১। সম্রাট হুমায়ুন 'কারাবাগে' দশ-বারো দিন অবস্থান করেন এবং এখানেই মীর্জা সোলায়মানের পুত্র মীর্জা ইব্রাহিম সম্রাটের সহিত এসে যোগদান করেন।

মীর্জা কামরান ও দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে তিনি কোন সংবাদ অবগত আছেন কিনা। প্রত্যুত্তরে হিন্দাল জানালেন যে, তাঁরা 'জাফর' দুর্গে অবস্থান করছেন।

রাত্রির তখন তৃতীয় প্রহর। রাজকীয় বাহিনীকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মীর্জা কামরান নিকটবর্তী হলেন। 'জাফর' দুর্গ থেকে বেরিয়ে কিছু দূর পশ্চাতে হটে গিয়ে পরে সেখান থেকেই তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। কিছু রাত থাকতেই তিনি সম্রাটের সেনাদলের নিকটে এসে স্বীয় সৈন্যদের যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করে দণ্ডায়মান হন। প্রভাতে মীর্জার সেনাদলকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে সম্রাট স্বীয় দলের সৈন্যদের সর্ব-প্রকারে প্রস্তুত হয়ে শত্রুসেনার মোকাবিলা করার আদেশ দিলেন।

সম্রাটের বাম দিকে হাজী মুহাম্মদ খান কোকা স্বীয় দলবলসহ দণ্ডায়মান ছিলেন। এ দলকেই সম্রাটের দল মনে করে মীর্জা কামরান সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে বসলেন। হাজী মুহাম্মদের দল এ আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না এবং ফলে মীর্জার সেনাদল অনেক সাজ-সরঞ্জাম লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। তারা 'তালিকান' দুর্গে প্রবেশ করতেও সমর্থ হলো। এ সংবাদ জানতে পেরে সম্রাট দুর্গের কুতুবখানার অবস্থা জানতে চাইলে তাঁকে জানানো হলো যে, তা' অক্ষুণ্ন রয়েছে। সম্রাট অতঃপর রাজকীয় পতাকা উত্তোলন করে যুদ্ধের দামামা বাজাবার আদেশ দিলেন। মীর্জা কামরান রাজকীয় পতাকা দেখে ও রণবাদ্য শুনে বুঝতে পারলেন যে, এবার সত্য-সত্যই তাঁকে সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করতে হবে। অবস্থা দৃষ্টে বিনা-যুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে তিনি দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নিলেন। মীর্জার লোকদের মধ্যে সর্ব-প্রথমে যে ব্যক্তি সম্রাটের সিপাহীদের হাতে বন্দী হয় তার নাম ছিল শেখম খাজা খোদায়ী।[২] তার শরীরে বেয়াল্লিশটা জখম হওয়া সত্ত্বেও সে অবশেষে নিজের দলে ফিরে যেতে সমর্থ হয়। এভাবে বিজয় লাভের পর সম্রাট 'তালিকান' দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেন। মীর্জার দলের যেসব সৈন্য বন্দী হয়েছিল, তাদের হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়। এদের যখন হত্যা করা হয়, সে দৃশ্য দেখে সম্রাটের অন্তরে করুণার সঞ্চার হয়। তিনি এক উদ্যানে গিয়ে নিজের বাসস্থান নির্দিষ্ট করে সেখান থেকে মীর্জা কামরানের কাছে এক পত্র লিখলেন। পত্রে লেখা

২। মনে হচ্ছে এ নামটা লিপিকরদের ভুলেরই ফলে এরূপ অদ্ভূত রূপ গ্রহণ করেছে। প্রকৃত পক্ষে লোকটির নাম "খাজা খাজরি" ছিল। (আকবর-নামা, ২৭৭ পৃঃ ও তাবাকাতে-আকবরী, ২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হলো—"হে আমার নির্দয় ভ্রাতা! তুমি এ কি অনাচার শুরু করেছ? যে রক্তপাত এখন হচ্ছে, তার জন্যে তুমিই সম্পূর্ণ দায়ী। হাশরের দিন তোমাকেই এ জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। তুমি এসেছিলে; আপোষে একটা মীমাংসা হতে পারত। কিন্তু তুমি তা' কর নি', বরং আল্লাহ্‌র অধিকারেই হস্তক্ষেপ করেছ।" চিঠি লেখা হওয়ার পর নসীব রেমালকে আহ্বান করে সম্রাট তাঁর মারফত চিঠিখানা কামরানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মীর্জা কামরানের কাছে গিয়ে বাহক নসীব যখন চিঠিখানা প্রদান করলেন, কামরান তা' পাঠ করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে বসে রইলেন এবং কোন মন্তব্যই তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না। অবশেষে নসীব যখন চিঠির উত্তর দাবী করলেন, মীর্জা দু'লাইন কবিতা আবৃত্তি করেই চুপ করে গেলেন। কবিতাটির মর্ম ছিল—"রাজ্য এমনি এক সুন্দরী, তরবারির সাহায্য ছাড়া যার ওষ্ঠ চুম্বন করা যায় না।"

নসীব রেমাল সম্রাটের কাছে ফিরে এসে মীর্জা কামরানের অনিশ্চিত মনোভাবের আভাষ প্রদান করলে পর সম্রাট তৎক্ষণাৎ দুর্গ অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন সেনা-নায়ককে দুর্গের চতুর্দিকে নানা জায়গায় মোতায়েন করে দুর্গ লক্ষ্য করে কামান স্থাপনের আদেশও প্রদান করলেন এবং সৈনিকদের বর্শা নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর থেকে কাজ শুরু করে পর দিন প্রভাতের মধ্যেই অবরোধের সকল ব্যবস্থা সম্পর্ণ হয়ে গেল এবং তারপর থেকে দুর্গ লক্ষ্য করে গোলাগুলী বর্ষণ ও বর্শা নিক্ষেপ অব্যাহত ভাবেই চলতে লাগল। এভাবে দু'মাস অতিবাহিত হওয়ার পর নিরুপায় হয়ে মীর্জা কামরান ঘোষণা করলেন যে, সম্রাটের নামে খোৎবাহ্ পাঠ করার জন্যে দুর্গের মধ্যে একজন ইমাম পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেদিন শুক্রবার ছিল এবং সম্রাটের আদেশ অনুসারে মওলানা আবদুল বাকী দুর্গ মধ্যে গমন করে সেখানে জো'মার নামাজে সম্রাট হুমায়ুনের নামে খোৎবাহ পাঠ করে ফিরে এলেন।

শনিবার রাত্রে করাচা খান, মোসাহেব বেগ ও পাবুস্ বেগ—এ কয়জন দলত্যাগী সরদার নিজেদের তীর রাখার থলে ও তলোয়ার স্ব স্ব স্কন্ধে ঝুলিয়ে সম্রাটের সম্মুখে এসে ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন। সম্রাট দয়া-পরবশ হয়ে এদের অপরাধ মার্জনা করে দিলেন। শনিবার দিনের বেলায় দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে মীর্জা কামরান 'বাঙ্গি' নদীর তীরে শিবির স্থাপন করলেন। এ সময়ে মীর্জা সোলায়-মানের পুত্র মীর্জা ইব্রাহিম কামরানের লোকজনের সহিত অবমাননাকর আচরণের অনুষ্ঠান করায় কামরান অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন। এ সংবাদ সম্রাটের গোচরীভূত হলে পর তিনি তৎক্ষাণাৎ মূল্যবান রাজকীয় খেলাত ও অন্যান্য উপহার-দ্রব্যসহ

খাজা জালালুদ্দীন মাহমুদকে কামরানের নিকটে পাঠিয়ে এক পত্র মারফত তাঁকে জানালেন যে, মীর্জা ইব্রাহিম অল্প-বয়স্ক বালক মাত্র, তাঁর উক্তিতে মনঃক্ষুণ্ণ না হয়ে তাঁকে ক্ষমা করাই উচিত। এ পত্রেই সম্রাট মীর্জা কামরানকে এ-কথাও বিদিত করলেন যে, কান্দাহার প্রদেশ তাঁকে প্রদান করা হবে।

খাজা জালালুদ্দীন মাহমুদ সম্রাটের পত্র ও উপহার-দ্রব্যাদিসহ মীর্জা কামরানের সহিত সাক্ষাৎ করলে তিনি অতি সমাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন। সম্রাটের প্রেরিত 'খেলাত' পরিধান করে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হলেন না। কামরান অতঃপর সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে খাজা জালালুদ্দীন লোক-মারফত সম্রাটকে তা' জানিয়ে রাজকীয় নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্রাটের সমীপে কামরানের উপস্থিতি এবং হুমায়ুনের বলখ অভিযান

খাজা জালালুদ্দীন মাহমুদ প্রেরিত দূত এসে যখন সম্রাটের কাছে কামরানের সাক্ষাৎ-প্রার্থনার প্রস্তাব সম্বলিত পত্র প্রদান করল, বাদশাহ বলে ওঠলেন—"সে (কামরান) তার ভাইকে দেখতে আসবে, এতো ভালো কথাই।" সম্রাট অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করে দূতের মারফত একখানা পত্র পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে সম্রাটের সম্মতি লাভের পর মীর্জা কাম ান শাহী দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এদিকে সম্রাট আদেশ দিলেন যে, মীর্জা আসকরীর পায়ে যে বেড়ী পরিয়ে রাখা হয়েছে[১], তা' খুলে দেওয়া হোক। এ আদেশ তখনি পালন করা হলো। ইতিমধ্যে সংবাদ এসে পৌঁছাল যে, মীর্জা কামরান রাজকীয় শিবিরের সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছেন। সম্রাট সকল আমীর ও মীর্জাদের অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এবং সুসজ্জিত সামিয়ানা খাটিয়ে আনন্দোৎসবের বাদ্য বাজানোর আদেশ দিলেন। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন যে, মীর্জা কামরানকে হিন্দালের বাসস্থানে নিয়ে যেতে হবে এবং যখন তিনি সেখানে উপবেশন করতে উদ্যত হবেন, তখনি তাঁকে বলে দিতে হবে যে, সেখানে তাঁর বসলে চলবে না ; সম্রাট তাঁকে নিজের কাছে আহ্বান করেছেন।

এসব নির্দেশ মতোই সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হলো এবং হিন্দালের বাসস্থানে উপবেশন না করেই মীর্জা কামরান সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্যে গমন করলেন। সম্রাট যে গালিচার উপরে উপবিষ্ট ছিলেন, তার কাছে এসেই কামরান মোনায়েম বেগের কাছ থেকে রুমাল চেয়ে নিয়ে সে রুমাল নিজের গলায় বেঁধে সম্রাটের সম্মুখীন হওয়ার উপক্রম করতেই বাদশাহ বল্লেন যে, গলায় রুমাল বাঁধার কোন প্রয়োজন নেই। মীর্জা কামরান মাথা নত করে সম্রাটের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। হুমায়ুন তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং কামরানকে আলিঙ্গন করে স্বীয় ডান পার্শ্বে উপবেশন করালেন।

১। উনবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হুমায়ুনের অসুখের সময় যেসব লোক দলত্যাগের উদ্যোগ করেন, তাঁদের মধ্যে মীর্জা আসকরীও ছিলেন অন্যতম। তাঁকে কৌশলে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে করাচা খান তখন আটক করে রেখেছিলেন। সুস্থ হয়ে তাঁর এবম্বিধ আচরণের কথা জানতে পেরে সম্রাট তাঁর পায়ে বেড়ী পরিয়ে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পর সম্রাট বলে উঠলেন—"এতো হলো আনুষ্ঠানিক মিলন। চল, এখন ভাইয়ে-ভাইয়ে মিলি।" এ-কথার পর উভয়ে দণ্ডায়মান হয়ে গলায়-গলায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন এবং দু'জনেই ভাবাবেগে রোদন করতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে দরবারে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হন। সম্রাট তখন এক পেয়ালা শরবৎ আনয়নের আদেশ দেন এবং তা এলে পর নিজে অর্ধেক পান করে অবশিষ্টাংশ কামরানকে পান করতে দেন। অতঃপর চার ভাই (আসকরী ও হিন্দাল-সহ) একত্রে বসে আহার করলেন। আহারের পর চার ভ্রাতা এক সঙ্গে হাত তুলে আল্লাহ-পাকের দরগায় কল্যাণাশীস কামনা করলেন। দু'দিন পর্যন্ত মিলনের এ আনন্দোৎসব বজায় রইল। তৃতীয় দিন তালিকান দুর্গের কাছ থেকে যাত্রা করে 'আশেক-মাশুকের ঝর্ণা'[২] নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করা হয়। এখানে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে সম্রাট ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বাটোয়ারার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'কোলাব' প্রদেশ মীর্জা কামরান ও আসকরীকে প্রদান করা হয়। চাকর বেগকে মীর্জা কামরানের আমীরুল-ওমরাহ বা প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত করা হয়। 'জাফর' ও 'তালিকান' দুর্গদ্বয় এবং আরো কয়েকটি পরগণার অধিকার মীর্জা সোলায়মানকে প্রদান করা হয়। 'কান্দোজ'[৩] প্রদেশের অধিকার মীর্জা হিন্দালকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং অতঃপর তাঁদের সকলকে নিজ নিজ এলাকার পথে বিদায় দিয়ে সম্রাট স্বয়ং কাবুলের পথে অগ্রসর হন।

পথিমধ্যে মহামান্য বাদশাহ 'বারিয়ান' দুর্গ দখল করে নেন। এ অঞ্চলের কৃষ্ণ-পোশাক পরিহিত 'কাফির' জাতীয় লোকদের হত্যা করা হয়। মালিক পাঞ্জোরা[৪] নামক অমাত্যকে বিজিত দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে সম্রাট কাবুলে প্রস্থান করেন। কাবুলে গিয়ে তিনি খবর পান যে, মীর্জা কামরান ও চাকর বেগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছে এবং বেগকে প্রহার করে তিনি কোলাব প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এ সংবাদ পাওয়ার পর মীর্জা শাহ সুলতানকে

২। এ ঝর্ণার প্রকৃত নাম 'বান্দকোশা' বলে আবুল-ফজল ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। সম্রাট হুমায়ুন এ ঝর্ণার পার্শ্বে প্রস্তরের উপর নিজের আগমনের তারিখটি খোদাই করেছিলেন। এখানেই সম্রাট বাবুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মীর্জার সহিত তাঁর বিরোধের মীমাংসা হওয়ার পর বাবুরও সে ঘটনার তারিখটি খোদাই করে রেখেছিলেন। (আকবর-নামা, ২৮২ পৃঃ এবং 'তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর' ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৩। কোন কোন গ্রন্থে 'কান্দাহার' লেখা হয়েছে।

৪। এ নামটি সঠিক নয় বলেই মনে হচ্ছে। আবুল ফজল ও বায়েজিদ এ ব্যক্তির নাম 'বেগ মিরেক' বলে উল্লেখ করেছেন। ষ্টুয়ার্টের অনুবাদে 'মালেক আলী' লেখা হয়েছে। (আকবর-নামা, ২৮৩ পৃঃ; তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর, ১০৫ পৃঃ এবং ষ্টুয়ার্ট, ৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

একটি রাজকীয় ফরমানসহ কামরানের নিকটে প্রেরণ করে সম্রাট তাঁকে জানান যে, তিনি যেন কাবুলে ফিরে আসেন, তাঁকে নূতন প্রদেশের অধিকার প্রদান করা হবে। মীর্জা শাহ সুলতানের সহিত কাবুলে প্রত্যাবর্তন করে কামরান ঘোষণা করলেন যে, সংসারত্যাগী দরবেশের জীবন যাপনের সঙ্কল্পই তিনি গ্রহণ করেছেন; রাজত্বের লোভ তাঁর আর নেই। মুখে এরূপ উক্তি করলেও অন্তরে অন্তরে তিনি দুরভিসন্ধিই পোষণ করছিলেন।

সম্রাট এ-সময়ে 'বলখ' অভিযানের সঙ্কল্প করেন। মনে মনে তিনি এ ইচ্ছা পোষণ করছিলেন যে, যদি 'বলখ' বিজয় সম্ভবপর হয়, তা' হলে কামরানকে এ প্রদেশের অধিকার প্রদান করা হবে এবং তা' হলে তাঁর সহিত মিলিত হতে কামরানের আর কোন আপত্তি থাকবে না। এ পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে সম্রাট কাবুল থেকে বলখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হিন্দাল মীর্জা, সোলায়মান শাহ মীর্জা, হাজী মুহাম্মদ কোকা, তর্জী বেগ, মোনায়েম বেগ এবং আরো কতিপয় অমাত্য এ-সময়ে সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন। সম্রাট মনে করেছিলেন যে, মীর্জা কামরানও নিশ্চয় তাঁর সহযাত্রী হবেন। কিন্তু রাজকীয় কাফেলা 'আইবেক' [৫] নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেও কামরানের আগমনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পীর মুহাম্মদ উজবেকের জনৈক অমাত্য [৬] এ স্থানের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন। সম্রাট দুর্গটি অবরোধ করার পর জয় করে নিলেন। অতঃপর মীর্জা হিন্দালের স্ত্রী ও সন্তানদের এবং কতিপয় আমীরকে কাবুলে ফেরত পাঠিয়ে সম্রাট 'বল্খ' প্রদেশ জয় করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন।

পীর মুহাম্মদ খানের প্রধান অমাত্য মীর আতালিক বেগকে সম্রাট তাঁর সহযাত্রী করে নিলেন। আতালিক বেগ করাচা খানকে অনুরোধ করলেন যে, বল্খ অভিযানে অগ্রসর হওয়া সম্রাটের মর্যাদার উপযোগী কাজ হচ্ছে না, এ-কথাটা তিনি তাঁকে বুঝিয়ে বলুন। কিন্তু করাচা সম্রাটকে এরূপ কথা বলতে রাজী হলেন না। আতালিক বেগ তখন এরূপ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, সম্রাট একজন মুসলমান এবং সকল মুসলমান যদি একে-অপরের সাহায্য করতেন তা হ'লে তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহে নিশ্চয় অসাধ্য সাধন করতে পারতেন। আতালিক বেগ উজবেকদের প্রশংসা করে বল্লেন যে, তারা এক অসাধারণ জাতি।

৫। আকবর-নামা, তাবাকাতে-আকবরী ও তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর প্রভৃতি গ্রন্থেও এ স্থানের নামোল্লেখ করা হয়েছে। জায়গাটা 'বল্খ' প্রদেশের অধীনে ছিল।

৬। পীর মুহাম্মদ খান বল্খের শাসনকর্তা ছিলেন এবং খাজা আতালিক বেগ ছিলেন তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত আইবেক দুর্গের অধ্যক্ষ। (আকবর-নামা, ২৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সম্রাট তাদের দেশ ছেড়ে চলে গেলেই ভালো করবেন।[৭] করাচা খান এসব কথা সম্রাটের কানে পৌঁছালেন। কিন্তু তবু তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত বল্‌খে পৌঁছে গেলেন। উজবেকরা গিয়ে বল্‌খ দুর্গে আশ্রয় নিল। এ-সময়েই সংবাদ পাওয়া গেল যে, মীর্জা কামরান কাবুলে গিয়ে পৌঁছেছেন। এ সংবাদে সম্রাটের সৈন্যদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হলো; নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে সকলেই কাবুলে প্রত্যাবর্তনের জন্যে অধীর হয়ে উঠল। শেষে দ্রুতগতিতে কাবুলে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো এবং রাত-দিন পথ চলে সম্রাটের সেনা-বাহিনী বিশৃঙ্খল অবস্থায় একদিন কাবুলের নিকটে এসে পৌঁছাল।[৮]

স্বীয় সেনাদলের আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সহিত সম্রাট বলেন—"বিশ্বস্ততা আমার লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। আজ যা-কিছু ঘটছে, তাদের স্বার্থপরতার জন্যেই তা' সম্ভবপর হয়েছে।" এক দিন কথা-প্রসঙ্গে নিজের লোকদের সম্মুখে সুলতান মাহমুদ ও ইয়াকুব লায়েসের[৯] গল্প বর্ণনা করে মহামান্য সম্রাট উপদেশচ্ছলে এ সত্যটিই প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান যে, উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ হলে অতি-সহজেই সাফল্য অর্জিত হতে পারে।

৭। বায়েজিদ বিস্তৃতভাবে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে আতালিক বেগ সম্রাট হুমায়ুনের নিকট দু'টো বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, সম্রাট যদি বল্‌খ জয় করতে চান, তা' হলে তাঁদের (আতালিক বেগ ও তাঁর সহচরবর্গ) হত্যা করে তিনি অগ্রসর হতে পারেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে এরূপ শর্তে সন্ধির কথা বলা হয় যে, বল্‌খের কিছু অঞ্চল সম্রাটকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সমরকন্দ ও বোখারায় সম্রাটের নামে খোৎবাহ্ পড়ানো হবে। সম্রাটের ভারত-অভিযানে উজবেকরা একদল সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে, এরূপ প্রস্তাবও আতালিক বেগ করেছিলেন।

৮। সম্রাটের 'বল্‌খ' অভিযান ও সেখান থেকে কাবুলে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ বায়েজিদ ও আবুল ফজল তাঁদের গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। (তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর, ১১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

৯। সুলতান মাহমুদ ও ইয়াকুব লায়েস সম-সাময়িক ব্যক্তি ছিলেন না। ৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইয়াকুব লায়েসের মৃত্যু হয়, আর সুলতান মাহমুদ দশম শতাব্দীর শেষভাগে সিংহাসনারোহণ করেন। সম্ভবতঃ সম্রাট হুমায়ুন অপর কোন ব্যক্তির সহিত সুলতান মাহমুদের সংগ্রামের কথাই বর্ণনা করে থাকবেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কামরানের পুনর্বিদ্রোহ ও কাবুচাক গিরিপথের যুদ্ধ

সম্রাটের কাবুলে প্রত্যাবর্তনের তিন মাস পর সংবাদ পাওয়া যায় যে, মীর্জা কামরান অস্থিরভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং কাবুলের পার্শ্ববর্তী স্থানে তাঁর উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। এ সংবাদ পেয়েই কাবুল থেকে সসৈন্যে যাত্রা করে মহামান্য সম্রাট প্রথমে 'কারাবাগ' এবং সেখান থেকে 'চারিকারান' নামক স্থানে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করেন। পরে সেখান থেকেও যাত্রা করে 'বারান' হয়ে 'কাবুচাক' গিরিপথের দিকে অগ্রসর হন। এ গিরিপথের নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল। সম্রাট উক্ত নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে অশ্বসহ নদীতে নেমে পড়েন। কিন্তু সহগামী সৈনিকদের মধ্যে একটি লোকও সম্রাটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অশ্বসহ নদী পার হওয়ার জন্যে কোন চেষ্টা না করে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রইল। এ দৃশ্য দেখে সৈনিকদের উদ্দেশ করে সম্রাট বলে উঠলেন—"পারস্য-সম্রাট ইসমাইল সাফাভী একদিন এক পাহাড়ের উপর থেকে নিজের রুমাল-খানা নীচে নিক্ষেপ করলে তাঁর অনুসারী বারো হাজার সৈন্য তখনি স্বেচ্ছায় পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্ম-বিসর্জন করেছিল। আর আমি তোমাদের বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে একজন লোকও আমার অনুসরণ করে নদী পার হওয়ার চেষ্টা কর নি'! একা-একাই আমি নদী পার হয়ে এসেছি, আমার পেছনে তোমরা কেউ আস নি'। এরূপ সেনাদল থেকে কীই বা আশা করা যায়!"

অতঃপর বাদশাহ করাচা খানের সহিত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। করাচা এ অভিমতই প্রকাশ করলেন যে, নিকটে যে কয়টি গিরিপথ রয়েছে, তার সবগুলিই দখল করে নেওয়া প্রয়োজন। এগুলি দখল করতে গিয়ে যদি কোন স্থানে মীর্জা কামরানকে বন্দী করা সম্ভবপর হয়, তা' হলেই সকল গোলযোগের মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। পরামর্শ মতো আল্লাহ-কুলী বাহাদুর, আল্লাহ-কুলী আন্দারাবী[১], মোসাহেব বেগ এবং তলোয়ার চালনায় সিদ্ধহস্ত আরো কতিপয় দক্ষ সৈনিককে সঙ্গে দিয়ে সম্রাট হাজী মুহাম্মদ কোকাকে

১। 'আকবর-নামা' ও 'তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর' গ্রন্থে আল্লাহ-কুলীর পরিবর্তে 'আলী-কুলী' নাম দেখা যায়।

'কোতেল-সারতুন'[২] নামক গিরপথে প্রেরণ করলেন এবং তিনি নিজে (সম্রাট) 'কাবুচাক' গিরিপথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সম্রাট স্বীয় দলবলসহ উক্ত গিরিপথ থেকে এক ক্রোশ দূরে এক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে অবস্থান করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে, মীর্জা কামরান 'কাবুচাক্' গিরিপথে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সম্রাট তখন গিরিপথের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু মীর্জা কামরান এসে রাজকীয় দলের সম্মুখীন হলেন। জোহরের নামাজের সময় সম্রাট যুদ্ধার্থে অশ্বে ারোহণ করলেন এবং তখন থেকে আসরের নামাজের সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চল্ল। এ যুদ্ধে রাজকীয় দলের একান্ত বিশ্বস্ত সৈনিক পীর মুহাম্মদ আখতা সর্বাগ্রে নিহত হন। সম্রাট আদর করে এঁকে 'পীরেক' বলে সম্বোধন করতেন এবং সম্রাটের জন্যে প্রাণ দিবার কামনা ইনি বরাবর পোষণ করতেন। মীর্জা কুলী চৌবের পুত্র দোস্ত মুহাম্মদও এ যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মীর্জা কুলী নিজেও আহত হন। মুহাম্মদ আমীন নামক সৈনিকের অশ্বটি তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে গেলে পর সম্রাট নিজের একটি অশ্ব তাকে প্রদান করেন। এ লোকটির পিতা মীর্জা কামরানের দলের সৈনিক ছিল। সম্রাট সে কথা উল্লেখ করলে পর মুহাম্মদ আমীন দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করে যে, পিতার সহিত তার কোন সম্পর্ক নেই; সম্রাটের অধীনে কাজ করার সৌভাগ্যের জন্যে সে নিজেকে ধন্য মনে করছে।

এ সময়ে এক অর্বাচীন[৩] এগিয়ে এসে সম্রাটকে তরবারির দ্বারা আঘাত করল এবং সে আঘাতে বাদশাহ মস্তকে আহত হলেন। লোকটি দ্বিতীয়বার আঘাত করতে উদ্যত হলে রোষকশায়িত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে সম্রাট ধিক্কার-ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। বাদশার এ দৃষ্টিতে লোকটি যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উদ্যত হস্তেই যে দাঁড়িয়ে রইল। অতি-দ্রুত অগ্রসর হয়ে ফরহাদ খান নামক সৈনিক লোকটিকে ধরে ফেল্ল। আহত হওয়ার দরুন সম্রাট তখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বাইরে চলে এলেন এবং মুহাম্মদ আমীন ও আবদুল ওহাবকে সৈনিকদের সাহায্যার্থ গমন করার আদেশ দিলেন।

মস্তকের আঘাত থেকে রক্তপাত হওয়ার ফলে সম্রাটের গায়ের জোব্বা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি জোব্বাটি খুলে সাইদুল খানের ('সম্বল' নামেও পরিচিত) হাতে দিলেন। সাইদুল তখন পলায়নপর ছিল বলে অসতর্ক অবস্থায় জোব্বাটি

২। একখানা গ্রন্থে এ গিরিপথের নাম শুধু 'কোতেল' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

৩। আবুল ফজল ও বায়েজিদ এ ব্যক্তির নাম 'বাবা' ও 'বেগ বাবা' বলে উল্লেখ করেছেন (আকবর-নামা, ২৯৭ পৃঃ ও 'তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর', ১২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হাত থেকে ফেলে দিল। কামরানের দলের জনৈক সৈনিক জোব্বাটি কুড়িয়ে তার মুনিবের কাছে নিয়ে গিয়ে জানাল যে, সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে। এ ভিত্তিহীন সংবাদ শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে সম্রাটকে দেখতে এলেন। যুদ্ধের ময়দানে যাঁরা এভাবে সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হলেন, তাঁদের মধ্যে মীর সৈয়দ বরকাহ, খিজির খান, ফরিদ খান আমুভী, মীর্জা মুহাম্মদ হাকিম, মীর পুলেক তোশকবেগী, মীর আফজল, মীর হাজেরের ভৃত্য সম্বল, মীব আশেক তোপচী, মওলানা সালেহ এবং সম্রাটের এ অধম সেবক জওহর আফতাবচীও যুদ্ধের ময়দান থেকে বাদশার সহযাত্রী হতে পেরেছিল। সম্রাট আহত ছিলেন এবং যথেষ্ট সংখ্যক অশ্ব তখন ছিল না বলে মীর সৈয়দ বরকাহ নিজের অশ্বটি সম্রাটের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দেন। বাদশাহ অশ্বে আরোহণ করলে পর তাঁর ডান পার্শ্বে সৈয়দ বরকাহ ও বাম পার্শ্বে খিজির খান অবস্থান করে তাঁকে ধরে রেখে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁরা সম্রাটকে প্রবোধ দিচ্ছিলেন এবং প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাদের কাহিনী বর্ণনা করে তাঁর মনে উদ্দীপনা জাগ্রত করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। তাঁরা এ-কথাও বলেন যে, অদৃষ্টে যা' ছিল তা-ই হয়ে গিয়েছে, এ জন্যে মনমরা হওয়ার কোন হেতু নেই।

অবশেষে সম্রাট অনেকটা আশ্বস্ত হন। আসরের নামাজের সময় শাহ মুহাম্মদ এসে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখতে পেয়েই সম্রাট হাজী মুহাম্মদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। শাহ মুহাম্মদ জানালেন যে, 'কোতেল-সারতুন' গিরিপথ অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে এসেছেন। মগরেবের নামাজের সময় খাজা জালালুদ্দীন মাহমুদ উপস্থিত হলেন এবং রাত্রিবেলা রাজকীয় দল 'কোতেল্-সারতুন' গিরিপথ এলাকায় গিয়ে পৌঁছাল। সম্রাটের সর্দি লেগেছিল এবং মাথার জখমের জন্যেও তিনি কতকটা অসুস্থ বোধ করছিলেন। চামড়া দিয়ে তরী নিজের গায়ের জামাটি খুলে মীর সৈয়দ বরকাহ সম্রাটকে পরিয়ে দিলেন।

প্রভাতে রাজকীয় দল 'কোতেল-সারতুনের' নিকটবর্তী নদীর তীরে উপনীত হলো। নদীর কিনারায় গিয়ে সম্রাট মস্তকের আঘাতের রক্ত ধৌত করলেন এবং অতঃপর ওজু করে নামাজের জন্যে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু কোনও জায়নামাজ তখন সঙ্গে ছিল না। সম্রাটের এ ভৃত্য (জওহর) তখন কুর্সীর গদি বিছিয়ে দিল এবং সম্রাট সে গদীর উপরই নামাজ পড়লেন। এ সময়েই সুলতান মুহাম্মদ হারাওল্ এসে উপস্থিত হলেন এবং সম্রাটের আহত অবস্থা দেখে গভীর মর্ম-বেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন। সম্রাট তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং হাজী মুহাম্মদের গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানতে চাইলেন। সুলতান

মুহাম্মদ সম্রাটকে জানালেন যে, হাজী মুহাম্মদ শীঘ্রই নিকটে এসে পৌঁছবেন বলে আশা করা যায়।

যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সম্রাট অশ্বারোহণ করেছেন, ঠিক এমনি সময়ে হাজী মুহাম্মদ খান প্রায় তিন শো' অশ্বারোহীসহ উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। সম্রাট সুস্থ আছেন দেখে তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করে যাত্রা করা একান্ত প্রয়োজন বলে অভিমত জ্ঞাপন করলেন। সম্রাট তখন বল্লেন যে, মীর্জা কামরান সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই কাবুলে পেঁৗছে গেছেন। পূর্ব দিন যে-সময়ে শাহ মুহাম্মদ এসে পৌঁছান, হাজী মুহাম্মদও যদি তখনি আসতেন, তা' হলে কাবুলের পথেই আক্রমণ করে কামরানকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতো বলেও বাদশাহ মত প্রকাশ করলেন। শীঘ্রই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনিও স্বীকার করলেন।

দ্বিপ্রহরের সময় সম্রাটের কাফেলা 'জাহাক-রান' নামক স্থানে উপনীত হলো। সম্রাট তখন বাহাদুর খানের কাছ থেকে কলম-দোয়াত চেয়ে নিলেন এবং বল্লেন যে, যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে লোকজনসহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করছেন, এ সংবাদ জানিয়ে কাবুলে চিঠি প্রেরণ করতে হবে। তিনি দলের অপরাপর লোককেও নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে অনুরূপ মর্মে পত্রাদি লিখতে উপদেশ দিলেন। অতঃপর হাজী মুহাম্মদ খান ও শাহ মুহাম্মদকে নিজের কাছে আহ্বান করে সম্রাট জানালেন যে, গজনীর জায়গীর শাহ মুহাম্মদকে দেওয়া হলো। কামরানের লোকেরা গিয়ে পৌঁছানোর আগেই শাহ মুহাম্মদকে সেখানে গিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অবিলম্বে যাত্রা করার আদেশ দিলেন। নিজের লিখিত পত্রখানা তাঁর হাতে দিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, গজনী যাওয়ার পথে কাবুলে সম্রাটের পুত্রের হস্তে এ চিঠি দিয়ে যেতে হবে। যাত্রার সময় বাদশাহ শাহ মুহাম্মদকে বিশেষভাবে এ-কথাও বলে দিলেন যে, তিনি যে-পর্যন্ত গজনীতে গিয়ে না পৌঁছান, সে-পর্যন্ত সেখানকার শাসন-ব্যবস্থা পুরাপুরিভাবে তাঁকে নিজের আয়ত্তাধীন করে রাখতে হবে।

এর পর সদলবলে যাত্রা করে সম্রাট 'বামিয়ান' নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা-বিরতি করলেন। আলী দোস্ত খানের পিতা হোসেন আলী আয়শেকের নিকটে একজনের ব্যবহারোপযোগী ক্ষুদ্র একটি সামিয়ানা ছিল। সামিয়ানাখানা এনে খাটিয়ে দেওয়া হলো এবং বাদশাহ এর ছায়ায় বেশ আরামে বিশ্রাম করলেন। সম্রাটের অধম সেবক জওহর আফতাবচী প্রভাতের সময় সম্রাটের নিদ্রাভঙ্গ করে জানাল যে, ফজরের নামাজের সময় হয়েছে। সম্রাট বল্লেন—"আহত অবস্থায়

ঠাণ্ডা পানি দিয়ে আমি ওজু করব কেমন করে?" এ সেবক কিন্তু আগে থেকেই পানি গরম করে রেখেছিল এবং সম্রাটকে সে-কথা জানালে তিনি উঠে ওজু করে নামাজ সমাধা করলেন। রাজকীয় কাফেলা অতঃপর আবার যাত্রারম্ভ করল। পথিমধ্যে এক স্থানে বাদশাহ গোসল করার জন্যে অশ্ব থেকে অবতরণ করে বাহাদুর খানকে বল্লেন যে, পরিধানের বস্ত্রে রক্ত লেগে রয়েছে বলে তিনি বিশেষ অসুবিধা বোধ করছেন। বাহাদুরকে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন—রক্তাক্ত কাপড়গুলি বদলিয়ে পরার মতো অপর কোন বস্ত্র তাঁর কাছে আছে কিনা। বাহাদুর করজোড়ে নিবেদন করল—একবার সম্রাট অনুগ্রহ করে তাঁকে যে একখানা বস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন, সেখানাই তাঁর কাছে রক্ষিত রয়েছে। সম্রাট বাহাদুর খানের কাছ থেকে কাপড়খানা চেয়ে নিলেন এবং তা' পরিধান করে গায়ের রক্তমাখা বস্ত্রগুলি ধৌত করার জন্যে জওহরের (মূল গ্রন্থের লেখক) হস্তে প্রদান করলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে রাজকীয় দল 'খামরুদ' নামক স্থানে গিয়ে শিবির সংস্থাপন করে। এখানে তাহের মুহাম্মদ সম্রাটের খেদমতে হাজীর হন। ইনি ছিলেন মীর খোর্দার পুত্র। একটি পুরনো তাঁবু তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং সম্রাটের জন্যে তা' খাটিয়ে দিলেন। সামান্য কিছু আহার্য-দ্রব্যও তাঁর সঙ্গে ছিল। সম্রাটের লোকজনের ব্যবহারের জন্যে তিনি সেসব দ্রব্যাদি প্রদান করলেন। কিন্তু সম্রাটের জন্যে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক 'নজর' নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি'। তাঁর আনীত আহার্য-দ্রব্যাদি ব্যবহার করার জন্যে সম্রাট লোকদের অনুমতি দিলেন এবং নিজে পানির ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাহের মুহাম্মদ যে পুরনো তাঁবু নিয়ে এসেছিলেন, তার সঙ্গে কোন গোসলখানা বা শৌচাগার ছিল না দেখে এ অধম সেবক (জওহর) পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে কিছু ছন্-ঘাস সংগ্রহ করে এনে তার সাহায্যে তাঁবুর পার্শ্বে একটি গোসলখানা তৈরী করে দিল।

এক বৃদ্ধা মহিলা এখানেই একটি রেশমী আংরাখা সম্রাটের জন্যে তৈরী করে পাঠালেন। সম্রাট জিনিসটি পেয়ে মন্তব্য করলেন যে, যদিও পুরুষের পক্ষে রেশমী বস্ত্র পরিধান সঙ্গত নয়, তথাপি প্রয়োজনের খাতিরে আংরাখাটি তিনি ব্যবহার করবেন। যে আংরাখাটি তাঁর পরনে ছিল, তা' অত্যন্ত ময়লা হয়ে গিয়েছে বলে মহিলার প্রেরিত জিনিসটি তখনি তিনি পরিধান করলেন। বৃদ্ধার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে পারিতোষিক স্বরূপ এক ফরমান মহামান্য বাদশাহ তখনি তার হস্তে প্রদান করলেন।

এ সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল যে, তিন শো অশ্বের একটি দল এসে পৌঁছেচে। সম্রাট আল্লাকুলী আন্দারাবী ও হায়দার মুহাম্মদ আখতাহ বেগীকে অশ্বগুলির ভার গ্রহণের জন্যে প্রেরণ করলেন। জোহরের সময় আবার খবর এলো যে, এক হাজার সাত শো অশ্বের দ্বিতীয় একটি দলও এসে গিয়েছে। সম্রাট নিজে অশ্বারোহণে অগ্রসর হয়ে গিরিপথের রাস্তাটি দখল করে অশ্ব-ব্যবসায়ীদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দিলেন। ব্যবসায়ীরা তখন নিরুপায় হয়ে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হলো। ব্যবসায়ীদের দলের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি একটি ধনুক ও নয়টি তীর সম্রাটের সম্মুখে রেখে তাঁকে অভিবাদন করে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—"ইনশাল্লাহ্, শীঘ্রই বিরাট এক বিজয় সম্ভবপর হবে।"—অশ্বগুলির দাম-দর স্থির করে অতঃপর ব্যবসায়ীদের তমঃসুক লিখে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, বিজয় লাভের পর তাদের অর্থ পরিশোধ করা হবে।

মহামান্য সম্রাট এর পর 'আলনাজেক' [৪] নামক স্থানে সদলবলে উপনীত হলেন। এ জায়গায় 'আয়মাক' জাতির বাস ছিল। খাদ্য-শস্য এখানে বিশেষ পাওয়া যায় না। রাজকীয় দল এ স্থানে সাত দিন অবস্থান করে। আয়মাকরা প্রত্যহ ষাটটি করে ছাগল ও ষাট মশকভর্তি দধি সরবরাহ করেছিল। যেসব অশ্ব সংগ্রহ করা হয়েছিল, এখানেই সেগুলি সৈনিকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে রাজকীয় কাফেলা 'বাঙ্গি' নদীর তীরে গিয়ে সমবেত হয়। একজন অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তি চীৎকার করে জিজ্ঞেস করতে থাকে যে, কাফেলার লোকেরা সম্রাট হুমায়ুনের কোন খবর জানে কি না? লোকটির চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করে সম্রাট তার পরিচয় ও আগমনের কারণ জানার জন্যে লোক প্রেরণ করেন। উক্ত ব্যক্তি নিজেকে 'মাশী'-উপজাতির সরদারের ভ্রাতুষ্পুত্র রূপে পরিচিত করে জানায় যে, সম্রাট যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন বলে মীর্জা কামরানের লোকেরা প্রচার করেছে এবং এ-জন্যেই সে সম্রাট সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এসেছে। সম্রাট অতঃপর লোকটিকে দর্শন দান করে প্রশ্ন করলেন—"তুমি আমায় চিনতে পারছ কি?" লোকটি সম্রাটকে চিনতে পেরেছে বলে ঘোষণা করার পর সম্রাট তাকে বল্লেন—"তোমার সরদারের কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে বলো ফেরার পথে তাঁর সাহায্য আমি গ্রহণ করব।"—অতঃপর লোকটিকে বিদায় দেওয়া হলো।

৪। আকবর-নামায় এ স্থানের নাম 'আদি-খানজান' বলে উল্লেখিত হয়েছে। (২৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হাজী মুহাম্মদ কোকাকে আহ্বান করে সম্রাট অতঃপর আদেশ দিলেন পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়ার মতো একটা জায়গা খুঁজে বার করার জন্যে। আদেশ মতো হাজী বেরিয়ে গেলেন এবং একটা উপযুক্ত স্থান বের করে সেখানে সদলবলে নদী পেরিয়ে সম্রাটকে সংবাদ দিলেন। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই সম্রাটও যাত্রা করলেন এবং যাত্রার সময় এ লেখককে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন—"চল, তুমিও আমার সাথে চলো।" রাত প্রায় এক প্রহরের সময় সম্রাট যখন নদী পার হলেন, তখন আলী কুলী আন্দারাবীও সঙ্গে ছিলেন। হাজী মুহাম্মদ খান অগৌণে সম্রাটের নিকটে হাজীর হলেন এবং সমগ্র রজনী আলাপ-আলোচনা করেই তাঁদের কাটল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কামরান কর্তৃক কাবুল দুর্গ অধিকার ও আকবরকে পুনরায় হস্তগতকরণ

পরদিন প্রাতে রাজকীয় কাফেলা আবার যাত্রা করে 'আওলিয়া-খঞ্চা' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির সন্নিবেশ করল। মীর্জা হিন্দাল এখানে এসে সম্রাটের সহিত মিলিত হলেন। তাঁর কাছে রাজকীয় পোশাক ও সাজ-সরঞ্জাম যা' ছিল, সবই বাদশার হস্তে সমর্পণ করে তিনি পরিপূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন। তার পর সদলবলে রওয়ানা হয়ে সম্রাট 'আন্দারাব' নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলেন।

এক্ষণে আমি (মূল গ্রন্থের লেখক জওহর) মীর্জা কামরানের কথা বর্ণনা করব। যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে তিনি প্রথমে 'চার-কারান' নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং পরদিন খুব সকালে যাত্রা করে কাবুলে গিয়ে সেখানকার দুর্গ ঘিরে ফেলেন। কাসেম বরলাস তখন কাবুল দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। পূর্বে তিনি মীর্জা কামরানেরই কর্মচারী ছিলেন। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় সম্রাট পরে তাঁর উপরই দুর্গের ভার অর্পণ করেছিলেন। মীর্জা কামরান এবার কাবুল দুর্গ অবরোধ করলে কাসেম আলী প্রথমে আত্ম-সমর্পণ করতে রাজী হন নি'। কিন্তু পরে কামরান যখন সম্রাটের পরিত্যক্ত জোব্বা দেখিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবী করলেন, তখন কাসেম আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। ফলে শাহজাদা মুহাম্মদ আকবরও পুনরায় মীর্জা কামরানের হাতে পড়লেন।

সম্রাট 'আন্দারাবে' অবস্থান করে কাবুলের এ সংবাদ পেলেন। সোলায়মান মীর্জা ও ইব্রাহীম মীর্জা সম্রাটের নিকটে এসে দৃঢ়তার সঙ্গে আনুগত্য প্রকাশ করে ঘোষণা করলেন যে, যদি আল্লাহ তাঁদের বাঁচিয়ে রাখেন, তা' হলে জীবনপণ করেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত সম্রাটের খেদমত করে যাবেন। এ স্থানে সম্রাট ও তাঁর লোক-লস্কর এক মাস বাইশ দিন অবস্থান করেন। এ-সময়েই খবর পাওয়া যায় যে, মীর্জা কামরান হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী পথ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার সঙ্কল্প করেছেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে পূর্বাহ্ণেই হিন্দুকুশ পর্বতে গিয়ে ঘাঁটি দখল করে অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে সম্রাট সেদিন থেকেই সকলকে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন।

একদিন সকল অমাত্য ও মীর্জাদের একত্রিত করে সম্রাট পবিত্র কোরআন স্পর্শ করে এ মর্মে শপথ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন যে, কোন দিনই তাঁরা সম্রাটকে ত্যাগ করে যাবেন না, কিংবা কোনরূপে তাঁর সহিত বিশ্বাস-

ঘাতকতা করবেন না। সম্রাটের প্রস্তাব শুনে হাজী মুহাম্মদ খান বলে উঠলেন যে, সর্বাগ্রে সম্রাটকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। হাজীর এ কথার প্রতিবাদে মীর্জা হিন্দাল প্রশ্ন উত্থাপন করলেন—মহামান্য সম্রাট শপথ গ্রহণ করতে যাবেন কেন? হাজীকে উদ্দেশ করে তিনি এ-কথাও বল্লেন যে, তাঁরা কেও বাদশাহ্ নন; সুতরাং শপথ দেওয়ার কথা তাঁদের মুখে শোভা পায় না।[১] সম্রাট তখন বল্লেন যে, এতে কিছু যায় আসে না। হাজী মুহাম্মদ ও অন্যান্য অমাত্যগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার কথা বরাবর বলে এসেছেন বলেই শপথের কথা আমি উত্থাপন করেছি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত সকলেই শপথ গ্রহণ করলেন। সম্রাট এদিন রোজা রেখেছিলেন।

এক বৃহস্পতিবারে রাজকীয় কাফেলা হিন্দুকুশ পর্বতের পথে যাত্রা করল। পর্বতের পাদদেশে একদিন অবস্থান করে কাফেলা 'পাঞ্জশির' নামক স্থানে গমন করল এবং পরে 'আশতারগ্রামে' পোঁছে তারা দেখতে পেল যে, মীর্জা কামরানের লোকেরা আগে থেকেই সেখানে এসে শিবির সন্নিবেশ করেছে। মহামান্য সম্রাট মীর্জা শাহ সুলতানকে কামরানের নিকটে প্রেরণ করে বলে পাঠালেন—"কাবুল এমন কোন মূল্যবান স্থান নয় যে, এর জন্যে আমরা দু'ভাই পরস্পরের সহিত কলহ-কোন্দলে লিপ্ত থাকতে পারি। সব চেয়ে ভালো হবে যদি বিরোধের অবসান করে তোমার কন্যা ও আমার পুত্রের হস্তে আমরা কাবুল সমর্পণ করতে পারি।[২] এর পর আমরা এখান থেকে যাত্রা করে সম্মিলিতভাবে 'লামগান' গমন করে সেখান থেকে হিন্দুস্তানে অভিযানের ব্যবস্থা করতে পারব।" মীর্জা শাহ সুলতান কাবুলে গমন করে মীর্জা কামরানের নিকট সম্রাটের প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু করাচা বখ্‌ত অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং পরিণামে কামরানও প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেই শাহ্ সুলতানকে বিদায় দেন।

কাবুল থেকে ফিরে এসে কামরান মীর্জা ও করাচা বখ্‌তের সহিত তাঁর কথোপকথন ও আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে মীর্জা শাহ সুলতান যখন সম্রাটকে অবহিত করলেন, সম্রাট তখন সকল অমাত্য ও মীর্জাদের সহিত পরামর্শ করতে

১। আবুল ফজল অতি কঠোর ভাষায় হাজী মুহাম্মদ খানের এ আচরণের নিন্দা করেছেন এবং তাঁর প্রতি 'নির্বোধ' 'বেয়াদব' প্রভৃতি বিশেষণ পর্যন্ত 'আকবর-নামায়' ব্যবহার করা হয়েছে। (৩০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২। আবুল ফজল পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, সম্রাট হুমায়ুন তাঁর পুত্র শাহজাদা আকবরের সহিত কামরানের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ উভয়কে কাবুল দানের কথাই উত্থাপন করেছিলেন। (আকবর-নামা, ৩০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বসলেন। সকলের মতানুসারে স্থির হলো যে, চার ঘণ্টা রাত থাকতেই সেনাদল যুদ্ধসাজে প্রস্তুত হবে এবং পরদিন খুব ভোরে যুদ্ধার্থ যাত্রা করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত মতেই পরদিন সকালে সেনাদল অভিযানে অগ্রসর হলো। মীর্জা সোলায়মান ও মীর্জা ইব্রাহীম সম্রাটের ডান পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করলেন এবং শাহজাদা মীর্জা হিন্দাল বাম পার্শ্বে সওয়ার হয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। হাজী মুহাম্মদ খান সেনাদলের মধ্যে অবস্থান করে এবং অন্যান্য অমাত্যগণ তার পশ্চাতে এগোতে লাগলেন। যখন সেনা-বাহিনী বিপক্ষীয় সৈন্যদের শিবিরের সম্মুখে উপস্থিত হলো, তখন হাজী মুহাম্মদ খান অকস্মাৎ প্রস্তাব করে বসলেন যে, সেদিন যুদ্ধ স্থগিত রেখে সেনাদলের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হোক। নিজেদের মধ্যে কোন মতভেদ করা হবে না, এরূপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার দরুন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাজী মুহাম্মদের এ প্রস্তাব সম্রাটকে মেনে নিতে হলো। এ সময়ে মীর্জা হিন্দাল অভিমত প্রকাশ করলেন যে, পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সেদিনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। বেগ মীরেকও আন্তরিকতার সহিত ঘোষণা করলেন যে, জীবনে অনেক ত্রুটিই হয় তো হয়ে গিয়েছে; বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধে শহীদ হয়েই সেসব ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি অভিলাষী। তুলুক কুরচীও সম্রাটের সান্নিধ্যে থেকে যুদ্ধ করার অনুকূলেই মত প্রকাশ করলেন।

সম্রাট শেষে আবদুল ওহাবকে ডেকে বলে দিলেন যে, সেনাদলকে শিবির সংস্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হোক। কিন্তু কাফেলার সঙ্গে কোন তাঁবু বা চাদরাদি ছিল না। সুতরাং শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন উপায় ছিল না। সম্রাটের নিকটে ফিরে এসে আবদুল ওহাব এসব অসুবিধার প্রতি তাঁর (সম্রাটের) দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সম্রাট বল্লেন—"এক্ষণি আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। যদি যুদ্ধ হয় ভালোই; আর যুদ্ধ না হলে আমরা নদীর তীরে গিয়ে উম্মুক্ত স্থানেই অবস্থানের ব্যবস্থা করে নেব।"

সম্রাট অশ্বারোহণ করে অগ্রসর হওয়ার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ সৈনিক এগিয়ে এসে তাঁর (সম্রাটের) অশ্বের বল্গা ধারণ করে বলে উঠল —"হুজুরের জয় হয়ে গিয়েছে; আপনি ফিরে চলুন।" সম্রাট ু' রাকাত শোকরানার নামাজ আদায় করে অতঃপর রওয়ানা হলেন। জানা গেল যে, মীর্জা কামরান শাহজাদা মুহাম্মদ আকবরকে হাসান আখতার[৩] হস্তে সমর্পণ করে প্রস্থান করেছেন।

৩। এ ব্যক্তির প্রকৃত নাম 'হাসান আখতা' না হয়ে 'হাসান রহমত' হবে। (আকবর-নামা, ৩০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

আফগানদের নিকট কামরানের আশ্রয় গ্রহণ এবং যুদ্ধে হিন্দালের মৃত্যু

আন্দারাব ত্যাগ করে মহামান্য সম্রাট 'শাতেরগেরান' গিয়ে পৌঁছালেন। এখানে এক সুউচ্চ পাহাড় রয়েছে। পাহাড়ের উপরে মীর্জা কামরানের লোকেরা আগে থেকেই অবস্থান করছিল। কামরানের সৈন্য-সামন্তও নিকটে এসে জমা হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মীর্জা ইব্রাহিম আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে দিবাভাগেই পাহাড়ের চূড়া দখল করে নিতে সমর্থ হন। সম্রাটও অপর দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি স্থান পর্যন্ত আরোহণ করতে সমর্থ হন। সেখানে গিয়ে তিনি স্বীয় বন্দুকধারী সৈনিকদের গুলীবর্ষণের আদেশ দেন। তারা কামরান মীর্জার সেনাদলের উপর মাত্র দু' তিন বার গুলী বর্ষণ করার পরই করাচা কারাবখত[১] স্বীয় সেনাদলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সম্রাটের বাহিনীর উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবার প্রয়াস পান। এভাবে প্রথম আক্রমণের কিছুক্ষণ পরই তিনি পুনরায় আক্রমণার্থ এগিয়ে আসেন। কিন্তু আল্লাহ-পাকের আশ্চর্য মহিমা! হঠাৎ করাচা অশ্ব থেকে ভূমিতে পড়ে যান এবং তখন তখনি মীর্জা হিন্দালের লোকেরা অগ্রসর হয়ে তরবারির আঘাতে দেহ থেকে তাঁর শির বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। করাচার কর্তিত মস্তক সম্রাটের সম্মুখে এনে উপস্থিত করা হলে সম্রাট আদেশ দেন যে, কাবুলে নিয়ে গিয়ে সেখানকার দুর্গের দ্বারদেশে এ মস্তক ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। কয়েক দিন আগে সম্রাট যখন একটি আপোষ-প্রস্তাবসহ মীর্জা শাহ সুলতানকে কাবুলে কামরান মীর্জার নিকট পাঠিয়েছিলেন, তখন করাচা আপোশের বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে গর্বভরে বলেছিলেন যে, স্বীয় মস্তকের বিনিময়ে হলেও কাবুলের দুর্গদ্বার তিনি রক্ষা করবেন। তাঁর সে গর্বিত উক্তির কথা মনে করেই সম্রাট এ আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বাদশাহ মীর্জা ইব্রাহিমকে কাবুলে গিয়ে হামলা করার জন্যে প্রেরণ করেন এবং মীর্জা হিন্দালকে কামরানের অনুসরণে নিয়োজিত করেন। মীর্জা সোলায়মান সম্রাটের কাছেই থেকে যান।

১। করাচা কারাবখত—পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, এ ব্যক্তির প্রকৃত নাম করাচা খান।

এক্ষণে সম্রাটের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহজাদা মুহাম্মদ আকবরের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। মীর্জা কামরানের পরাজয়ের পর হাসান আখতা বেগ[২] শাহজাদাকে নিয়ে এসে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করলেন। এভাবেই দীর্ঘ দিন পর শাহজাদা পিতৃ-সন্নিধানে আসার সুযোগ পেলেন। সম্রাট শাহজাদাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর মস্তকে ও চোখে চুম্বন করে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করলেন। পিতা-পুত্রের এ মধুর মিলন হজরত ইয়াকুব ও হজরত ইউসুফের মিলনের কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

শাহজাদার সহিত মিলনের পর সম্রাট সদলবলে কাবুলের পথে অগ্রসর হয়ে রাত্রে সেখানে উপনীত হন। সংবাদ পাওয়া যায় যে, মীর্জা কামরান 'কাতুল-কার' নামক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সম্রাটও পশ্চাদ্ধাবন করে সেখানে গিয়ে হাজীর হলেন। সম্রাটের আগমন-বার্তা পেয়েই কামরান সেখান থেকে পলায়ন করে 'জাগ্রী' নামক জায়গায় চলে গেলেন। কিন্তু সম্রাটও তাঁর অনুসরণে বিরত হলেন না। মীর্জা কামরান শেষে নিরুপায় হয়ে খলিল আফগানের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সম্রাট সেখানে আক্রমণ পরিচালনার কথা প্রথমে ভেবেছিলেন। কিন্তু আফগানদের গোড়াতেই বিরোধী করে তোলা সঙ্গত হবে না বিবেচনায় কয়েক দিন পথ চলে রাজকীয় বাহিনী 'চাহ্‌রা'[৩] নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলো। কোনও উঁচু স্থান দেখে সেখানে সেনাদলের জন্যে একটি স্থায়ী দুর্গ নির্মাণের সঙ্কল্প করে সম্রাট উপযুক্ত একটি স্থান সন্ধান করতে থাকেন। অনেক খোঁজাখুজির পর দুর্গ নির্মাণের উপযোগী একটি স্থান আবিষ্কার করে সেখান থেকে ফেরার পথে তিনটি হরিণ রাজকীয় দলের সম্মুখে পড়ে যায়। তন্মধ্যে একটি হরিণ মীর্জা হিন্দাল শিকার করেন এবং অন্যটি শাহ আবুল মা'লার হাতে ধরা পড়ে। তৃতীয় হরিণটি কিন্তু দৌড়ে পালাবার প্রয়াস পায়। মীর্জা হিন্দাল তার পেছনে দৌড়ে গিয়ে তৎপ্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, হরিণটি তার মস্তক ও পা' আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত করে যেন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আরো আশ্চর্যের বিষয়, এ ঘটনার দু'দিন পরই মীর্জা হিন্দাল আফগানদের হস্তে নিহত হন।

হিন্দালের হরিণ শিকারের পর দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে, মীর্জা কামরান আফগানদের সহায়তায় রাজকীয় শিবিরের উপর এক নৈশ-আক্রমণ পরিচালনার

২। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের ৩নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৩। বায়েজিদ এ স্থানের নাম 'চাইরিয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন। (তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর, ১৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মতলব করেছেন। এ-কথা জানতে পেরে সম্রাট নিজে পাহাড়ের উপরে অবস্থান করার ও অন্যান্য সেনানীদের চারদিকে মোতায়েন রাখার পরিকল্পনা করেন। মীর্জা হিন্দাল সারা রাত সেনাদলের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করে সৈনিকদের উৎসাহ দিতে থাকেন। হঠাৎ সংবাদ পাওয়া যায় যে, আফগানরা প্রকৃতই অতর্কিত-ভাবে নৈশ-আক্রমণ শুরু করেছে এবং মীর্জা হিন্দালের সৈন্যদলের বিরুদ্ধেই তাদের আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। শত্রুদলের আক্রমণের সময় হিন্দালের কাছে একটি ধনুক ও দু'টি তীর ব্যতীত অপর কোন অস্ত্রই ছিল না। তিনি এ তীর-ধনু নিয়েই দুশমনদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে যান। কিন্তু শত্রুদের সংখ্যা ছিল অনেক। তারা যুদ্ধরত অবস্থায়ই হিন্দালকে নিহত করে।[৪] কোনরূপ সাহায্য না পেয়ে হিন্দালের সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে চলে আসে।

পরে সম্রাট হিন্দাল সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে তাঁর নিহত হওয়ার দুঃসংবাদটি কেউ সাহস করে বলতে পারে নি। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সম্রাট উচ্চৈঃস্বরে হিন্দালের খবর জিজ্ঞেস করতে থাকেন। প্রায় তিন শো লোক তাঁর সম্মুখে পাহাড়ের পাদদেশে দণ্ডায়মান থাকা সত্ত্বেও কেউ মুখ খুলে এ দুঃসংবাদটি ঘোষণা করতে সাহসী হয় নি। সকলকে এরূপ নীরব থাকতে দেখে সম্রাট অবশেষে আবদুল ওহাবকে মীর্জা হিন্দালের খোঁজ নেওয়ার জন্যে প্রেরণ করলেন। হিন্দালের সংবাদ নিয়ে আবদুল ওহাব ফিরে আসছিলেন, পথিমধ্যে জনৈক বন্দুকধারী সৈনিক তাঁকে একজন আফগান মনে করে গুলী করে এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অতঃপর মীর আবদুল হাই সংবাদ নিতে গমন করেন এবং তিনিই ফিরে এসে আফগানদের হস্তে হিন্দালের নিহত হওয়ার শোকাবহ সংবাদটি মহামান্য সম্রাটের গোচরীভূত করেন।

শোকে অধীর হয়ে সম্রাট তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অমাত্যগণ সকলে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পান এবং গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করতে থাকেন। রাজকীয় বাহিনী অতঃপর 'বেসুত্'[৫] দুর্গে গমন করে এবং আফগানরাও নিকটবর্তী এক জঙ্গলে গিয়ে সমবেত হয়।

৪। শাহজাদা মীর্জা হিন্দাল ৯৫৮ হিজরী সনে আফগান আক্রমণকারীদের হস্তে নিহত হন।

৫। 'আকবর-নামা' গ্রন্থে এ দুর্গের নাম 'বেহ্সুদ্' লেখা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ নামটাই সঠিক। (আকবর-নামা, ৩১৪ পৃঃ ও আরস্কিন ৪০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

আফগানদের উপর বিরাট বিজয় এবং সম্রাটের আদেশে কামরানকে অন্ধ ক'রে দেওয়া হয়

অমাত্যগণ ও অন্যান্য লোকেরা সম্রাটের কাছে এসে নিবেদন করলেন—"আমরা দুর্গের ভেতরে রয়েছি, আর আফগানরা বাইরের উন্মুক্ত ময়দানে বেপরওয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ অবস্থা অসহ্য! আমরা যদি এদের আক্রমণ করি, তা' হলে ভাবনার কোন কারণ নেই।" এসব কথা শুনে সম্রাট প্রস্তাব করলেন—"আগে একজন সুচতুর গুপ্তচর প্রেরণ ক'রে আফগানদের প্রস্তুতি, তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হোক এবং তারপরই আমরা নিজেদের কর্তব্য স্থির করব।" সম্রাটের প্রস্তাব মতো জনৈক গুপ্তচরকে আফগানদের নিকটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। উক্ত গুপ্তচর খোঁজ-খবর নিয়ে এসে জানাল যে, আফগানরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে বেশ আস্থাশীল। তাদের বিভিন্ন উপজাতি মীর্জা কামরানকে এক সপ্তাহ করে নিজেদের কাছে রাখছে এবং এভাবেই মীর্জার দিন কাটছে। গুপ্তচর কর্তৃক আনীত এ সব তথ্য শুক্রবার দিন জানা গেল। সম্রাট, শাহজাদা জালালুদ্দীন আকবর ও শাহ আবুল মা'লা গোসল করে জো'মার নামাজ আদায় করলেন এবং অতঃপর আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযানে নির্গত হওয়া গেল।

শনিবার দিন প্রাতে রাজকীয় বাহিনী বিরাট বিজয়ের অধিকারী হলো। শত্রুদলের নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় বারো হাজার লোককে বন্দী করা হলো এবং প্রায় তিন লক্ষ মহিষ, গরু ও ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুও হাতে এসে গেল। মহামান্য বাদশাহ বন্দী নারীদের মুক্তিদানের আদেশ দিলেন। এর পর বিজয়-গর্বে গরীয়ান সম্রাট কাবুলে ফিরে এলেন। পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে মীর্জা কামরান হিন্দুস্তানে পলায়ন করে ইসলাম খান সুর-এর কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

বিজয়ী বাদশাহ অতঃপর একটি অনুষ্ঠানে সকল অমাত্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাওয়াত করে পদমর্যাদা অনুযায়ী সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। হিন্দুস্তানে অভিযানের বিষয় সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে প্রাথমিকভাবে স্থির করা হলো যে, আগে কান্দাহারে গমন করে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা হবে। কিন্তু

ইতিমধ্যেই গাখারের সুলতান আদমের কাছ থেকে এক লিপি এসে পৌঁছাল। উক্ত পত্র মারফত সুলতান আদম এ সংবাদই জ্ঞাপন করলেন যে, মীর্জা কামরান তাঁর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছেন এবং যথা-সম্ভব শীঘ্র সম্রাটের সেখানে গমন করা উচিত।

সুলতান আদমের পত্র পেয়ে সম্রাট অগৌণে যাত্রা করলেন এবং 'বাঙ্গাশ'[১] নামক স্থানে উপনীত হয়ে জানতে পারলেন যে, শেখ মাদনী নামে[২] পরিচিত এক ব্যক্তি বাঙ্গাশ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণকে প্ররোচিত করে নিজস্ব এক রাজ্য গড়ে তোলার প্রয়াসে নিয়োজিত রয়েছে। এ ব্যক্তিকে শায়েস্তা করার জন্যে সম্রাট কতিপয় সেনানীকে প্রেরণ করলেন। প্রেরিত সেনাদল লোকটির পরিবারবর্গকে বন্দী করে নিয়ে এলো এবং সে নিজে 'দাহানকোটের' দিকে পালিয়ে গেল। বাদশাহ এর পর নিলাব নদার (সিন্ধু) তীরে এসে পৌঁছালেন এবং দড়ির সেতুর সাহায্যে নদী পার হয়ে সুলতান আদমের এলাকায় উপনীত হলেন।

সুলতান আদমের বাসস্থান থেকে দশ ক্রোশ দূরে থাকতেই সুলতানের এক দূত সম্রাটের নিকটে এসে জানাল যে, রাজকীয় দল অতি-দ্রুত এসে গিয়েছে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় 'বায়েরওয়ালা' নামক স্থানের নিকটে পৌঁছে মীর্জা কামরানের সহিত মিলিত হওয়ার জন্যে সম্রাট এক সামিয়ানা খাটানোর আদেশ দিলেন। এ-সময় মধ্যবর্তী দূত এসে সংবাদ দিল যে, মীর্জা কামরান সম্রাটকে আগে তাঁর ওখানে গমন করার জন্যে অনুরোধ করেছেন। এ-কথায় বিস্মিত হয়ে সম্রাট বল্লেন যে, মীর্জার সহিত সাক্ষাতের জন্যে একটি স্থান নির্বাচিত করে সেখানে সামিয়ানা পর্যন্ত খাটানো হয়েছে; এখন মীর্জার এরূপ টাল-বাহানার হেতু প্রকৃতই দুর্বোধ্য! যাহোক, অনেক বিবেচনা করে সম্রাট আরো কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে একটি স্থান মনোনীত করলেন। এখানেও 'ধারণ' ও 'ভুবন' নামক দু'জন হিন্দু মীর্জা কামরানের পক্ষ থেকে এসে নিবেদন করল যে, মীর্জা সম্রাটকে আরো অগ্রসর হওয়ার জন্যে অনুরোধ করছেন। সম্রাট এদের জানালেন যে, মগরেবের নামাজের পর তিনি অগ্রসর হবেন। ইতিমধ্যে কারা বাহাদুর, শাহজাদা এবং সুলতান আদম তাঁদের লোক-জন নিয়ে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হলেন। নামাজ পড়ার পর সম্রাট পালঙ্কে উপবেশন করলেন এবং কারা-বাহাদুর ও সুলতান আদম অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

১। 'বাঙ্গাশ'—আরস্কিনের History of India, ২য় খণ্ড, ৪০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
২। আরস্কিন এ ব্যক্তির নাম 'শেখ মজহাবী' বলে উল্লেখ করেছেন।

সুলতান আদমকে উদ্দেশ করে সম্রাট মন্তব্য করলেন যে, মনে হচ্ছে তিনি যেন সব ব্যাপার গোলমেলে করে ফেলেছেন। সুলতান জানালেন যে, সিন্ধু-নদের তীরে উপস্থিত হয়ে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছাই তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর বাসস্থানে অপর এক মেহ্‌মান রয়েছেন বলেই তা' সম্ভবপর হয় নি। সুলতানের কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরে সম্রাট সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সুলতান তখন নিবেদন করলেন যে, মীর্জা কামরান সম্রাটকে আরো এগিয়ে যাওয়ার অনুরোধ পেশ করেছেন। সুলতানের এ কথায় সম্রাটের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হলো। কিন্তু সুলতান জানালের যে, কামরান মীর্জা তাঁর হাতে বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। সুতরাং বিনা-দ্বিধায় সম্রাট এগোতে পারেন। সম্রাট তখন আরো এগিয়ে গিয়ে নদীর তীরে শিবির স্থাপন করলেন।

রাত প্রায় দু'ঘণ্টা অতীত হওয়ার পর মীর্জা কামরান এসে নত-মস্তকে সম্রাটের সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করে বাদশাহ তাঁকে নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। মীর্জা পালঙ্কের উপর বালিশ টেনে নিয়ে সম্রাটের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। সম্রাটের বাম পার্শ্বে ছিলেন শাহজাদা মুহাম্মদ আকবর এবং তাঁর সম্মুখে আসন গ্রহণ করলেন শাহ আবুল মা'লা, তর্জী বেগ, সুলতান আদম ও মোনায়েম খান। মীর্জা কামরান সম্রাটকে জানালেন যে, মাহমুদ খান নিয়াজী, সুলতান শা'র পুত্র কামালী খান, ইসলাম খান নিয়াজী এবং সুলতান আদমের পুত্র লশকরী মহামান্য সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পূর্ব দিনই এসে উপস্থিত হয়েছেন। একথা শুনে বাদশাহ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুলতান আদমের প্রতি তাকালে সুলতান বল্লেন—"সম্রাট এত দূর থেকে এসেছেন, অথচ আপনার চরণে আনুগত্য নিবেদনের সুযোগ এরা এখনো পায় নি, এটা এদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।" এ-কথার পর সুলতান আদম একজন লোককে পাঠালে উক্ত ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে সম্রাটের পদচুম্বন করে চলে গেল। অতঃপর একে একে এলেন মাহমুদ খান নিয়াজী, কামালী খান, ইসলাম খান নিয়াজী ও সুলতান আদমের পুত্র লশকরী খান। এঁরা সকলেই মহামান্য বাদশার চরণে ভক্তি নিবেদন করে আসন গ্রহণ করলেন।

সম্রাট অতঃপর বল্লেন যে, যেখানে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে সেখানেই সকলের যাওয়া উচিত। হঠাৎ সম্রাট জিজ্ঞেস করে বসলেন—"এখানে পান পাওয়া যাবে কি?" সম্রাটের এ-কথা শোনা মাত্র সুলতানের পুত্র লশকরী বেরিয়ে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই বারো খিলি পান নিয়ে ফিরে এলেন। সম্রাট নিজে এক খিলি পান খেয়ে অবশিষ্ট এগারো খিলি এগারো জন অমাত্যের মধ্যে বিতরণ

করলেন এবং লশকরীকে তাঁর কৃতিত্বের জন্যে ধন্যবাদ প্রদান করলেন। এর পর অশ্বে আরোহণ করে সম্রাট সেই জায়গায় যাওয়ার জন্যে তৈরী হলেন যেখানে সামিয়ানা খাঁটানো হয়েছে। সম্রাট সেখানে উপনীত হওয়ার পর রাজকীয় দরবার শুরু হলো। সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞরা মজলিসে গান-বাজনার অনুষ্ঠান করল। সারা রাত এরূপ আনন্দোৎসবের মধ্যে অতিবাহিত হলো। প্রভাতে ফজরের নামাজের পর সম্রাট শুয়ে পড়লেন এবং মীর্জা কামরানও তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট বাসস্থানে চলে গেলেন। জোহরের নামাজের পর আহারের ব্যবস্থা করা হলো। পরবর্তী রাত্রেও উৎসব-আনন্দের অনুষ্ঠান পূর্ব রাত্রির মতোই অব্যাহত রইল। পরের দিন অমাত্যদের মধ্যে কেউ কেউ মীর্জা কামরানের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করার কথা সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। সম্রাট তাঁদের জানালেন যে, সুলতান আদমকে খেলাত বিতরণের পরই যা হয় করা যাবে।

তৃতীয় দিন সুলতান আদমকে সম্মানসূচক 'খেলাত' দ্বারা ভূষিত করা হলো। রাজকীয় প্রতীক-চিহ্ন 'নিশান' ও 'নাকারা' প্রদান করেও মহামান্য সম্রাট তাঁকে বিশেষ সম্মানের অধিকারী করলেন।

চতুর্থ দিন সম্রাট মীর্জা কামরানের ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। প্রথমেই কামরানের ব্যক্তিগত ভৃত্য ও কর্মচারীদের তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো। অতঃপর খঞ্জর বেগ, আরেফ বেগ, আলী দোস্ত, সেয়দী মুহাম্মদ বিকনাহ এবং এ অধম জওহরকে মীর্জা কামরানের কাছে গিয়ে কাজ করার জন্যে প্রেরণ করা হলো। আমাকে (জওহর) আহ্বান করে কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে মহামান্য সম্রাট নির্দেশ দিলেন যে, তাঁবুর ভেতরে মীর্জা কামরানের সব কাজই আমাকে সম্পাদন করতে হবে। সম্রাটের এ নির্দেশ মোতাবেক মীর্জার তাঁবুতে গমন করার পর প্রথমেই তিনি (মীর্জা কামরান) আমাকে জায়নামাজ এনে দিবার আদেশ দিলেন। আদেশ মতো আমি অগৌণে তাঁকে জায়নামাজ এনে দিলে পর তিনি নামাজ আদায় করলেন। এর পর মীর্জা আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং কত বৎসর যাবত আমি সম্রাটের ব্যক্তিগত ভৃত্যরূপে কাজ করে এসেছি, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করলেন। নিজের নাম বলে আমি জানালাম যে, উনিশ বৎসর যাবত[৩] সম্রাটের খেদমত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কোন সময়ে মীর্জা আসকরীর অধীনে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে কিনা,

---

৩। জওহর বর্ণিত এ ঘটনা ৯৬০ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে, ৯৪১ হিজরী সন থেকে তিনি সম্রাট হুমায়ুনের ব্যক্তিগত ভৃত্যরূপে কাজ করেছেন।

মীর্জা কামরান তাও জানতে চাইলেন। আমি জানালাম যে, মীর্জা আসকরীর অধীনে আমি কখনো কাজ করি নি'; জালাল নামক অপর এক ব্যক্তিই আসকরীর ভৃত্যরূপে বরাবর কাজ করে এসেছে। মীর্জা অতঃপর আমাকে বল্লেন যে, ৯৬০ হিজরী সনে রমজানের কতিপয় রোজা তাঁর কাজা হয়েছিল; তাঁর পক্ষ থেকে সে সব কাজা রোজার পরিবর্তে উপবাস-ব্রত সম্পাদনে আমি সম্মত আছি কি না। উত্তরে বিনীতভাবে আমি নিবেদন করলাম যে, মীর্জার পক্ষ থেকে কা'জা রোজা সম্পাদনে আমার কোন আপত্তি নেই; কিন্তু এ কা'জা রোজা স্বয়ং মীর্জাকেই যে সম্পাদন করা উচিত, আমি তাঁকে সে-কথাও স্মরণ করিয়ে দিলাম। সকল দুর্বলতা পরিহার করে মনে সাহস সঞ্চয় করতেও আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম।

এর পর মীর্জা এ অধমকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁকে হত্যা করার কথা হচ্ছে, এরূপ কোন বিষয় আমি শুনেছি কি? উত্তরে আমি নিবেদন করলাম—"মহামান্য বাদশাহ রাজকীয় চরিত্রের অধিকারী। নিজের বিচার-বুদ্ধি মতো আমি শুধু এ-কথাই বলতে পারি যে, কোন লোকই স্বেচ্ছায় নিজের হাত ভেঙ্গে দিতে পারে না; আর সম্রাট হুমায়ুন তো বিশেষ সুবিবেচক ব্যক্তি।"

এভাবেই রাত কেটে গেল এবং প্রাতে রাজকীয় দল হিন্দুস্তানে অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মীর্জা কামরান সম্পর্কে এ সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো যে, তাঁকে অন্ধ করে দেওয়া হবে। এরূপ আদেশ দিয়ে সম্রাট হিন্দুস্তানের পথে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর এ আদেশ কার্যকরী করার জন্যে কোন ব্যক্তিই কামরানের চোখে অস্ত্র-প্রয়োগ করতে সহজে রাজী হলো না। সুতরাং কাজের উপযোগী লোক বের করার প্রয়াস পাওয়া হলো। আলী-দোস্ত আয়শেক আকাকে এ কাজটি সম্পাদনের জন্যে সুলতান আলী বখ্‌শ অনুরোধ করল। আলী-দোস্ত উত্তরে জানাল "সম্রাটের আদেশ ব্যতীত এ ধরনের কঠোর কর্তব্য কেউ সম্পাদন করতে পারে না। পরে যদি সম্রাট জিজ্ঞেস করেন—কার হুকুমে এ কাজ করা হয়েছে, তা' হলে কি জওয়াব দেব আমি?" দু'জনের মধ্যে যখন এরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন আমি (জওহর) সম্রাটের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে কথা উত্থাপনের প্রস্তাব করলাম। আলী-দোস্ত নিজেও সম্রাটের কাছে গিয়ে তুর্কী ভাষায় নিবেদন করল যে, ভৃত্যদের মধ্যে কেউ মীর্জা কামরানের চোখে অস্ত্র প্রয়োগ করতে রাজী হচ্ছে না। আলী-দোস্তের কথায় বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে তুর্কী ভাষায়ই তাকে ভর্ৎসনা করে নির্দেশ দিলেন—"যেরূপ হুকুম দেওয়া হয়েছে, তোমরা সে-মতে কাজ কর গিয়ে।"

সম্রাটের এ পরিষ্কার নির্দেশের পর ভৃত্যরা মীর্জা কামরানের নিকটে গমন করল। মীর্জাকে সম্বোধন করে গোলাম আলী বল্ল—"সম্রাটের আদেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং আপনার চোখে আমাদের অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে।" গোলাম আলীর এ-কথার পর মীর্জা বলে উঠলেন—"আমাকে এভাবে অন্ধ না করে তোমরা বরং মেরে ফেল।" গোলাম আলী শুধু বল্ল—"আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আপনাকে মারতে পারে না।"

এর পর ভৃত্যরা মীর্জা কামরানকে ধরে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এলো এবং মাটীতে শুইয়ে তাঁর চোখে অস্ত্র প্রয়োগ করল। মীর্জা ধৈর্য সহকারে নীরবে সব সহ্য করে নিলেন। কুর্দী বেওদার এর পর মীর্জার উৎপাটিত চোখ-গহ্বরে লেবুর রস ঢেলে দিল। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে কামরান তখন বলে উঠলেন—"হে খোদা, দুনিয়ায় যত কিছু অন্যায় আমি করেছি, তার সাজা পেয়ে গেলাম। আখেরাতে তোমার ক্ষমারই কামনা রইল।"

মীর্জা কামরানকে অতঃপর অশ্বে আরোহণ করিয়ে সেনাদলের অবস্থান-স্থলে নিয়ে যাওয়া হলো। নিকটেই সুলতান ফিরোজ শাহের আমলের একটা উদ্যান ছিল। গরম হাওয়া বইতে থাকায় সে উদ্যানে গিয়েই সেনাদল শিবির সংস্থাপন করেছিল। সেখানে এক তাঁবুর সম্মুখে মীর্জাকে অশ্ব থেকে নামিয়ে নেওয়া হলো। চোখের যন্ত্রণায় তিনি তখন অত্যন্ত অধীরতা প্রকাশ করছিলেন। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে এ অধম ভৃত্য (জওহর) নিজের তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। আলী-দোস্ত, সুলতান বারবেগী, গোলাম আলী দারোগা এবং এ লেখক অশ্বে আরোহণ করে অতঃপর সম্রাটের সম্মুখে গিয়ে নত-মস্তকে দণ্ডায়মান হলো। হঠাৎ সম্রাটের দৃষ্টি এ গোলামের (জওহর) উপর পতিত হলে তিনি জান মুহাম্মদ কেতাবদারকে হুকুম দিলেন—যে কাজ সম্পাদনের ভার আমাদের উপর অর্পিত হয়েছিল, সে কাজ সমাধা হয়েছে কি না, তা' যেন সে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। আমি (জওহর) তখন নিবেদন করলাম যে, সব কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই নিষ্পন্ন হয়েছে।

রাজকীয় বাহিনী এর পর আবার যাত্রা শুরু করল এবং পীরানা জানোর [৪] এলাকায় গিয়ে উপনীত হলো। পীরানা স্বয়ং সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তাঁর সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্যে সুলতান আদমকে সম্রাট নির্দেশ দিলেন।

৪। জানোর—ভিরা এলাকার একটি উপজাতি। পীরানা ছিলেন এ উপজাতির সরদার। (আরস্কিন, ২য় খণ্ড, ৪১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

করসাক নামক স্থানে রাজকীয় বাহিনী উপস্থিত হলে পর প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম থেকে আগত এক দল লোক সম্মুখে উপস্থিত হলো। সম্রাট এদের উপর আক্রমণ করার আদেশ দিলেন। আক্রান্ত হয়ে এসব লোককে সহজেই পরাজয় বরণ করতে হলো এবং তাদের মধ্যে বহু লোক বন্দীও হলো। সম্রাট আদেশ দিলেন যে, মুক্তি-পণ স্বরূপ প্রত্যেকটি বন্দীর কাছ থেকে অর্থ আদায় করেই যেন এদের একে একে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ মুক্তি-পণের অর্থে সেনাদলের সকল সৈনিকই লাভবান হলো।

মহামান্য সম্রাট এর পর কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু অমাত্যদের সকলেই সম্মিলিতভাবে মত প্রকাশ করলেন যে, কাশ্মীর গমনের উপযুক্ত সময় এটা নয়। কিন্তু সম্রাট তাঁদের পরামর্শ মানতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে অমাত্যরা শেষে সুলতান আদমের শরণাপন্ন হলেন। সুলতান সম্রাটের পাদস্পর্শ করে তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন যে, কাশ্মীর গমনের প্রস্তাব স্থগিত রাখা হোক। সম্রাটকে এ-কথাও জানানো হলো যে, ইসলাম খান সেদিকে গমনের উদ্যোগ করেছেন। তা' ছাড়া, যেসব আফগান রোহতাস দুর্গ ছেড়ে চেনাব নদী পেরিয়ে গিয়েছিল, আবার যদি তারা সে নদীর তীরে এসে হাজীর হয়, তা হলে সম্রাটের পক্ষে কাবুল ও কান্দাহারের দিকে প্রস্থান করাই সঙ্গত হবে। সেখানে গিয়ে খান-খানান বৈরাম খানকে সঙ্গে নিয়ে নূতন ভাবে হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হলে এক দিক দিয়ে হিন্দুস্তান বিজয় যেমন সম্ভবপর হবে, তেমনি কাশ্মীরও হাতে এসে যাবে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্রাটের কাবুল ও কান্দাহারের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং কামরানকে মক্কায় গমনের অনুমতি দান

মহামান্য সম্রাট যখন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন, সুলতান আদম এসে নিবেদন করলেন যে, সম্রাটের সেনাদলের উপস্থিতির ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং সেনাদলের প্রস্থানের পর এখানে বিদ্রোহ দেখা দেওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। বাদশাহ রোহতাস দুর্গ অবরোধ করার উদ্দেশ্যে গমন করছেন, এরূপ ঘোষণা প্রচারের পর যদি সেনাদল স্থান ত্যাগ করে, তা' হলে স্বভাবতঃই লোকের মনে ভয়ের ভাব বিদ্যমান থাকবে এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের বাসস্থানে বসবাস করতে বাধ্য হবে বলে সুলতান অভিমত প্রকাশ করলেন। সুলতানের এ পরামর্শ মতো ঘোষণা প্রচার করা হলো এবং অতঃপর রাজকীয় বাহিনী যাত্রারম্ভ করে সিন্ধু-নদের তীরে এসে উপস্থিত হলো। এখানে মীর্জা কামরানকে পবিত্র ভূমি মক্কায় গমনের জন্যে অনুমতি দেওয়া হলো।[১]

রাজকীয় বাহিনী এর পর পেশাওরে এসে পৌঁছালে সম্রাট এ জায়গায় একটা দুর্গ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অমাত্যগণ কিন্তু সম্রাটের এ প্রস্তাবেরও বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন। অমাত্যদের এবম্বিধ আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট মন্তব্য করলেন—"আমি যখন কাশ্মীরে যেতে চেয়েছিলাম, তখনো তোমরা আমার বিরোধিতা করেছিলে; আর আজকেও এখানে দুর্গ স্থাপনের ব্যাপারে তোমরা বিরোধিতা করতে এগিয়ে এসেছে। এ সত্যি দুঃখের কথা!" সম্রাট যেদিন পেশাওরে উপনীত হলেন, সেদিনই দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করা হলো।[২] সাত দিনের মধ্যেই দুর্গ তৈরী হয়ে গেল এবং জোমার দিন সেখানে সম্রাটের নামে খোৎবাহ পাঠ করা হলো। সেকেন্দার খান উজবেককে শিরোপা দিয়ে সম্মানিত করে তাঁর উপরই দুর্গের ভার প্রদান করা হলো। এর পর ক্রমান্বয়ে পথ চলে রাজকীয় বাহিনী অবশেষে কাবুলে গিয়ে পৌঁছাল।

১। স্যার রিচার্ড বার্ণ Cambridge History of India (Vol. IV, page 43) গ্রন্থে লিখেছেন—"Abandoned by all his nearest friends but accompanied by a faithful wife, Kamran travelled to Sind and thence to Mecca, where he died (1557).

২। বায়েজিদের গ্রন্থে পেশাওরের নাম 'বাকডাম' বলে উল্লেখিত হয়েছে। আরস্কিনও লিখেছেন যে, 'বাকরাম' নামক স্থানে যে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই বর্তমানে পেশাওর নামে পরিচিত হচ্ছে। (বায়েজিদ, ১৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

কাবুলে উপনীত হওয়ার পর বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে নওরোজের উৎসব অনুষ্ঠিত হলো এবং অতঃপর সম্রাট কান্দাহার রওয়ানা হলেন। তিন মাস কাল কান্দাহারে কাটিয়ে তিনি আবার কাবুলে ফিরে এলেন। খান-খানান বৈরাম খান কান্দাহার ও গজনীর মধ্যবর্তী 'তারনাক' নদী পর্যন্ত সম্রাটের সহিত এসে আবার কান্দাহারে ফিরে যান। তাঁকে বলে দেওয়া হয় যে, শীত ঋতুর পরে তিনি যেন কাবুলে এসে সম্রাটের সহিত মিলিত হন এবং তার পরেই ভারত-অভিযানে বহির্গত হওয়া যাবে।

হাজী মুহাম্মদ খান কোকা এ-সময়ে গজনীতে ছিলেন এবং সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্য বহুলাংশে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। পরে যখন খান-খানান বৈরাম খান কান্দাহার থেকে কাবুলে এসে সম্রাটের সহিত মিলিত হন, তখন তিনি হাজী মুহাম্মদকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। কিন্তু হাজী পলায়ন করে আবার গজনীতে চলে যান। শেষে মহামান্য বাদশাহ নানাভাবে আশ্বস্ত করে হাজীকে পুনরায় নিজের কাছে আনয়ন করতে সমর্থ হন। কিন্তু এর পরও সম্রাটের সহিত হাজী মুহাম্মদের প্রকৃত মনের মিল সম্ভবপর হলো না। সম্রাট তখন হাজী মুহাম্মদ ও তাঁর ভ্রাতা শাহ মুহাম্মদকে বন্দী করার আদেশ দেন।

বন্দী হাজী মুহাম্মদকে সম্রাট বলেন যে, তিনি এ-যাবত বাদশা'র সেবায় যেসব কাজ করেছেন, তার একটা তালিকা তিনি তৈরী করুন এবং যেসব দুশমনীর কাজ তিনি করেছেন, তার তালিকা সম্রাট নিজে তৈরী করবেন। যদি সেবার তালিকা দুশমনীর তালিকা থেকে দীর্ঘতর হয়, তা' হলে সম্রাট তাঁর সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু অপরাধের তালিকা দীর্ঘতর হলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড বরণ করে নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত হাজী ও তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করার নির্দেশই প্রদান করা হয়।[৩]

কাবুলে অবস্থানের সময় মহামান্য সম্রাট প্রায়ই নিকটবর্তী নানা জায়গায় ভ্রমণ করতেন। এতদ্ব্যতীত সমরকন্দ, বোখারা ও অন্যান্য বহু স্থানের ভাগ্যান্বেষী বীরদের প্রতিও তিনি পত্রাদি লিখে ভারত অভিযানে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্যে অনুরোধ করে পাঠান। অনেক সামন্তকে উপহারাদি প্রেরণ করেও তিনি হিন্দুস্তানের আসন্ন অভিযানে তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান।

৩। মনে হয় জওহর এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ঘটনা-প্রবাহের ধারাবাহিকতায় ভুল করে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাজী মুহম্মদ খান ও তাঁর ভ্রাতাকে আরো কিছু দিন আগেই হত্যা করা হয়েছিল। (আরস্কিনের History of India, Vol. II, page 399-400 দ্রষ্টব্য)।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হুমায়ুনের হিন্দুস্তানের পথে অভিযান ও পাঞ্জাব বিজয়

হিন্দুস্তানে অভিযানের সঙ্কল্প করে মহামান্য সম্রাট কাবুল থেকে অশ্বারোহণে জালালাবাদ পর্যন্ত আগমন করলেন এবং অতঃপর নদীপথে বেশ আরামে পেশাওরে এসে পৌঁছালেন। এখানে দু'দিন অবস্থান করে সুলতান আদমের প্রতি এক ফরমান পাঠিয়ে হিন্দুস্তানে অভিযানের কথা জানিয়ে দিলেন। এর পর নিয়মিতভাবে পথ চলে কয়েক দিন পর রাজকীয় বাহিনী সিন্ধু-নদের তীরে এসে উপনীত হলো। এখানে যে-সময়ে সম্রাট নদী পার হলেন, ঠিক সে-সময়েই দ্বিতীয়ার নূতন চাঁদ আকাশে দৃষ্টিগোচর হলো। এ অধম লেখক জওহর তখন সম্রাটকে অভিনন্দিত করে বলে উঠল—"হে শাহানশাহ, নদী পার হয়ে হিন্দুস্তানের মাটীতে পা' রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই নূতন চাঁদের উদয় আপনার সৌভাগ্যেরই ইঙ্গিত প্রদান করছে। হিন্দুস্তানে আপনার যাত্রা জয়যুক্ত হোক।" আমার এ অভিনন্দন-বাণীর উত্তরে সম্রাট তিনবার 'ইনশাল্লাহ' শব্দ উচচারণ করলেন।

রাজকীয় কাফেলা অতঃপর পুনরায় যাত্রারম্ভ করে 'বারহালা' নামক স্থানে এসে শিবির সন্নিবেশ করল। সম্রাট এ স্থানে আমাকে (জওহর) আদেশ করলেন যে, শাহজাদাকে গোসল করাবার পর পোশাক পরিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হোক। আদেশ মতো আমি যখন শাহজাদার নিকটে গমন করে তাঁকে সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করলাম, তিনি তখন আমার সম্মুখে গোসল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলে উঠলেন—"তোমার সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে আমার লজ্জা লাগবে।" আমি তখন শাহজাদার নিজস্ব ভৃত্য রফিককে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। রফিক তাঁকে গোসল করাল এবং কাপড়ও পরিয়ে দিল। অতঃপর আমিই (জওহর) শাহজাদাকে সম্রাটের নিকটে নিয়ে গেলাম। সম্রাট নিজে পশ্চিম দিকে মুখ করে উপবেশন করলেন এবং শাহজাদাকে তাঁর সম্মুখে বসিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে মনে কিছু আবৃত্তি করে তাঁর চোখে-মুখে ফুঁ দিতে লাগলেন। মনে হলো—সম্রাট যেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে সুখ-সৌভাগ্যের অবদানে ধন্য করে দিচ্ছেন।

বারহালা থেকে চার ক্রোশ দূরে গিয়ে আবার শিবির সংস্থাপন করা হলো এবং কাফেলার সকল লোককে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড় করিয়ে সম্রাট তাদের পরিদর্শন

করলেন। দলের পানি বহনকারী সকল আফতাবচীকেও এরূপ পরিদর্শনের জন্যে উপস্থিত হতে হবে বলে মুহাম্মদ হোসেন (লস্কর খান নামেই পরিচিত) এসে আমাদের জানালেন। সুতরাং আমি জওহর, মেহতের সাবিহ্, তৌফিক এবং আরো কতিপয় পানি-বহনকারী অস্ত্র ধারণ করে সামরিক কায়দায় গিয়ে দণ্ডায়মান হলাম। সম্রাট এসে আমাদের পরিদর্শন করে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন। অন্যান্যদেরও অনুরূপভাবেই পরিদর্শন করা হলো।

এর পর পুনরায় যাত্রা করে কাফেলা কয়েক দিন পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে চেনাব নদীর তীরে এসে পৌঁছাল। নদীতীরে উপনীত হওয়ার চার ক্রোশ আগে একটা উচচ ভূখণ্ডের প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি সেখানেই শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। কতিপয় সেনানীকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে মহামান্য সম্রাট এখানেই আদেশ জারী করলেন। খান-খানান বৈরাম খান, সেকেন্দার খান উজবেক, তর্জী বেগ খান, লাল বেগ এবং সুলতানের কতিপয় আমীরকে আদেশ দিলেন যে, পর্বতের পাদদেশের আশে-পাশের স্থানগুলি পর্যবেক্ষণ করতে করতে তাঁদের জলন্ধর পর্যন্ত যেতে হবে এবং পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় আফগানরা রয়েছে কি না, তারও সন্ধান নিতে হবে। সম্রাটকে এ বিষয়ে যথাযথ সংবাদ প্রেরণের জন্যেও তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়। পথিমধ্যে কোথাও আফগানদের সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলে সেনানীগণকে শতদ্রু নদী পেরিয়ে সিরহিন্দ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার আদেশও প্রদান করা হয়।

মীর মুনশী শাহাব খান, ফরহাদ খান ওরফে মেহতের সাখাই [১], তোষাখানার দারোগা মেহতের সাবিহ আফতাবচী এবং কতিপয় লোককে লাহোর গমনের আদেশ দিয়ে বিদায় করা হলো। এ-সময়ে বারিয়া আবদার এসে সম্রাটের কাছে নিবেদন করল যে, তার পরিবারবর্গ লাহোরে রয়েছে। সম্রাট যদি অনুমতি প্রদান করেন, তা' হলে সেখানে গিয়ে সে তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে আসতে পারে। সম্রাট তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তার অবর্তমানে পানির বোঝা বইবে কে? খাজা সুলতান আলী তখন সম্রাটকে জানালেন যে, বারিয়ার ভাই ফতেহ্উল্লাহ তার পরিবর্তে পানির বোঝা বহন করবে। এ ব্যবস্থায় সম্রাট সম্মত হলেন না; কিন্তু বারিয়াকে লাহোর গমনের অনুমতি দিয়ে তার কাজের ভার এ অধম জওহরকে প্রদান করলেন। বারিয়া লাহোরের পথে রওয়ানা হয়ে চলে গেল। কিন্তু এক

১। এ ব্যক্তির প্রকৃত নাম মেহ্তের সাখাই। পরে লাহোরের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করে সম্রাট তাঁকে 'ফরহাদ খান' উপাধি প্রদান করেন। (তাওয়ারিখে হুমায়ুন ও আকবর, ১৯২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

রাত পরেই চাকরী হারাবার ভয়ে সে আবার ফিরে এল। এবার সম্রাট তাকে খাবার পানির পাত্র-বাহকের দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

এক্ষণে আমি (জওহর) ব্যক্তিগত একটা ঘটনা বর্ণনা করব। এক রাত পরেই বারিয়া যখন ফিরে এলো, সে আমার কাছে এসে পানির বোঝা ফেরত চাইল। নির্বুদ্ধিতা বশতঃ আমি তার বোঝা বিনা-আপত্তিতেই তাকে ফিরিয়ে দিলাম। যাত্রা করবার সময় বারিয়া যখন সে বোঝা নিয়ে অগ্রসর হলো, সম্রাট তা' লক্ষ্য করলেন এবং মনে-মনে কতকটা অসন্তুষ্টও হলেন। পরে ওজু করার জন্যে যখন তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন, আমার গালে এক চপেটাঘাত করেই ভর্ৎসনা করতে করতে বলে উঠলেন—"তোমায় যে কাজের দায়িত্ব আমি প্রদান করেছিলাম, সে কাজ তুমি ফিরিয়ে দিলে কেন?" সম্রাটের এ প্রশ্নের কোন সদুত্তরই আমার কাছে ছিল না। নিজের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করে নিয়েই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

যেসব সেনানীকে সম্রাট জলন্ধরের দিকে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা মাছিওয়াড়া নামক স্থানে শতদ্রু নদী পার হয়ে সিরহিন্দে গিয়ে পৌঁছালেন এবং সেখানকার সামন্ত-সরদার তাতার খান কাশীর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করে হস্তগত করলেন।[২] সম্রাট ইতিমধ্যে কালানুর নামক জায়গায় উপনীত হয়ে সেখানেই কয়েক দিন অবস্থান করলেন। শাহ আবুল মা'লার সহিত পরামর্শ করে সম্রাট পার্বত্য এলাকায় অভিযান পরিচালনার মতলব করলেন। আমীরদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু এরূপ অভিযানের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সাহস করে কেউ সম্রাটকে একথা বলতে পারলেন না। তাঁরা এ অধম গোলামকে (জওহর) সম্রাটের সম্মুখে এ-বিষয়ে কথা উত্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। এক সময়ে সুযোগ বুঝে আমি সম্রাটের সম্মুখে যখন অধিকাংশ আমীরের অভিমত প্রকাশ করলাম, তিনি বিশেষ আপত্তি উত্থাপন না করেই পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার সঙ্কল্প পরিহার করে লাহোর গমনে সম্মত হলেন।

যথা-সময়ে কাফেলা আবার রওয়ানা হলো এবং লাহোর থেকে দশ ক্রোশ দূরে পাতাবাহারী নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলো। সম্রাটের লাহোরস্থ শুভানুধ্যায়িগণ—মখদুমুল-মুল্‌ক শেখ আবদুল্লাহ্, মিঞা হাজী মাহ্‌দী প্রভৃতি—সম্রাটের সন্নিধানে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে সংবাদ পাঠালেন এবং অন্যান্য আরো

২। সম্রাট হুমায়ুনের পাঞ্জাব বিজয়ের বিবরণ জওহর অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আকবর-নামা, তাবাকাতে-আকবরী প্রভৃতি ইতিহাস-গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। (তাবাকাতে-আকবরী, ২২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

অনেকে জানালেন যে, মখ্‌দুমুল-মুল্‌কের সহিত তাঁদের মতানৈক্য রয়েছে বলে এক সঙ্গে বাদশাহ মহোদয়ের খেদমতে উপস্থিত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। সম্রাট এদের লিখে জানালেন যে, সকল মতানৈক্য দূর করে সখ্য ও সম্প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই তিনি এসেছেন। যাহোক, প্রথমে জনাব মখ্‌দুমুল-মুল্‌ক তাঁর লোকজনসহ সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। বিশেষ সম্মানের সহিত সম্রাট তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং আলাপ করতে লাগলেন। রুটি ও শরবৎ দ্বারা তাঁকে আপ্যায়িত করা হলো এবং তিনি অতঃপর প্রস্থান করলেন। মিঞা হাজী মাহ্‌দী এর পর সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। যে-ধরনের কথাবার্তা মখ্‌দুমুল-মুল্‌কের সহিত হয়েছিল, তাঁর সহিত অনুরূপ কথাবার্তাই হলো এবং তাঁর সম্মুখেও রুটি ও শরবৎ পানাহারের জন্যে উপস্থিত করা হলো। কিন্তু হাজী মাহ্‌দী পানাহারে অসম্মতি প্রকাশ করে বল্লেন যে, অপরের গৃহে তিনি কখনো কোন আহার্য গ্রহণ করেন না। সম্রাট হাজীকে জানালেন যে, কাবুলের গম দিয়ে রুটি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শরবতও কাবুলের তরমুজের ভেতর থেকেই বের করা হয়েছে। সুতরাং বিনা-দ্বিধায় তিনি আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি অপরের গৃহে কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেন না, এ অজুহাত দেখিয়েই হাজী সাহেব পানাহার না করেই প্রস্থান করলেন।

এখান থেকে যাত্রা করে মহামান্য সম্রাট সাড়ম্বরে লাহোরে পৌঁছালেন। শীঘ্রই স্থির করা হলো যে, পার্শ্ববর্তী পরগণাসমূহের রাজস্ব আদায় করার জন্যে বিশেষ বিশেষ কর্মচারীদের প্রেরণ করা হবে। হয়বতপুর-বিয়ানী পরগণায় এ অধম সেবক জওহরকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ইয়াকুব জরীন-কলম এ সিদ্ধান্তের কথা সম্রাটের গোচরীভূত করে আমাকে (জওহরকে) যথা-স্থানে প্রেরণের আদেশ প্রার্থনা করলেন। সম্রাট আমাকে নূতন দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অনুমতি দিলেন এবং সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে উপদেশও প্রদান করলেন।

যথা সময়ে হয়বতপুর-বিয়ানী পরগণায় গিয়ে আমি (জওহর) দেখে বিস্মিত হলাম যে, আফগানদের স্ত্রী-কন্যারা সুদখোর মহাজনদের কাছে দলে দলে বন্ধক রয়েছে এবং এমন অর্থ কোথাও নেই যাতে এদের মুক্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আফগানদের জমি থেকে শস্যাদি সংগ্রহ করে তার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ মহাজনদের প্রদান করেই আমি (জওহর) আফগান নারীদের মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। আমার এ ব্যবস্থার কথা সম্রাটের কানে গিয়ে পৌঁছালে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন

এবং ইজ্জত আফজায়ী ও নিসার খান লোদীর যে অর্থ বাজেয়াফত করা হয়েছিল, এ অধমকে পারিতোষিক স্বরূপ তা' প্রদান করা হলো।

অতঃপর উমর খান গাখারের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করা হবে। বারো হাজার অশ্বারোহী সহ তিনি সুলতানের 'জওহী' ও 'ফিরোজপুর' পরগণাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে হিন্দুস্তানের আফগানদের সহিত মিলিত হওয়ার মতলব করেছিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উমর খান গাখারের বিরুদ্ধে অভিযান ও প্রথম বিজয়

সম্রাট যখন জানতে পারলেন যে, মুহাম্মদ উমর খান গাখার 'জওহী' ও 'ফিরোজপুর' পরগণা অতিক্রম করে বিপাশা নদী বাঁয়ে রেখে হিন্দুস্তানে গমন করার জন্যে যাত্রা করেছেন, তখন তিনি স্বীয় অমাত্যবর্গের সহিত ইতিকর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। সকলে একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, এ-সময়েই তাঁকে বাধা দেওয়া উচিত। সম্রাট শাহ আবুল মা'লা, মুহাম্মদ কুলী পালাস, খান জমান, বাহাদুর খান, আল্লাহকুলী আন্দারাবী এবং আরো কতিপয় ওমরাহকে উমর খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। আদেশ মতো অমাত্যগণ অগৌণে যাত্রা করে 'জওহী' পরগনায় গিয়ে পৌঁছালেন। অপর দিক দিয়ে বারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ উমর খানও এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। সম্রাটের অমাত্যদের সঙ্গে মাত্র সাত শো অশ্বারোহী সৈনিক ছিল। উভয় পক্ষের অগ্রবর্তী সৈনিকদের মধ্যে শীঘ্রই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আফগানরা সম্মিলিত-ভাবে আবুল মা'লার বিরুদ্ধেই আক্রমণ পরিচালনা করল। তাদের এ আক্রমণ এমন তীব্র হয়ে উঠল যে, শাহ আবুল মা'লার মস্তকোপরি একই সঙ্গে শত-শত তরবারি উত্তোলিত হলো এবং তাঁকে অশ্বের উপর থেকে বিচ্যুত করারও প্রয়াস পাওয়া হলো।

কিন্তু এ সঙ্কট-ক্ষণেই তাঁর অন্যতম শিষ্য আমীর সা'দান শাহ তামাস্প সাফাভী কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় সৈনিকসহ বিরাট আল্লাহু-আকবর ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে প্রচণ্ড বিক্রমে শাহ আবুল মা'লার চতুষ্পার্শ্বে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। এ পাল্টা আক্রমণে উমর খান গাখার তাঁর অশ্ব থেকে নিম্নে পতিত হলেন এবং আফগানরা বিপর্যস্ত ও পরাজিত হয়ে পলায়নপর হলো। অনেক আফগান বাদশাহী সৈন্যদলের হস্তে বন্দীও হলো। বারো হাজার অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে মাত্র সাত শো অশ্বারোহীর এ বিজয় শুধু অভাবনীয় নয়, বিস্ময়করও বটে। আল্লাহতালার অসীম করুণাবলে এবং তাঁরই সহায়তায় সম্রাটের ভাগ্যগুণে এ বিস্ময়কর বিজয় সম্ভবপর হয়।

হিন্দুস্তানে প্রবেশের পর এটাই ছিল মহামান্য বাদশার প্রথম বিজয়। শাহ আবুল মা'লা ও তাঁর সহচর আমীরগণ এক পত্র মারফত এ মহা-বিজয়ের

শুভ-সংবাদ সম্রাটকে জ্ঞাপন করে মোবারকবাদ জানালেন। শাহ আবুল মা'লা ও আমীরগণের পত্রের উত্তরে তাঁদের অভিনন্দিত করে সম্রাট জানালেন যে, তাঁদের এ কৃতিত্ব কল্যাণেরই ইঙ্গিত বহন করছে। দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করার উপদেশ দিয়ে তিনি (সম্রাট) আমীরদের এ নির্দেশও প্রদান করলেন যে, যুদ্ধে যেসব আফগানকে বন্দী করা হয়েছে, তাদের সকলকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়।

বন্দীদের সম্পর্কে সম্রাট যে নির্দেশ দিলেন, তৎসম্পর্কে ফরহাদ খান সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ইতিপূর্বে একবার তিনি (সম্রাট) আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কোন লোককেই বন্দী করা হবে না। ফরহাদ খানের কথা শুনে সম্রাট বল্লেন—"সত্যি তো, আমার এ-কথা মনে ছিল না। যাও, সকল বন্দীকে গিয়ে মুক্ত করে দাও।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মাছিওয়াড়ার বিজয় ও সেকেন্দার স্থরের বিরুদ্ধে অভিযান

মহামান্য বাদশাহ যে সময়ে ফরহাদ খানকে বন্দীদের মুক্তিদানের আদেশ দিলেন, সে-সময়েই বৈরাম খান, সেকেন্দার খান উজবেক, লালা বেগ, শাহ কুলী নারাঞ্জী ও অন্যান্য কতিপয় অমাত্যের কাছ থেকে এক আরজ-পত্র সম্রাটের নিকটে পৌঁছাল। অমাত্যগণ জানান যে, তাতার খান কাশী, হবিব খান সুলতানী, মোবারক খানের ভ্রাতা ফতেহ খান এবং আরো যে কয়েকজন আমীর সিরহিন্দ ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাপন করে ফিরে এসেছেন। এ পত্র পাওয়ার পর সম্রাট তাঁদের লিখে জানালেন—"শাহ আবুল মা'লা অল্প-বয়স্ক লোক এবং আগে কোন দিন তিনি যুদ্ধ করেন নি'। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাত্র সাত শো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি শত্রুদের বারো হাজার সৈন্যকে পরাজিত করেছেন। এ ঘটনা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। মনে হচ্ছে, যুদ্ধের স্পৃহা যেন তোমাদের নেই।" সম্রাটের এ পত্র অমাত্যদের সাহস ও শৌর্য বাড়িয়ে দিল।

অহঙ্কারী ও উদ্ধত আফগানরা মাছিওয়াড়া নামক স্থানে শতদ্রু নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করে নদী পারাপারের ব্যবস্থা করে। তারা মনে করেছিল যুদ্ধে পরাজিত হলেও এ সেতুর উপর দিয়েই তারা পশ্চাদপসরণ করতে পারবে এবং এ সেতু-পথে অপর কাওকে যেতে দেবে না। অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য আল্লাহ পছন্দ করেন না। সম্ভবতঃ এ জন্যেই সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ-পাক সম্রাট হুমায়ুনকে সাহায্য করলেন। যেখানে আফগানরা সেতু নির্মাণ করেছিল, তার নিকটবর্তী স্থানেই সম্রাটের অমাত্যরা তাঁদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পায়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে গেলেন। আফগানরা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে আগুন লাগানোতে তারি আলোকে লক্ষ্য স্থির করে সম্রাটের সৈন্যরা আফগানদের উপর তীর নিক্ষেপ ও গুলী বর্ষণ করার সুযোগ পায়। শীঘ্রই আফগানরা পলায়ন করতে শুরু করে এবং এভাবেই মাছিওয়াড়ার যুদ্ধে সম্রাটের সেনাদল বিরাট বিজয়ের অধিকারী হয়। বিজয়ী সেনা-বাহিনী অতঃপর সিরহিন্দে এসে সমবেত হয়।[১]

১। অন্যান্য ইতিহাসে এ যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। নিজামুদ্দীন বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে বহু রণ-সম্ভার ও হস্তী মোগলদের হস্তগত হয়েছিল। (তাবাকাতে-আকবরী, ২২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মাছিওয়াড়ার এ বিজয়ের সংবাদ সম্রাটের নিকটে এসে পৌঁছায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ-বিজয়ী আমীরগণ সিরহিন্দ থেকে এক পত্র প্রেরণ করে সম্রাটকে জানালেন যে, সেকেন্দার সুর সেদিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং এ-জন্যেই ভাবী কার্যক্রম নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অপর এক পত্রে অমাত্যগণ ইহাও বিদিত করেন যে, সেকেন্দার সুর ৭০ হাজার আশ্বারোহী সেনাসহ এগিয়ে এসেছেন এবং সামান্য সাত আট শো সৈন্য নিয়ে এ বিপুল বাহিনীর মোকাবিলা করা তাঁদের (অমাত্যদের) পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এ দ্বিতীয় পত্র প্রাপ্তির পর সম্রাট অবিলম্বে অমাত্যদের জানালেন যে, দু' দিনের মধ্যেই তিনি গিয়ে তাঁদের সহিত মিলিত হবেন ; তাঁরা যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন। কোনরূপে সময়ক্ষেপ না করেই মহামান্য বাদশাহ স্বীয় সেনাদল সহ অগৌণে যাত্রা করলেন এবং মাছিওয়াড়া হয়ে সিরহিন্দে গিয়ে উপনীত হলেন। বিপরীত দিক থেকে সেকেন্দার সুরও মোকাবিলা করার জন্যে অগ্রসর হলেন। উভয় পক্ষের সেনাদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দণ্ডায়মান হলো। সেকান্দার সুর গর্ব করে এ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে বাদশাহ হুমায়ুন তাঁর সত্তর হাজার সৈন্যের সম্মুখীন হচ্ছেন, এতে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

এক্ষণে আমি (জওহর) নিজের কথা বর্ণনা করব। মীর্জা শাহ সুলতান আমীন, পাবুস খান ফৌজদার, ফরহাদ খান হাকীম. লাহোরের দেওয়ান তাতার খান ওরফে খাজা তাহের মুহাম্মদ এবং এ অধম দাস জওহর আফতাবচীকে পাঞ্জাব ও মুলতান প্রদেশের রাজস্ব-আদায়কারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে মোহমন্দ আফগানদের একটি দল উপজাতীয় কতকগুলি লোকসহ মুলতান অতিক্রম করে লাহোরের দিকে অগ্রসর হয়। এ সংবাদ লাহোরের শাসনকর্তার কাছে এসে পৌঁছায়। এসব উপজাতির উদ্দেশ্য ভালো নয় মনে করে আমি (জওহর) ফরহাদ খানের সহিত পরামর্শ করে স্থির করি যে, সম্রাট শমনদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন, এ সংবাদ যদি তাদের (উপজাতীয়দের) কর্ণগোচর হয়, তা'হলে তাদের সাহস আরো বেড়ে যাবে এবং এর ফল মোটেই ভালো হবে না। যদি কোন গোলযোগ হয়, তা'হলে তার সমগ্র দায়িত্ব ফরহাদ খান ও আমার (জওহরের) উপরই পতিত হবে ; মীর্জা শাহ সুলতান ও পাবুস খান অনায়াসেই নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারবেন। এরূপ পরিস্থিতিতে নিজেদের অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে উপজাতীয়দের আক্রমণ করাই সঙ্গত হবে এবং সম্রাটের ভাগ্যবলে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে জয়ী হতে পারব বলে আমি মত প্রকাশ করলাম। এ পরামর্শ

মোতাবেক জালাল সম্বলী নামক এক সাহসী ও বুদ্ধিমান যুবককে আক্রমণকারী দলের পরিচালক মনোনীত করা হলো এবং তার সহকারী রূপে মেহতের সবিহ্‌কে দায়িত্ব দেওয়া হলো। অতঃপর ফরহাদ খান ও আমার প্রেরিত চার শো অশ্বারোহী সৈন্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়ে গেল। রাত্রি এক প্রহর অতীত হওয়ার পর আমাদের সৈন্যদল পেছন দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে পরদিন প্রাতে আফগানদের সম্মুখীন হলো এবং তাদের অসতর্কতার সুযোগে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আপতিত হলো। সম্রাটের ভাগ্যের জোরে আমরা অতি সহজেই জয়লাভ করলাম। আফগানদের পাঁচজন সরদার আমাদের হস্তে বন্দী হলো।

এ সংবাদ সম্রাটের কাছে পৌঁছালে পর তিনি মন্তব্য করলেন—"আমার ভৃত্যদের এ বিজয় ভবিষ্যতের বৃহত্তর বিজয়েরই ইঙ্গিত প্রদান করছে।" আমাদের কৃতকার্যের প্রশংসা করে সম্রাট এক ফরমানও জারী করলেন। উক্ত ফরমানে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, যে সব লোককে বন্দী করা হয়েছে, চরম বিজয়ের পর তাদের সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে। কাজেই তাদের যেন বন্দী অবস্থায়ই রাখা হয়।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সিরহিন্দের যুদ্ধে পরাজিত সেকেন্দার সুরের পলায়ন এবং সম্রাটের দিল্লী গমন

সম্রাটের সেনাদল ও সেকেন্দার সুরের বাহিনী প্রায় একমাস কাল পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে সিরহিন্দে অবস্থান করার পর একদিন মহামান্য সম্রাট মন্তব্য করলেন— "গুজরাটে যেভাবে আমি সুলতান বাহাদুরের সহিত যুদ্ধ করেছি, সেকেন্দার সুরের সহিতও অনুরূপ যুদ্ধেই আমি অবতীর্ণ হব। সুতরাং তাঁর কাছে যাতে খাদ্য-সামগ্রী ও রসদপত্র গিয়ে পৌঁছাতে না পারে, সে ব্যবস্থাই আমাদের অবলম্বন করতে হবে।" তর্জী বেগের উপর নির্দেশ দেওয়া হলো যে, বিপক্ষ-শিবিরে প্রেরিত রসদাদি পথিমধ্যেই লুণ্ঠন করার কাজে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আদেশানুসারে তর্জী বেগ তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকায় শত্রু-পক্ষের জন্যে সংগ্রহীত খাদ্য-সামগ্রী ও রসদাদি লুটপাট করার কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। এ লুণ্ঠন-অভিযানে তিনি সেকেন্দার সুরের ভ্রাতাকে নিহত করে তাঁর পতাকাদি কেড়ে নিতেও সমর্থ হন। প্রাথমিক এ সাফল্য স্বভাবতঃই রাজকীয় বাহিনীর মনোবল বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয় এবং ভবিষ্যৎ বিজয় সম্পর্কে সকলেই আশাবাদী হয়ে ওঠে।

মোবারক ঘোরী এসে সম্রাটের সহিত মিলিত হওয়ার পর যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হলো। মহামান্য সম্রাটের সেনা-বাহিনীতে যেসব দল ছিল, তন্মধ্যে সর্ব-প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সম্রাটের নিজস্ব দল। দ্বিতীয় দল ছিল খান-খানান বৈরাম খান ও আরো কতিপয় আমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত বেশ বড় একটি দল। তৃতীয় দল শাহ আবুল মা'লা ও তর্জী বেগের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল। চতুর্থ সেনাদল সেকেন্দার খান উজবেক, আল্লাকুলী আন্দাবারী এবং আরো কতিপয় আমীরের পরিচালনায় প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। শত্রু-পক্ষের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এসব দল এক সাথে অগ্রসর হলো।

খান-খানান বৈরাম খানের সেনাদল অপেক্ষাকৃত বড় ও সুপরিচালিত হওয়ায় সেকেন্দার সুর মনে করলেন যে, এটাই সম্ভবতঃ সম্রাট হুমায়ুনের বাহিনীর মূল অংশ। তিনি অন্য কোন কিছু না ভেবে বৈরাম খানের এ সেনাদলের উপরই আক্রমণ করে বসলেন। সেকেন্দার সুরের হস্তী-যুথের আক্রমণের সম্মুখে বৈরাম

খানের সেনাদলের অশ্বগুলি ভীতিগ্রস্ত হয়ে পলায়নপর হয়ে ওঠল। এ সঙ্গীন অবস্থা দৃষ্টে খান-খানান কোনরূপে আত্মরক্ষা করে পিছু হটে এসে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সম্রাট এ সময়ে জায়নামাজের উপর উপবেশন করে আল্লাহ-পাকের অনুগ্রহ কামনা করে মোনাজাত করছিলেন। খান-খানানের সেনাদলের বিপর্যয়ের সংবাদ তাঁর নিকটে এসে পৌঁছা মাত্রই তিনি জানতে চাইলেন, খান-খানান বেঁচে আছেন কি না? সংবাদবাহক সম্রাটকে জানালেন যে, স্বীয় সেনাদল সুসংবদ্ধ করে বৈরাম খান পুনরায় সেকেন্দার সুরের সম্মুখীন হয়েছেন। সম্রাট তখনি শাহ আবুল মা'লা ও তর্জী বেগকে আদেশ দিলেন যে, সেকেন্দার সুর যখন খান-খানানের সেনাদলকে আক্রমণ করার জন্যে অনেক এগিয়ে এসেছেন, তখন পশ্চাদ্দিক থেকে সেকেন্দারের বাহিনীকে তাঁদের আক্রমণ করা উচিত। সম্রাটের এ নির্দেশ মতো অগ্রসর হয়ে শাহ আবুল মা'লা ও তর্জী বেগ সেকেন্দার সুরের সেনাদলকে পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রমণ করলেন। যিনি এক মুহূর্তের মধ্যে ফকীরকে বাদশাহ এবং বাদশাহকে ফকীরে পরিণত করতে পারেন, সেই মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এ আক্রমণের দ্বারা বাঞ্ছিত ফল পাওয়া গেল। সম্রাটের জন্যে সৌভাগ্যের সুপ্রভাত নেমে এল এবং শত্রুদলকে পর্যুদস্ত করে তাঁর বাহিনী বিরাট বিজয়ের অধিকারী হলো।

পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে সেকেন্দার সুর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

এ মহা-বিজয়ের পর সম্রাট তাঁর বিজয়ী বাহিনী নিয়ে রাজধানী দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। পরাজিত সেকেন্দার সুর পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। শাহ আবুল মা'লাকে সম্রাট আদেশ দিলেন যে, জলন্ধরে অবস্থান করে তিনি সেকেন্দার সুরের শক্তি নিঃশেষিত করে দেওয়ার চেষ্টায় রত থাকুন। এ পরিকল্পনা মতো শাহ আবুল মা'লা জলন্ধরে থেকে গেলেন। কিন্তু পরে তিনি সেখান থেকে লাহোরে গমন করলেন। লাহোরে সম্রাটের যে প্রতিনিধি ছিলেন, প্রথমে তিনি আবুল মা'লার হস্তে লাহোর দুর্গ ছেড়ে দিতে রাজী হন নি'। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন মীমাংসা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শাহ আবুল মা'লা দুর্গে প্রবেশ করে কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন।[১]

১। আবুল ফজল লিখেছেন যে, শাহ আবুল মা'লাকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল। নিজামুদ্দীনের বর্ণনা মতে--সেকেন্দার সুর সোয়ালেক পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলেই তাঁর অনুসরণ করে আবুল মা'লা লাহোরে গিয়ে উপস্থিত হন। (আকবর-নামা, ২২১ পৃষ্ঠা)।

এ অধম জওহরের প্রতি সম্রাটের আদেশ ছিল যে, পর্বতের সানুদেশে অবস্থান করে কাবুল ও কান্দাহার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খবরাখবর সংগ্রহ করে সম্রাটের নিকটে প্রেরণ করতে হবে এবং স্বীয় দলবল সহ সর্বদা সতর্কভাবে অবস্থান করে চারদিকের পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে হবে। সম্রাটের এ নির্দেশ মতো আমি (জওহর) সেকেন্দার সুরের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একজন গুপ্তচর প্রেরণ করি। উক্ত গুপ্তচর এসে সংবাদ দেয় যে, যে-সময়ে আফগানরা যুদ্ধে পরাজিত হয়, হবিব খান সুলতানী তখন মারী পর্বতের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পলায়িত সেকেন্দার সুরও সে পর্বতে গিয়েই আশ্রয় নেন এবং হবিব খান ও তাঁর ভ্রাতাকে সম্মুখে পেয়ে হত্যা করেন। হবিব খান সুলতানীর কাছে সে-সময়ে প্রায় পাঁচ কোটী টাকার রাজস্ব ছিল। রাজস্বের এ বিপুল পরিমাণ অর্থ সেকেন্দার সুরের হস্তগত হয় এবং তিনি তার সাহায্যে নিরন্ন অভাবগ্রস্ত লোকদের সমন্বয়ে এক সেনাদল গঠন করে 'মানকোট' ও 'বাহ্‌রি' দুর্গের নিকটে এসে জমায়েত হয়েছেন। গুপ্তচর প্রদত্ত এসব তথ্য আমি (জওহর) শাহ আবুল মা'লাকে জ্ঞাপন করি। তিনি এর পর মুহাম্মদ কুলী পালাস, ইসমাইল সুলতান দালদী, খাজা জালালুদ্দীন মাহমুদ, মোসাহেব বেগ, ফরহাদ খান প্রভৃতি যেসব ওমরাহ সে সময়ে লাহোরে ছিলেন, তাঁদের সহিত পরামর্শ করেন। আমি (জওহর) সে-সময়ে এ অভিমতই প্রকাশ করি যে, যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রাদি তৈরী না করে সেকেন্দার সুরের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সঙ্গত হবে না। আমার এ অভিমত সকলেই মেনে নেন এবং যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করার কাজ অগৌণে শুরু হয়ে যায়। মহামান্য সম্রাটের চরম বিজয়ের জন্যে আমি (জওহর) তিন শো ধনুক, তিন শো তীর রাখার তূণ, তিন শো বর্শা, আড়াই শো ঢাল, পঞ্চাশ মণ বন্দুকের বারুদ, ত্রিশ মণ সীসক-গোলক প্রভৃতি সাজ-সরঞ্জাম শাহ আবুল মা'লার হস্তে সমর্পণ করি। এসব সরঞ্জাম পেয়ে শাহ মহোদয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং মন্তব্য করলেন —"তোমার সত্যিকার মূল্য আমি আগে উপলব্ধি করতে পারি নি'। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হলে তোমার জন্যে আমি যোগ্য সোপারিশ করব।"

সৈন্যদের মধ্যে অতঃপর অস্ত্রাদি ও সাজ-সরঞ্জাম বিতরণ করা হলো। এ সময়েই প্রায় পাঁচ শো মোগল যোদ্ধা তাদের দেশ থেকে এসে আবুল মা'লার কাছে হাজীর হলো। শাহ মহোদয় এ অধমকে (জওহর) জিজ্ঞেস করলেন— "এ-সব লোককে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে?" এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বল্লাম যে, প্রত্যেক মোগলকে একটি করে ধনুক ও তীর রাখার তূণ প্রদান করেই

সজ্জিত করতে হবে এবং তাদের এক মাসের মাইনেও দিয়ে দিতে হবে। সেকেন্দার সুরের সহিত যুদ্ধ যে এক মাসের বেশী সময় স্থায়ী হবে না, তা' বিবেচনা করেই মাত্র এক মাসের মাইনে প্রদানের কথা আমি বল্লাম। শাহ আবুল মা'লা আমার এ প্রস্তাবকে সঙ্গত মনে করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। অতঃপর সেনা-বাহিনী সেকেন্দার সুরের সহিত মোকাবিলা করার জন্যে অগ্রসর হলো। সেকেন্দারও পাহাড় পর্যন্ত এসে পৌঁছাল।

লাহোর গমনের পূর্বে শাহ আবুল মালার আচরণে ও কথাবার্তায় অস্থৈর্য ও গর্বের ভাব প্রকাশ পায় এবং এ জন্যেই তাঁর প্রতি মানুষের মনে একটা অনাস্থার ভাব জেগে ওঠে। কোন-কোন লোক তাঁর এ-হেন প্রকৃতি সম্পর্কে সম্রাটের কাছে পর্যন্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছিল।[২] অভিযোগ প্রাপ্তির পর সম্রাট শাহজাদা মুহাম্মদ আকবর, খান-খানান বৈরাম খান এবং আরো কতিপয় ওমরাহকে লাহোরে পাঠিয়ে দেন। লাহোরের পথে এঁরা সিরহিন্দের নিকটে উপস্থিত হলে মুহাম্মদ কুলী বারলাস, খাজা জালালুদ্দীন মাহমুদ, ফরহাদ খান, মুহাম্মদ তাহের, মীর খোর্দ এবং মেহতের তামের শরবতী প্রভৃতি শাহ আবুল মা'লার কাছ থেকে শাহজাদা আকবর ও খান-খানানের নিকটে চলে আসেন। শাহ আবুল মা'লা সেকেন্দার সুরকে জলন্ধরের নিকটে ঘিরে ফেলেছিলেন এবং যদি উপরোক্ত আমীরগণ তাঁকে ত্যাগ না করতেন, তা' হলে নিশ্চয় তিনি সেকেন্দারের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারতেন। দলত্যাগী অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ শাহ আবুল মা'লা সম্রাটকে লিখে জানান এবং অভিযোগ করেন যে, তাঁরা যদি এরূপ আচরণের পরিচয় না দিতেন, তা' হলে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণকারী সেকেন্দারকে একেবারেই ধ্বংস করে দেওয়া হয় তো সম্ভবপর হতো। অমাত্যদের দলত্যাগের পর কিছু-সংখ্যক সৈন্যকে সেকেন্দারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেকেন্দার পাহাড়ের ভিতরে আত্মগোপন করে এবং এ-জন্যেই প্রেরিত সৈন্যরা কিছু করে ওঠতে পারে নি।

শাহ আবুল মা'লা অপর একখানা পত্র শাহজাদা আকবর ও খান-খানানের নিকটেও প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"দুশমনদের আমি

২। আবুল-মা'লা সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুব ভালো ছিল না। সম্রাট তাঁকে জলন্ধরে অবস্থান করার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি লাহোরে গিয়ে সেখানকার শাসনকর্তাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের একজন লোককে নিযুক্ত করেন এবং রাজকীয় শান-শওকতের সহিত সেখানে বাস করতে থাকেন। তাঁর এ আচরণের বিষয় সম্রাটকে জানানো হলে তিনি শাহজাদা আকবরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে খান-খানান বৈরাম খানসহ লাহোরে প্রেরণ করেন। (আকবর-নামা, ২২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এক্ষণে আর ভাবনার কোন হেতু নেই। আমি সেকেন্দারকে পাহাড়ের পাদদেশে বিতাড়িত করেছি। এখন আমি লাহোরের দিকে রওয়ানা হচ্ছি। অতি শীঘ্র আপনাদের এখানে আসা প্রয়োজন।''

এ–সময়ে খান-খানানও সম্রাটের নিকটে একখানা পত্র প্রেরণ করে জানান যে, তাঁরা সিরহিন্দ অঞ্চলে উপনীত হয়েছেন এবং শাহ আবুল মা'লা সেকেন্দার সুরকে পাহাড়ের পাদদেশে বিতাড়িত করেছেন। এ পত্রে আশা প্রকাশ করা হয় যে, খান-খানানের দল সেকেন্দারকে পাঞ্জাবের প্রান্তঃসীমা পর্যন্ত তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হবে।

শাহ আবুল মা'লা ও খান-খানানের কাছ থেকে যে সব পত্র সম্রাটের নিকটে প্রেরিত হয়েছিল, সম্রাট সে-সবের কি উত্তর প্রদান করেন, এক্ষণে তাই বর্ণনা করা হচ্ছে। আবুল মা'লার পত্রোত্তরে সম্রাট জানান—''তোমার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। কতিপয় অবাধ্য বুদ্ধিহীন লোকের আচরণ সম্পর্কে তুমি যা' লিখেছ, তা' অবগত হলাম। এ সব লোক যখন আমার কাছে এসে পেঁ ৗছাবে, তখন তাদের কার্যের জন্যে কৈফিয়ৎ চাওয়া হবে এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব অনুযায়ী ভর্ৎসনা করা হবে। তুমি এখানে চলে এস।''

আবুল মা'লা শাহজাদা ও খান-খানানের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাঁর উত্তরে তাঁকে জানানো হয়—''তোমার পত্র পাওয়া গিয়েছে। তুমি যা' কিছু লিখেছ, তা' জানতে পারলাম। তুমি মঙ্গলমতে এদিকে চলে এস এবং সম্রাটের খেদমতে উপস্থিত হও। আমরা শীগগীরই সেদিকে যাচ্ছি।''

খান-খানানের পত্রোত্তরে মহামান্য বাদশাহ লিখে জানান—''আবুল মা'লার এ মর্মের পত্র পাওয়া গিয়েছে যে, দেশ থেকে বিরোধীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অতি শীঘ্র তুমি কেন সেখানে চলে যাচ্ছ না ?''

এক্ষণে আমি (জওহর) পুনরায় ঘটনাবলী বর্ণনা করব। শাহ আবুল মা'লা লাহোরে উপনীত হওয়ার পর খান-খানানের প্রতিনিধি বন্দে আলী কোরবেগীও সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি আবুল মা'লাকে বলেন যে, সম্পূর্ণ বিনা-প্রয়োজনে তিনি (আবুল মা'লা) লাহোরে এসেছেন এবং অবিলম্বে তাঁর সম্রাটের নিকটে চলে যাওয়া উচিত। বন্দে আলীর এ অভিমত শুনে শাহ আবুল মা'লা তাঁকে বলেন যে, অন্যান্য অমাত্যকে আহ্বান করে তাঁদের মতামত জানা হউক। ইসমাইল সুলতান দালাদীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, আবুল মা'লা চৌদ্দ–পনেরো ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করে রাত্রিবেলা বৃষ্টির মধ্যে এসে

পৌঁছেছেন। যদি ভালো থাকেন এবং স্থবিধা হয়, তা' হলে সকাল বেলা তিনি যাত্রা করবেন। মওলানা খাজা কাশ্মীরী এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

ইসমাইল স্থলতান ও শাহ আবুল মা'লার পরামর্শ মতো বন্দে আলী এ অধম জওহরের বাড়ীতে মেহমান হলেন। আল্লাহ-পাকের অনুগ্রহে ও রস্থলে-করীমের দোয়ায় এবং মহামান্য বাদশা'র দাক্ষিণ্যের ফলে আমার গৃহে যে আহার্য প্রস্তুত ছিল, তার সাহায্যেই যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত আমি বন্দে আলীর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলাম। পর দিন প্রাতে শাহ আবুল মা'লা লাহোর ত্যাগ করে সম্রাটের সন্নিধানে গমন করলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সম্রাট হুমায়ুনের পরলোকগমন ও জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের সিংহাসনারোহণ

সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হয়ে শাহ আবুল মা'লা দু'দিন সেখানে অবস্থান করলেন। স্বীয় দলবল নিয়ে অতঃপর তিনি কালানুর গিয়ে পোঁছালেন। অপর দিক থেকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী শাহজাদা আকবর ও খান-খানান এবং অন্যান্য অমাত্যদের দলও এসে সেখানে পোঁছাল। এ-সময়েই খবর পাওয়া গেল যে, সম্রাট হুমায়ুন মৃত্যুর শরবৎ পান করে এ পার্থিব জগৎ থেকে চির-বিদায় নিয়েছেন। ইন্না-লিল্লাহে ও ইন্না এলায়হে রাজেউন্। বুদ্ধিমান লোক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন যে, এ মানবিক অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নয়। জীবনের পোষাক যিনি পরিধান করেছেন, তাঁকে অবশ্যই মরণের পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে। এ নিয়তি মেনে নিতে হবে সকলকেই।

যে গাছ শ্যামলিমায় বেড়ে ওঠে, শেষে একদিন তাকে মাটীতেই মিশে যেতে হয়; আর যে পাতা রসাশ্রিত হয়ে সতেজ শোভা বিস্তার করে, সময় হলেই তাকেও ঝরে পড়তে হয়।

প্রকৃতির নিয়মই হলো—সুমিষ্ট শরবৎ পানের পর বিস্বাদ ঢেঁকুর ওঠে, স্বস্তির মধু পান করার পরেই অস্বস্তির বিষও কিছুটা হজম করে নিতে হয়। মৃত্যুর মালিক যে খোদা, তাঁর অসীম ও জ্যোতির্ময় শক্তির সামনে আমাদের কিছু করণীয় নেই। সেখানে জীবনদান ব্যতীত অপর কোন পথই নেই। সুতরাং ধৈর্যের পথেই সর্বদা পা' রাখতে হবে। শেষ পর্যন্ত সকলকেই মাটীর আবরণের নীচে মস্তক লুকোতে হবে। সম্রাট হুমায়ুনকেও তাই জীবন দান করেই জ্যোতির্ময় আল্লাহ-পাকের ইচ্ছা পূর্ণ করতে হয়েছে এবং এভাবেই তিনি হজরত রসূলে-করীম ও তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ লাভ করেছেন। [১]

১। সম্রাট হুমায়ন ৯৬২ হিজরী সনের রমজান মাসে দিল্লী দখল করেন, (তাবাকাতে-আকবরী, ২২১ পৃঃ ও বদায়ুনী, ১২৫ পৃঃ)। পরবর্তী বৎসর রবিয়ল-আওয়াল মাসে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 'তাবাকাত' অনুযায়ী ৭ই রবিয়ল-আওয়াল তারিখে তিনি পা' পিছলে পড়ে যান এবং আট দিন পর ১৫ই রবিয়ল-আওয়াল তাঁর মৃত্যু হয়। পা' পিছলে পড়ার পর তিনি তিন বা চার দিন সংজ্ঞাহীন ছিলেন বলে জানা যায় ('আরস্কিন' ২য় খণ্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠা)। খ্রীষ্টীয় সন অনুযায়ী সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর তারিখ প্রদান করতে গিয়ে S. M. Edwardes ও H. L. O. Garrett তাঁদের Mughal Rule in India গ্রন্থে (page 15) বলেছেন যে, ১৫৫৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে মগরেবের নামাজের সময় সম্রাট সিঁড়ি থেকে পা' পিছলে পড়ে যান এবং ২৪শে জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

এক্ষণে আমি (জওহর) শাহজাদা মুহাম্মদ আকবরের সিংহাসনারোহণের বিবরণ প্রদান করব।

সেকেন্দার সুরকে পরাজিত করে সম্রাট হুমায়ুন দিল্লী অধিকার করার পর তাঁর অনুগ্রহভাজন এ জওহরকে পাঞ্জাব ও মুলতান প্রদেশের খাজাঞ্চী (রাজস্ব-কর্মচারী) নিযুক্ত করে লাহোরে মোতায়েন করেন। এ অধম রাত-দিন সম্রাটের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত থাকে। একদিন রাত্রে সম্রাটের এ সেবক স্বপ্ন-যোগে দেখতে পায়—সম্রাট তাকে একটি স্থান সুসজ্জিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ মতো এক পাহাড়ে গিয়ে সেখানে সবুজ রঙের ফরাশ বিছিয়ে তার উপর এক বিচিত্র দরবারী তাঁবু খাটানো হয়। এ তাঁবুর দড়িগুলি যেন সমুদ্রের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এভাবে স্থানটি সুসজ্জিত করার পর আমি যেন সম্রাটের কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম যে, তাঁর নির্দেশিত স্থান তৈরী হয়ে গিয়েছে। সম্রাট যেন আমাকে বল্লেন—জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর বাদশাহকে এ জায়গায় নিয়ে যাও। সম্রাটের একথা শুনে আমি যেন মনে মনে ভাবলাম—সম্রাট তো বরাবর শাহজাদাকে মীর্জা সম্বোধনেই অভিহিত করে থাকেন; সম্ভবতঃ এক্ষণে তাঁকে বাদশাহী সমর্পণ করবেন। যা হোক, সম্রাটের আদেশ মতো আমি যেন শাহজাদাকে এনে উক্ত সুসজ্জিত স্থানে উপস্থিত করলাম। দেখে বিস্মিত হলাম যে, তাঁর হাতে একখানা সাদা শাল রয়েছে এবং একবার তিনি সে শাল গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই তা' খুলে ফেলছেন। তাঁর এ আচরণ দেখে আমি যেন বলে উঠলাম—'হুজুর, আপনাকে এখানে খেলার জন্যে আনা হয় নি'।' আমার এ কথার পর যেন তিনি স্বয়ং উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার হাতে একটি ডেগ অর্পণ করে তা' ধরে থাকার আদেশ দিলেন এবং বলে উঠলেন—'আমার খেলা নিয়ে তোমার মাথা-ঘামানোর কোন দরকার নেই।'—এর পরই আমি (জওহর) জেগে উঠলাম ও স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

আমার এ স্বপ্নের সাত দিন পর 'কালানুর' নামক স্থানে রাজকীয় মুকুট বাদশাহ গাজী জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের শিরে পরিয়ে দেওয়া হয়।[২] এর পর থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ-দানে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্যের গৌরব-জ্যোতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহতা'লা তাঁর নূরের জ্যোতিতে ঐশ্বর্যের প্রদীপকে

২। ৯৬৩ হিজরী সনের ২রা রবিয়ল-আখের তারিখে সম্রাট আকবর সিংহাসনারূঢ় হন। (তাবাকাতে-আকবরী, ২২২ পৃঃ ও বদায়ুনী, ১২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। খ্রীষ্টীয় সনের তারিখ অনুযায়ী ১৫৫৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে আকবরকে নূতন সম্রাট রূপে ঘোষণা করা হয় এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গুরুদাসপুর জেলার কালানুরে তাঁর অভিষেক-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়।

অধিকতর আভাময় করে তুলেছেন এবং শক্তির তরবারি ও খঞ্জরকে করে তুলেছেন গরীমামণ্ডিত। সম্রাট আকবরের গৌরব-গরীমা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও রসুলে-করীমের দোয়ায় আজ নিখিল-বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। আমার স্বপ্নের দরবারী তাঁবুর দড়ির সাগর-প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতির বাস্তবায়ন এভাবেই সম্ভবপর হয়েছে।

এ অধম জওহর উদ্দাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে—সম্রাটের এ রাজত্ব কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকুক।

এ পরিচ্ছেদের উপসংহারে বিশ্ব-বিধাতার ছায়াসদৃশ মহামহিম সম্রাটের কিঞ্চিৎ স্তুতি-কীর্তন আমি প্রয়োজন মনে করছি। শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিভূ, বিশ্ব-উদ্যানে আলোকের উৎস, শান্তির নিলয়ে প্রদীপের দীপ্তি, সাফল্য-উদ্যানের মহীরূহ, সেকেন্দারতুল্য শাসক, বিজয়ের সৈনিক, ধর্মের সংরক্ষক এবং জগতের কল্যাণ-সাধক নরপতি তিনি।

জনগণের চোখের পুতুলী তিনি, ন্যায় ও সুবিচারের আলোকধারায় তাঁর দরবার ঝলকিত। সমৃদ্ধির বাগানে রোপিত তাঁর কামনার বৃক্ষ সর্বক্ষণ আপদ-বিপদের ঝঞ্ঝা থেকে নিরাপদ থাকুক, অধম গোলাম জওহর এ মোনাজাতই করছে, আর ফেরিশতারা তার মোনাজাতের সমর্থন করে 'আমিন'-ধ্বনি উচ্চারণ করছেন। কল্যাণের প্রতীক ও সাফল্যের দর্পণ স্বরূপ মহামহিম সম্রাটের সমীপে এ আরজই নিবেদন করছি যে, অধমের সকল দোষ-ত্রুটি নিজ গুণে তিনি ক্ষমা করুন।

জওহর আফতাবচী বিরচিত ''তাজকিরাতুল্-ওয়াকিয়াতে-হুমায়ুনী'' এখানেই শেষ হলো।

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

উ

জ

ত

দ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

হ